যাত্রী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

যাত্রী

প্রথম সংস্করণ (১১০০) জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬।

মূল্য দুই টাকা।

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি

যাত্রী

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি

হারুনা-মারু জাহাজ
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

সকাল আটটা। আকাশে ঘন মেঘ, দিগন্ত বৃষ্টিতে ঝাপ্‌সা, বাদ্‌লার হাওয়া খুঁৎখুঁতে ছেলের মতো কিছুতেই শান্ত হ'তে চাচ্চে না। বন্দরের শান-বাঁধানো বাঁধের ওপারে দুরন্ত সমুদ্র লাফিয়ে লাফিয়ে গ'র্জ্জে উঠ্‌চে, কাকে যেন ঝুঁটি ধ'রে পেড়ে ফেল্‌তে চায়, নাগাল পায় না। স্বপ্নের আক্রোশে সমস্ত মনটা যেমন বুকের কাছে গুম্‌রে ঠেলে ঠেলে উঠ্‌তে থাকে, আর রুদ্ধ-কণ্ঠের বদ্ধবাণী কান্না হ'য়ে হা হা ক'রে ফেটে প'ড়্‌তে চায়, ঐ ফেনিয়ে-ওঠা বোবার গর্জ্জন শুনে বৃষ্টিধারায় পাণ্ডুবর্ণ সমুদ্রকে তেম্‌নি বোধ হ'চ্চে একটা অতল-স্পর্শ অক্ষম ক্ষোভের দুঃস্বপ্ন।

যাত্রার মুখে এইরকম দুর্য্যোগকে কুলক্ষণ ব'লে মনটা

ম্লান হ'য়ে যায়। আমাদের বুদ্ধিটা পাকা, সে এ-কেলে, লক্ষণ-অলক্ষণ মানে না ; আমাদের রক্তটা কাঁচা, সে আদিম-কালের ; তা'র ভয়ভাবনাগুলো তর্ক-বিচারকে ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে ঝেঁকে ওঠে, ঐ পাথরের বেড়ার ওপারের অবুঝ ঢেউগুলোরই মতো। বুদ্ধি আপন যুক্তির কেল্লার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির যত-রকম ভাষাহীন আভাস-ইঙ্গিতের স্পর্শ থেকে স'রে ব'সে থাকে। রক্ত থাকে আপন বুদ্ধির বেড়ার বাইরে ; তা'র উপর মেঘের ছায়া পড়ে, ঢেউয়ের দোলা লাগে ; বাতাসের বাঁশিতে তা'কে নাচায়, আলো-আঁধারের ইসারা থেকে সে কত কি মানে বের করে ; আকাশে যখন অপ্রসন্নতা তখন তা'র আর শান্তি নেই।

অনেকবার দূরদেশে যাত্রা ক'রেচি, মনের নোঙরটা তুল্‌তে খুব বেশি টানাটানি ক'র্‌তে হয়নি। এবার সে কিছু যেন জোরে ডাঙা আঁকড়ে আছে। তা'র থেকে বোধ হ'চ্চে এতদিন পরে আমার বয়স হ'য়েচে। না-চ'ল্‌তে চাওয়া প্রাণের কৃপণতা, সঞ্চয় কম হ'লে খরচ ক'র্‌তে সঙ্কোচ হয়।

তবু মনে জানি ঘাটের থেকে কিছু দূরে গেলেই এই পিছু-টানের বাঁধন খ'সে যাবে। তরুণ পথিক বেরিয়ে আস্‌বে রাজপথে। এই তরুণ একদিন গান গেয়েছিলো, "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।" আজই সেই গান কি উজান হাওয়ায় ফিরে' গেলো? সাগরপারে যে অপরিচিতা আছে তা'র অবগুণ্ঠন মোচন করবার জন্যে কি কোনো উৎকণ্ঠা নেই।

কিছুদিন আগে চীন থেকে আমার কাছে নিমন্ত্রণ এসেছিলো। সেখানকার লোকে আমার কাছ থেকে কিছু শুন্‌তে চেয়েছিলো কোনো পাকা কথা। অর্থাৎ সে নিমন্ত্রণ প্রবীণকে নিমন্ত্রণ।

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এবার আমার নিমন্ত্রণ এলো, তাদের শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দেবার জন্যে। তাই হাল্‌কা হ'য়ে চ'লেচি, আমাকে প্রবীণ সাজ্‌তে হবে না। বক্তৃতা যত করি তা'র কুয়াশার মধ্যে আমি আপনি ঢাকা প'ড়ে যাই। সে তো আমার কবির পরিচয় নয়।

গুটির থেকে প্রজাপতি বেরোয় তা'র নিজের স্বভাবে। গুটির থেকে রেশমের সূতো বের'তে থাকে বস্তুতত্ত্ববিদের টানাটানিতে। তখন থেকে প্রজাপতির অবস্থা শোকাবহ্। আমার মাঝ-বয়স পেরিয়ে গেলে পর আমি আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে গেলুম—সেখানে আমাকে ধ'রে-বেঁধে বক্তৃতা করালে তবে ছাড়্‌লে। তা'র পর থেকে হিতকথার আসরে আমার আনাগোনার আর অন্ত নেই। আমার কবির পরিচয়টা গৌণ হ'য়ে গেলো। পঞ্চাশ বছর কাটিয়েছিলুম সংসারের বেদরকারী মহলে বেসরকারী ভাবে; মনুর মতে যখন বনে যাবার সময়, তখন হাজির হ'তে হ'ল দরকারের দরবারে। সভা সমিতি আমার কাছে সরকারী কাজ আদায় ক'র্‌তে লেগে গেলো। এতেই বোধ হ'চ্চে আমার শনির দশা।

কবি হ'ন বা কলাবিৎ হ'ন তাঁরা লোকের ফর্‌মাস টেনে আনেন,—রাজার ফর্‌মাস, প্রভুর ফর্‌মাস, বহুপ্রভুর

সমাবেশরূপী সাধারণের ফর্মাস। ফর্মাসের আক্রমণ থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেই। তা'র একটা কারণ, অন্দরে তাঁরা মানেন সরস্বতীকে, সদরে তাঁদের মেনে চ'ল্‌তে হয় লক্ষ্মীকে। সরস্বতী ডাক দেন অমৃতভাণ্ডারে, লক্ষ্মী ডাক দেন অন্নের ভাণ্ডারে। শ্বেতপদ্মের অমরাবতী আর সোনার পদ্মের অলকাপুরী ঠিক পাশাপাশি নেই। উভয়ত্রই যাদের ট্যাক্সো দিতে হয়—এক জায়গায় খুসি হ'য়ে, আরেক জায়গায় দায়ে প'ড়ে—তাদের বড়ো মুস্কিল। জীবিকা অর্জ্জনের দিকে সময় দিলে ভিতর-মহলের কাজ চলে না। যেখানে ট্রামের লাইন বসাতে হবে সেখানে ফুলের বাগানের আশা করা মিথ্যে। এই কারণে ফুলবাগানের সঙ্গে আপিসের রাস্তার একটি আপোষ হ'য়েচে এই যে, মালি জোগাবে ফুল আর ট্রাম-লাইনের মালেক জোগাবে অন্ন। তুর্ভাগ্যক্রমে যে-মানুষ অন্ন জোগায় মর্ত্ত্যলোকে তা'র প্রতাপ বেশি। কারণ, ফুলের সখ, পেটের জ্বালার সঙ্গে জবরদস্তিতে সমকক্ষ নয়।

শুধু কেবল অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের সুযোগটাই বড়ো কথা নয়। ধনীদের যে টাকা, তা'র জন্য তাদের নিজের ঘরেই লোহার সিন্দুক আছে, কিন্তু গুণীদের যে কীর্ত্তি, তা'র খনি যেখানেই থাক্ তা'র আধার তো তাদের নিজের মনের মধ্যেই নয়। সে কীর্ত্তি সকল কালের, সকল মানুষের। এইজন্য তা'র এমন একটি জায়গা পাওয়া চাই যেখান থেকে সকল দেশ-কালের সে গোচর হ'তে পারে। বিক্রমাদিত্যের রাজসভার

মঞ্চের উপর যে-কবি ছিলেন, সেদিনকার ভারতবর্ষে তিনি সকল রসিকমণ্ডলীর সাম্‌নে দাঁড়াতে পেরেছিলেন—গোড়াতেই তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়নি। প্রাচীন কালে অনেক ভালো কবির ভালো কাব্যও দৈবক্রমে এইরকম উঁচু ডাঙাতে আশ্রয় পায় নি ব'লে কালের বন্যাস্রোতে ভেসে গেচে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ-কথা মনে রাখ্‌তে হবে, যাঁরা যথার্থ গুণী তাঁরা একটি সহজ কবচ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। ফর্‌মাস তাঁদের গায়ে এসে পড়ে, কিন্তু মর্ম্মে এসে বিদ্ধ হয় না। এইজন্যেই তাঁরা মারা যান না, ভাবীকালের জন্যে টিঁকে থাকেন। লোভে প'ড়ে ফর্‌মাস যারা সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে নেয়, তা'রা তখনই বাঁচে, পরে মরে। আজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অনেকগুলিকেই কালের ভাঙাকুলো থেকে খুঁটে বের কর্‌বার জো নেই। তাঁরা রাজার ফর্‌মাস পূরোপূরী খেটেছিলেন, এইজন্যে তখন হাতে-হাতে তাঁদের নগদ-পাওনা নিশ্চয়ই আর-সকলের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু কালিদাস ফর্‌মাস খাট্‌তে অপটু ছিলেন ব'লে দিঙ্‌নাগের স্থূল হস্তের মার তাঁকে বিস্তর খেতে হ'য়েছিল। তাঁকেও দায়ে প'ড়ে মাঝে মাঝে ফর্‌মাস খাট্‌তে হ'য়েচে তা'র প্রমাণ পাই মালবিকাগ্নিমিত্রে। যে দুই তিনটি কাব্যে কালিদাস রাজাকে মুখে ব'লেছিলেন "যে আদেশ, মহারাজ ; যা ব'ল্‌চেন তাই ক'র্‌বো" অথচ সম্পূর্ণ আরেকটা কিছু ক'রেচেন, সেইগুলির জোরেই সেদিনকার রাজসভার অবসানে তাঁর কীর্ত্তিকলাপের অন্ত্যেষ্টিসৎকার

হ'য়ে যায়নি—চিরদিনের রসিক-সভায় তাঁর প্রবেশ অবারিত হ'য়েচে।

মানুষের কাজের দুটো ক্ষেত্র আছে,—একটা প্রয়োজনের, আর একটা লীলার। প্রয়োজনের তাগিদ সমস্তই বাইরের থেকে, অভাবের থেকে; লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, ভাবের থেকে। বাইরের ফর্‌মাসে এই প্রয়োজনের আসর সর্‌গরম হ'য়ে ওঠে, ভিতরের ফর্‌মাসে লীলার আসর জমে। আজকের দিনে জনসাধারণ জেগে উঠেচে; তা'র ক্ষুধা বিরাট্, তা'র দাবী বিস্তর। সেই বহুরসনাধারী জীব তা'র বহুতর ফর্‌মাসে মানবসংসারকে রাত্রিদিন উদ্যত ক'রে রেখেচে;—কত তা'র আস্‌বাব আয়োজন, পাইক বর্‌কন্দাজ, কাড়া-নাকাড়া-ঢাকঢোলের তুমুল কলরব—তা'র "চাই চাই" শব্দের গর্জ্জনে স্বর্গমর্ত্ত্য বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো। এই গর্জ্জনটা লীলার আসরেও প্রবেশ ক'রে দাবী প্রচার ক'র্‌তে থাকে যে, তোমাদের বীণা, তোমাদের মৃদঙ্গও আমাদের জয়যাত্রার ব্যাণ্ডের সঙ্গে মিলে আমাদের কল্লোলকে ঘনীভূত ক'রে তুলুক। সেজন্যে সে খুব বড়ো মজুরী আর জাঁকালো শিরোপা দিতেও রাজি আছে। আগেকার রাজসভার চেয়ে সে হাঁকও দেয় বেশি, দামও দেয় বেশি। সেইজন্যে ঢাকীর পক্ষে এ সময়টা সুসময়, কিন্তু বীণ্‌কারের পক্ষে নয়। ওস্তাদ হাত জোড় ক'রে বলে, "তোমাদের হট্টগোলের কাজে আমার স্থান নেই; অতএব বরঞ্চ আমি চুপ ক'রে থাক্‌তে রাজি আছি, বীণাটা গলায় বেঁধে জলে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে ম'র্‌তেও

রাজি আছি, কিন্তু আমাকে তোমাদের সদর-রাস্তায় গড়ের বাদ্যের দলে ডেকো না। কেন না, আমার উপরওয়ালার কাছ থেকে তাঁর গানের আসরের জন্যে পূর্ব্ব হ'তেই বায়না পেয়ে ব'সে আছি।" এতে জনসাধারণ নানাপ্রকার কটু সম্ভাষণ করে, সে বলে, "তুমি লোকহিত মানো না, দেশহিত মানো না, কেবল আপন খেয়ালকেই মানো।" বীণকার ব'ল্‌তে চেষ্টা করে, "আমি আমার খেয়ালকেও মানি নে, তোমার গরজকেও মানি নে, আমার উপরওয়ালাকে মানি।" সহস্ররসনাধারী গর্জ্জন ক'রে ব'লে ওঠে—"চুপ!"

জনসাধারণ ব'ল্‌তে যে প্রকাণ্ড জীবকে বোঝায়, স্বভাবতই তা'র প্রয়োজন প্রবল এবং প্রভূত। এইজন্যে স্বভাবতই প্রয়োজন সাধনের দাম তা'র কাছে অনেক বেশি, লীলাকে সে অবজ্ঞা করে। ক্ষুধার সময়ে বকুলের চেয়ে বার্ত্তাকুর দাম বেশি হয়। সেজন্যে ক্ষুধাতুরকে দোষ দিইনে; কিন্তু বকুলকে যখন বার্ত্তাকুর পদ গ্রহণ কর্‌বার জন্যে ফর্‌মাস আসে, তখন সেই ফর্‌মাসকেই দোষ দিই। বিধাতা ক্ষুধাতুরের দেশেও বকুল ফুটিয়েচেন, এতে বকুলের কোনোও হাত নেই। তা'র একটিমাত্র দায়িত্ব আছে এই যে, যেখানে যাই ঘটুক, তাকে কারো দরকার থাক্ বা না থাক্, তাকে বকুল হ'য়ে উঠ্‌তেই হবে,—ঝ'রে পড়ে তো প'ড়্‌বে, মালায় গাঁথা হয় তো তাই সই। এই কথাটাকেই গীতা ব'লেচেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। দেখা গেচে স্বধর্ম্মে জগতে খুব মহৎ লোকেরও নিধন হ'য়েচে, কিন্তু সে নিধন বাইরের, স্বধর্ম্ম

ভিতরের দিক্ থেকে তাঁকে বাঁচিয়েচে। আর এও দেখা গেচে পরধর্ম্মে খুব ক্ষুদ্র লোকেও হঠাৎ বড়ো হ'য়ে উঠেচে, কিন্তু তা'র নিধন ভিতরের থেকে, যাকে উপনিষদ্ বলেন, "মহতী বিনষ্টিঃ"।

যে-ব্যক্তি ছোটো, তা'রও স্বধর্ম্ম ব'লে একটি সম্পদ্ আছে। তা'র সেই ছোটো কৌটোটির মধ্যেই সেই স্বধর্ম্মের সম্পদ্‌টিকে রক্ষা ক'রে সে পরিত্রাণ পায়। ইতিহাসে তা'র নাম থাকে না, হয়তো তার বদ্‌নাম থাক্‌তেও পারে, কিন্তু তা'র অন্তর্যামীর খাস-দর্‌বারে তা'র নাম থেকে যায়। লোভে প'ড়ে স্বধর্ম্ম বিকিয়ে দিয়ে সে যদি পরধর্ম্মের ডঙ্কা বাজাতে যায়, তবে হাটে বাজারে তা'র নাম হবে। কিন্তু তা'র প্রভুর দর্‌বার থেকে তা'র নাম খোওয়া যাবে।

এই ভূমিকার মধ্যে আমার নিজের কৈফিয়ৎ আছে। কখনো অপরাধ করিনি তা নয়। সেই অপরাধের লোক্‌সান ও পরিতাপ তীব্র বেদনায় অনুভব ক'রেচি ব'লেই সাবধান হই। ঝড়ের সময় ধ্রুবতারাকে দেখা যায় না ব'লে দিক্‌ভ্রম হয়। এক এক সময়ে বাহিরের কল্লোলে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে স্বধর্ম্মের বাণী স্পষ্ট ক'রে শোনা যায় না। তখন "কর্ত্তব্য" নামক দশমুখ-উচ্চারিত একটা শব্দের হুঙ্কারে মন অভিভূত হ'য়ে যায়, ভুলে যাই যে কর্ত্তব্য ব'লে একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ নেই—আমার "কর্ত্তব্যই" হ'চ্চে আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। গাড়ির চলাটা হ'চ্চে একটা সাধারণ কর্ত্তব্য—কিন্তু ঘোরতর প্রয়োজনের সময়েও ঘোড়া যদি বলে আমি সারথির কর্ত্তব্য ক'র্‌বো, বা

চাকা বলে, ঘোড়ার কর্ত্তব্য ক'র্বো, তবে সেই কর্ত্তব্যই ভয়াবহ হ'য়ে ওঠে। ডিমক্রেসির যুগে এই উড়ে'-পড়া প'ড়ে-পাওয়া কর্ত্তব্যের ভয়াবহতা চারিদিকে দেখ্তে পাই। মানবসংসার চ'ল্বে, তা'র চলাই চাই; কিন্তু তা'র চলার রথের নানা অঙ্গ;—কর্ম্মীরাও একরকম ক'রে তাকে চালাচ্চে, গুণীরাও একরকম ক'রে তাকে চালাচ্চে, উভয়ের স্বানুবর্ত্তিতাতেই পরস্পরের সহায়তা এবং সমগ্র রথের গতিবেগ—উভয়ের কর্ম্ম একাকার হ'য়ে গেলেই মোট কর্ম্মটাই পঙ্গু হ'য়ে যায়।

এই উপলক্ষ্যে একটি কথা আমার মনে প'ড়্চে। তখন লোকমান্য টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছিলেন আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে নন্‌কোঅপারেশন আরম্ভ হয়নি বটে কিন্তু পোলিটিকাল আন্দোলনের তুফান বইচে। আমি বল্লুম, রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপে যেতে পার্বো না। তিনি ব'লে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চর্চ্চায় থাকি এ তাঁর অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে-বাণী আমি প্রচার ক'র্তে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সত্য কাজ —এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা ক'র্তে পারি।—আমি জান্তুম জনসাধারণ টিলককে পোলিটিকাল নেতারূপেই বরণ ক'রেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এইজন্য আমি তাঁর পঞ্চাশহাজার টাকা গ্রহণ ক'র্তে পারিনি। তা'র পরে বোম্বাই-সহরে তাঁর

সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিলো। তিনি আমাকে পুনশ্চ ব'ল্‌লেন, "রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক্ রাখ্‌লে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ ক'র্‌তে পার্‌বেন—এর চেয়ে বড়ো আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশাই করিনি।" আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম, টিলক যে গীতার ভাষ্য ক'রেছিলেন সে কাজের অধিকার তাঁর ছিলো—সেই অধিকার মহৎ অধিকার।

অনেক ধনী আছে যারা নিজের ভোগেই নিজের অর্থের ব্যয় ও অপব্যয় ক'রে থাকে। সাধারণের দাবী তাদের ভোগের তহবিলে যদি ভাঙন ধরাতে পারে তাতে দুঃখের কথা কিছুই নেই। অবকাশ পদার্থটা হ'চ্চে সময়ধন—সংসারী এই ধনটাকে নিজের ঘর-সংসারের চিন্তায় ও কাজে লাগায়, আর কুঁড়ে যে সে কোনো কাজেই লাগায় না। এই সংসারী বা কুঁড়ের অবকাশের উপর লোকহিতের দোহাই দিয়ে উপদ্রব ক'র্‌লে দোষের হয় না। আমার অবকাশের অনেকটা অংশ আমি কুঁড়েমিতেই খাটাই, বাইরে থেকে কেউ কেউ এমন সন্দেহ করে। এ কথাটা জানে না যে কুঁড়েমিটাই আমার কাজের প্রধান অঙ্গ। পেয়ালার যতটা চীনেমাটি দিয়ে গড়া ততটাই তা'র প্রধান অংশ নয়, বস্তুতঃ সেটাই তা'র গৌণ যতটা তাঁর ফাঁক, ততটাই তা'র মুখ্য অংশ। ঐ ফাঁকটাই রসে ভর্ত্তি হয়, পোড়া চীনেমাটি উপলক্ষ্য মাত্র। ঘরের খুঁটিটা যেমন, গাছ ঠিক তেমন জিনিষ নয়। অর্থাৎ সে কেবলমাত্র নিজের তলাটার মাটিতেই দাঁড়িয়ে থাকে না। তা'র দৃশ্যমান গুঁড়ি

যতটুকু মাটি জুড়ে থাকে, তা'র অদৃশ্য শিকড় তা'র চেয়ে অনেক বেশি মাটি অধিকার করে ব'লেই গাছটা রসের জোগান পায়। আমাদের কাজও সেই গাছের মতো; ফাঁকা অবকাশের তলা থেকে গোপনে সে রস আদায় ক'রে নেয়। দশে মিলে তা'র সেই বিধিদত্ত অবকাশের লাখেরাজের উপর যদি খাজনা বসায় তা হ'লে তা'র সেই কাজটাকেই নিঃস্ব করা হ'তে থাকে। এইজন্যেই দেশের সমস্ত সাময়িক পত্রে হরির লুঠের জোগান দেবার জন্যে অন্য কোনো দেশেই কবিকে নিয়ে এমনতরো টানাহেঁচ্‌ড়া করে না।

আমাদের দেশের গার্হস্থ্য ব্যাকরণে যাঁরা কর্ত্তা তাঁদের প্রধান পরিচয় ক্রিয়াকর্ম্মে। লোকে তাঁদের দশকর্ম্মা বলে। সেই গার্হস্থ্যে আবার এমন সব লোক আছে যারা অকর্ম্মা; তা'রা কেবল ফাইফর্‌মাস খাটে। কাজের চেয়ে অকাজে তাদের বেশি দরকার। অর্থাৎ তাস খেল্‌বার যখন জুড়ি না জোটে তখন তাদের ডাক পড়ে, আর দূর-সম্পর্কের জ্যাঠাই-মার গঙ্গাযাত্রার সময় তা'রাই প্রধান সহায়।

আমাদের শাস্ত্রে গৃহস্থ-আশ্রমের উপর আরণ্য-আশ্রমের বিধি। বর্ত্তমানকালে এই শেষের আশ্রম বাদ প'ড়েচে; আরণ্য-আশ্রম নেই, কিন্তু তা'র জায়গা জুড়েচে সাধারণ্য-আশ্রম। এখন দেশে আরণ্যক পাওয়া যায় না, কিন্তু সাধারণ্যকের সংখ্যা কম নয়। তাঁরা পাব্লিক নামক বৃহৎ সংসারের ঘোরতর সংসারী।

শেষোক্ত সংসারেও দুই দলের লোক আছেন। একদল

দশকর্ম্মা, আরেকদল অকর্ম্মা। যাঁদের ইংরেজিতে লীডার বলে, আমি তাঁদের ব'ল্‌তে চাই কর্ত্তাব্যক্তি। কেউ বা বড়ো-কর্ত্তা, কেউ বা মেজো-কর্ত্তা, কেউ বা ছোটো-কর্ত্তা। এই কর্ত্তারা নিত্য-সভা. নৈমিত্তিক-সভা, যুদ্ধ-সভা, শ্রাদ্ধ-সভা, প্রভৃতিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত ; তা ছাড়া আছে সাময়িক পত্র, অসাময়িক পত্র, চাঁদার খাতা, বার্ষিক বিবরণী। আর যাঁরা এই সাধারণ্য আশ্রমের কর্ত্তাব্যক্তি নন, ক্রিয়াকর্ম্ম তাঁদের অধীন নয়, তাঁরা থাকেন চ-বৈ-তু-হি নিয়ে ; যত রকম জোড়াতাড়া দেওয়ার কাজে তাঁদের ডাক ; হঠাৎ ফাঁক পড়্‌লে সেই ফাঁক উপস্থিত-মতো তাঁরা পূরণ ক'রে থাকেন। তাঁরা ভলাণ্টীয়ারি করেন, চৌকি সাজান, চাঁদা সাধেন, করতালিঘাতে সভার উৎসাহবৃদ্ধি করেন. কখনো বা অপঘাতে সভার অকালসমাপ্তি সাধনেও যোগ দেন।

পাব্লিক সহরে কর্ত্তৃপদ হাটে ঘাটে মেলে না, আর সাবধানে তাদের ব্যবহার ক'র্‌তে হয়। কিন্তু অব্যয় পদের ছড়াছড়ি—এই জন্যে অব্যয়ের অপব্যয় সর্ব্বদাই ঘটে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ছন্দ পূরণের কাজে তাদের অস্থানে তলব পড়ে, তাতে মাত্রা রক্ষা হয় এই মাত্র, তা'র বেশি কিছু না ; যেন কুলীন কন্যার কলাগাছের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া।

বর্ত্তমান বয়সে আমার জীবনের প্রধান সঙ্কট এই যে, যদিচ স্বভাবত আমি আরণ্যক তবু আমার কর্ম্মস্থানের কুগ্রহ সকৌতুকে আমাকে সাধারণ্যক ক'রে দাঁড় ক'রিয়েচেন। দীর্ঘকাল আমার জীবন কেটেচে কোণে, কাব্যরচনায় ; কখন্

একসময় বিধাতার খেয়ালের খেয়া আমাকে পৌঁছে দিয়েচে জনতার ঘাটে,—এখন অকাব্যসাধনে আমার দিন কাট্‌চে। এখন আমি পাব্লিকের কর্ম্মক্ষেত্রে। কিন্তু হাঁস যখন চলে তখন তা'র নড়ব'ড়ে চলন দেখেই বোঝা যায় তা'র পায়ের তেলো ডাঙায় চল্‌বার জন্যে নয়, জলে সাঁতার দেবার জন্যেই। তেম্‌নি পাব্লিক ক্ষেত্রে আমার পদচারণভঙ্গী আমার অভ্যাস-দোষে অথবা বিধাতার রচনাগুণে আজ পর্য্যন্ত বেশ সুসঙ্গত হয় নি।

এখানে কর্ত্তৃপদে আমার যোগ্যতা নেই, যাকে অব্যয়পদ বলেচি তা'র কাজেও পদে পদে বিপদ্ ঘটে। ভলাণ্টীয়ারি কর্‌বার বয়স গেচে, দুর্দ্দিনের তাড়নায় চাঁদার খাতা নিয়ে ধনপতিদের অর্গলবদ্ধ দ্বারে অনর্গল ঘুরে বেড়াতে হয়, তাতে অঙ্কপাত যা হয় তা'র চেয়ে অশ্রুপাত হয় অনেক বেশি। তা'র পরে গ্রন্থের ভূমিকা লেখবার জন্যে অনুরোধ আসে, গ্রন্থকার অভিমতের দাবী ক'রে গ্রন্থ পাঠান, কেউ বা অনাবশ্যক পত্র লেখেন, ভিতরে মাশুল দিয়ে দেন জবাব লেখ্‌বার জন্যে আমাকে দায়ী কর্‌বার উদ্দেশ্যে, নবপ্রসূত কুমার-কুমারীদের পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের জন্য অভূতপূর্ব্ব নূতন নাম চেয়ে পাঠান, সম্পাদকের তাগিদ আছে, পরিণয়োৎসুক যুবকদের জন্যে নূতন-রচিত গান চাই, কী উপায়ে নোবেল-প্রাইজ অর্জ্জন ক'র্‌তে হয় সে সম্বন্ধে পরামর্শের আবেদন আসে, দেশের হিতচেষ্টায় পত্রলেখকের সঙ্গে কেন আমার মতের কিছুমাত্র পার্থক্য ঘটে তা'র জবাবদিহির জন্যে সাক্রোশ তলব

পড়ে। এই-সমস্ত উত্তেজনায় প্রতিনিয়ত যে-সকল কর্ম্ম জমিয়ে তুল্‌চি আবর্জ্জনা-মোচনে কালের সম্মার্জ্জনী সুপটু ব'লেই বিধাতার কাছে সেজন্যে মার্জ্জনা আশা করি। সভা-কর্তৃত্বের কাজেও মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ে। যখন একান্ত কাব্যরসে নিমগ্ন ছিলুম তখন এ বিপদ্ আমার ছিল না। রাখালকে কেউ ভুলেও রাজসিংহাসনে আমন্ত্রণ করে না, এইজন্যেই বটতলায় সে বাঁশি বাজাবার সময় পায়। কিন্তু যদি দৈবাৎ কেউ ক'রে বসে, তা হ'লে পাঁচনিকে রাজদণ্ডের কাজে লাগাতে গিয়ে রাখালি এবং রাজত্ব দুয়েরই বিঘ্ন ঘটে। কাব্য-সরস্বতীর সেবক হ'য়ে গোলেমালে আজ গণপতির দরবারের তক্‌মা প'রে ব'সেচি—তা'র ফলে কাব্য-সরস্বতী আমাকে প্রায় জবাব দিয়েচেন, আর গণপতির বাহনটি আমার সকল কাজেরই ছিদ্র অন্বেষণ ক'র্‌চেন।

ফর্‌মাসের শরশয্যাশায়ী হবার ইচ্ছা আমার কেন নেই সেই কথাটা এই উপলক্ষ্যে জানালুম। যেখানে দশে মিলে কাজ সেখানে আমার অবকাশের সব গোরু বাছুর বেচে খাজনা যোগাবার তলবে কেন আমি সিভিল অথবা আন্‌সিভিল ডিস্‌-ওবীডিয়েন্সের নীতি অবলম্বন ক'র্‌তে চেষ্টা করি তা'র একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া গেলো। সব সময়ে অনুরোধ উপরোধ এড়িয়ে উঠ্‌তে পারিনি—তা'র কারণ আমার স্বভাব দুর্ব্বল। পৃথিবীতে যাঁরা বড়োলোক তাঁরা রাশভারি শক্ত-লোক; মহৎ সম্পদ্ অর্জ্জন কর্‌বার লক্ষ্যপথে, যথা-যোগ্য স্থানে যথোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে "না" বল্‌বার ক্ষমতাই তাঁদের

পাথেয়। মহৎ সম্পদ্‌কে রক্ষা কর্‌বার উপলক্ষ্যে রাশভারি লোকেরা "না"-মন্ত্রের গণ্ডিটা নিজের চারিদিকে ঠিক জায়গায় মোটা ক'রে টেনে দিতে পারেন। আমার সে মহত্ত্ব নেই, পেরে উঠিনে; হাঁ-না দুই নৌকার উপর পা দিয়ে দুল্‌তে দুল্‌তে হঠাৎ অগাধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ি। তাই একান্ত মনে আজ প্রার্থনা করি, "ওগো 'না'-নৌকোর নাবিক, আমাকে জোরের সঙ্গে তোমার নৌকোয় টেনে নিয়ে একেবারে মাঝদরিয়ায় পাড়ি দাও—অকাজের ঘাটে আমার তলব আছে, দোটানায় প'ড়ে যেন বেলা ব'য়ে না যায়!"

২৫শে সেপ্টেম্বর।

কাল সমস্ত দিন জাহাজ মাল বোঝাই ক'র্‌ছিলো। রাত্রে যখন ছাড়্‌লো, তখন বাতাসের আক্ষেপ কিছু শান্ত। কিন্তু তখনো মেঘগুলো দল পাকিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্চে। আজ সকালে একখানা ভিজে অন্ধকারে আকাশ ঢাকা। এবার আলোকের অভিনন্দন পেলুম না। শরীর মনও ক্লান্ত।

জাহাজটা তীর থেকে যেন এক টুক্‌রো সংসার ছিন্ন ক'রে নিয়ে ভেসে চ'লেচে। ডাঙায় মানুষে মানুষে ফাঁক থাক্‌বার অবকাশ আছে, এখানে জায়গা অল্প, ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে থাক্‌তে হয়। কিন্তু তবু পরস্পর পরিচয় কত কঠিন। প্রত্যেকবার জাহাজে ওঠবার আগে এই চিন্তাটি মনকে পীড়া দেয়, এই নৈকট্যের দূরত্ব, এই সঙ্গবিহীন সাহচর্য্য।

আদিম অবস্থায় মানুষ যে-বাসা বাঁধে তা'র দেয়াল পাৎলা, তা'র ছিটে-বেড়ায় যথেষ্ট ফাঁক, ঝাঁপটা ঠেলে ফেলে ঘরে ঢোকা সহজ। কালক্রমে বাসা বাঁধবার নৈপুণ্য তা'র যতই বেড়ে ওঠে, ততই ইঁটকাট লোহাপাথরে ঘরের দেয়াল পাকা হ'য়ে ওঠে; দরজা হয় মজবুৎ। তা'র মধ্যে মনের অভ্যেসগুলো হ'য়ে যায় পাঁচিলে-ঘেরা। খাওয়া-পরা শোওয়া-বসা সব-কিছুর জন্যই আড়ালের দরকার হয়। এই আড়ালটা সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। এইটেকে রচনা ও রক্ষা ক'র্‌তে বিস্তর খরচ লাগচে। ঘর-বাহিরের মাঝ-খানে মানুষের সহজ-চলাচলের রাস্তায় পদে-পদে নিষেধ।

প্রত্যেক মানুষের একটা সহজ বেড়ার দরকার আছে, নইলে ভিড়ের টানে দশের সঙ্গে মিশে গেলে নিজের বিশেষত্বের সম্পদ ব্যর্থ হ'য়ে যায়। নিজেকে বিচ্ছিন্ন না ক'র্‌লে নিজেকে প্রকাশ করাই যায় না। বীজ আপনাকে প্রকাশ কর্‌বার জন্যই মাটির ভিতরে আড়াল খোঁজে, ফল আপনাকে পরিণত কর্‌বার জন্যেই বাহিরের দিকে একটা খোসার পর্দ্দা টেনে দেয়। বর্ব্বর অবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত বিশেষত্বের জোর থাকে না, তা'র কাজও থাকে কম। এইজন্যেই ব্যক্তি-বিশেষের গোপনতার পরিবেষ্টন সৃষ্ট হ'য়ে ওঠে তা'র সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু এই বেড়া জিনিষটার আত্ম-প্রাধান্য-বোধ ক্রমেই অতিমাত্র বাড়তে থাকে। তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের

মিলনে যে একান্ত প্রয়োজন আছে, সেটা বাধাগ্রস্ত হ'য়ে অনভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে। সেই আতিশয্যটাই হ'লো বিপদ।

এই মারাত্মক বিপদটা কোন্ অবস্থায় ঘটে? ভোগের আদর্শ অপরিমিত বেড়ে উঠে' মানুষের যখন বিস্তর উপকরণের প্রয়োজন, যখন অন্যের জন্যে তা'র সময় ও সম্বল খরচ কর্বার বেলায় বিস্তর হিসেব করা অনিবার্য্য; যখন তা'র জীবিকার উপাদান উৎপাদন কর্বার জন্যে প্রভূত আয়োজন চাই, তখন তা'র সভ্যতার বাহন-বাহিনার বিপুলতায় তা'র লোকালয় অতি প্রকাণ্ড হ'য়ে ওঠে। জনতার পরিমিত আয়তনেই মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার ঐক্য সম্ভবপর। তাই পল্লীর অধিবাসীরা কেবল যে একত্র হয় তা নয়, তা'রা এক হয়। সহরের অতিবৃহৎ জনসমাবেশ আপন অতিবিস্তীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-আত্মীয়তার রক্তস্রোত সঞ্চারিত কর্বার উপযুক্ত হৃৎপিণ্ড তৈরি ক'রে উঠ্তে পারে না। প্রকাণ্ড জনসঙ্ঘ কাজ চালাবারই যোগ্য, আত্মীয়তা চালাবার নয়। কারখানা ঘরে হাজার লোকের মজুরি দরকার, পরিবারের মধ্যে হাজার লোকের জটলা হ'লে তা'কে আর গৃহ বলে না। যন্ত্রের মিলন যেখানে, সেখানে অনেক লোক, আর অন্ত্রের মিলন যেখানে সেখানে লোকসংখ্যা কম। তাই সহর মানুষকে বাহিরের দিকে কাছে টানে, অন্তরের দিকে ফাঁক ফাঁক ক'রে রাখে।

আমরা আজন্মকাল সেই দেয়াল-কোটরে ভাগে-ভাগে বিভক্ত সভ্য মানুষ। হঠাৎ এসে ঠেসাঠেসি ক'রে মিলেছি

এক জাহাজে। মেল্‌বার অভ্যেস মনের মধ্যে নেই। তীর্থে যারা দল বেঁধে রাস্তায় চলে, মিল্‌তে তাদের সময় লাগে না, তা'রা গাঁয়ের লোক, মেলাই তাদের অভ্যেস। সার্থবাহ যারা মরুর মধ্য দিয়ে উটে চ'ড়ে চলে, তা'রাও মনকে নীরব আড়ালের বুর্‌খা দিয়ে ঢেকে চলে না; তাদের সভ্যতা ইঁট-পাথরে অমিলকে পাকা ক'রে গেঁথে তোলেনি। কিন্তু ষ্টীমারের যাত্রী, রেলগাড়ির প্যাসেঞ্জার বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে আসে, তাদের দেয়ালগুলোর সূক্ষ্ম শরীর তাদের সঙ্গে সঙ্গেই চ'ল্‌তে থাকে।

তাই দেখি, সহরের কলেজে-পড়া ছেলে হঠাৎ দেশাত্ম-বোধের তাড়ায় যখন খামকা পল্লীর উপকার ক'র্‌তে ছোটে, তখন তা'রা পল্লীবাসীর পাশে এসেও কাছে আস্‌তে পারে না। তা'রা বেড়ার ভিতর দিয়ে কথা কয়, পল্লীর কানে বাজে যেন আরবী আওড়াচ্চে।

যা হোক্, যদিও সহুরে সভ্যতার পাকে আমাদেরকেও খুব ক'ষে টান দিয়েচে, তবু মনের গ্রাম্য অভ্যেস এখনো যায়নি। সময়কে ব'ল্‌তে আরম্ভ ক'রেচি মূল্যবান, কিন্তু কেউ যদি সে-মূল্য গ্রাহ্য না করে, তা'কে ঠেকিয়ে রাখবার কোনো ব্যবস্থা আজো তৈরি হয়নি। আমাদের আগন্তুকবর্গ অভিমন্যুর মতো অতি সহজেই ঘরে প্রবেশ ক'র্‌তে জানেন, কিন্তু নির্গমনের পথ যে তাঁরা জানেন, সে তাঁদের ব্যবহারে বোঝা যায় না। অত্যন্ত বেগার লোককেও যদি বলা যায়, কাজ আছে, সে বলে, "ঈস্ লোকটা ভারি অহঙ্কারী।" অর্থাৎ

তোমার কাজটা আমাকে দেখা দেওয়ার চেয়েও মহার্ঘ্য, একথা মনে করা স্পর্দ্ধা।

অসুস্থ শরীরে একদিন আমার তিন-তলার ঘরে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় একটা লেখায় নিযুক্ত আছি। আমি নিতান্তই মৃদুস্বভাবের মানুষ ব'লেই আমার সেই অন্দরের ঘরটাকেও আমার বন্ধু, অনতিবন্ধু ও অবন্ধুরা দুর্গম ব'লে গণ্য করেন না। এইটুকুমাত্র সুবিধা যে, পথটা পুরবাসীদের সকলেরই জানা নেই। খবর এলো, একটি ভদ্রলোক দেখা ক'র্‌তে এসেচেন। অস্বাস্থ্য বা ব্যস্ততার ওজরকে আমাদের ভদ্রলোকেরা শ্রদ্ধা করেন না, তাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লেখা বন্ধ ক'রে নীচে গেলুম। দেখি একজন কাঁচা-বয়সের যুবক; হঠাৎ তা'র চাদরের অজ্ঞাতবাস থেকে একটা মোটা-গোছের খাতা বের'লো। বুঝলুম, আমারি আপন সম্প্রদায়ের লোক। কবি-কিশোর একটুখানি হেসে আমাকে ব'ল্‌লে, "একটা অপেরা লিখেচি।" আমার মুখে বোধ হয় একটা পাংশুবর্ণ ছায়া প'ড়ে থাক্‌বে, তাই হয়তো আশ্বাস দেবার জন্যে ব'লে উঠ্‌লো, "আপনাকে আর কিছুই ক'র্‌তে হবে না, কেবল গানের কথা-গুলোতে সুর বসিয়ে দেবেন, সবশুদ্ধ পঁচিশটা গান।" কাতর হ'য়ে ব'ল্‌লুম, "সময় কই?" কবি ব'ল্‌লে, "আপনার কতটুকুই বা সময় লাগ্‌বে? গান-পিছু বড়ো জোর আধ ঘণ্টাই হোক্।" সময় সম্বন্ধে এর মনের ঔদার্য্য দেখে হতাশ হ'য়ে ব'ল্‌লুম, "আমার শরীর অসুস্থ।" অপেরা-রচয়িতা ব'ল্‌লে, "আপনার শরীর অসুস্থ, এর উপরে আর কী ব'ল্‌ব।

কিন্তু যদি—"। বুঝ্‌লুম প্রবীণ ডাক্তারের সার্টিফিকেট্‌ আন্‌লেও নবীন কবি বিচলিত হবে না। কোনো একজন ইংরেজ গ্রন্থকারের ঘরে এই নাট্যের অবতারণা হ'লে কোন্‌ ফৌজদারীতে তা'র যবনিকা-পতন হ'তো, সে-কথা মনে ক'র্‌লেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

মানুষের ঘরে "দরওয়াজা বন্ধ্‌" এ কথাটিও কটু, আর তা'র ঘরে কোথাও পর্দ্দা নেই, এটাও বর্ব্বরতা। মধ্যম পন্থাটাই দেখি সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। দুই বিরুদ্ধ-শক্তির সমন্বয়েই সৃষ্টি, তাদের একান্ত বিচ্ছেদেই প্রলয়, মানুষ, নিজের ব্যবহারক্ষেত্রে এইটেই কেবলি ভোলে আর মার খেয়ে মরে।

সূর্য্যের উদয়াস্ত আজো বাদলার ছায়ায় ঢাকা প'ড়ে রইলো। মেঘের থলিটার মধ্যে কৃপণ আকাশ তা'র সমস্ত সোনার আলো এঁটে বন্ধ ক'রে রেখেচে।

২৬শে সেপ্টেম্বর।

আজ ক্ষণে ক্ষণে রৌদ্র উঁকি মার্‌চে, কিন্তু সে যেন তা'র গারদের গরাদের ভিতর থেকে। তা'র সঙ্কোচ এখনো ঘুচ্‌লো না। বাদল-রাজের কালো উর্দ্দিপরা মেঘগুলো দিকে-দিকে টহল্‌ দিয়ে বেড়াচ্চে।

আচ্ছন্ন সূর্য্যের আলোয় আমার চৈতন্যের স্রোতস্বিনীতে

যেন ভাঁটা প'ড়ে গেচে। জোয়ার আস্‌বে রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে।

পশ্চিমে, বিশেষত আমেরিকায়, দেখেচি, বাপ-মায়ের সঙ্গে অধিকাংশ বয়স্ক ছেলে মেয়ের নাড়ীর টান ঘুচে গেচে। আমাদের দেশে শেষ পর্য্যন্তই সেটা থাকে। তেম্‌নিই দেখেচি সূর্য্যের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ সে-দেশে তেমন যেন অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করে না। সেই বিরল-রৌদ্রের দেশে তা'রা ঘরে সূর্য্যের আলো ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে যখন পর্দ্দা কখনো বা অর্দ্ধেক কখনো বা সম্পূর্ণ নামিয়ে দেয়, তখন সেটাকে আমি ঔদ্ধত্য ব'লে মনে করি।

প্রাণের যোগ নয় তো কী? সূর্য্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইচে। আমাদের প্রাণমন, আমাদের রূপরস, সবই তো উৎসরূপে র'য়েচে ঐ মহা-জ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌর-জগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হ'য়ে ছিল ওরি বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ঐ তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে-তরঙ্গে ঐ আলোই তো প্রবহমান। বাহিরে ঐ আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র, অন্তরে ঐ তেজই মানসভাব ধারণ ক'রে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনায় রাগে অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এতো রং, এতো রূপ, এতো ভাব, এতো রস। ঐ যে-জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক-এক চুমক মদ হ'য়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে সুর হ'য়ে পুঞ্জিত

হ'লো। এখনি আমার চিত্ত হ'তে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেচে, সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্ময়স্বরূপ নয়, যে-জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওঙ্কার-ধ্বনির মতো সংহত হ'য়ে আছে?

হে সূর্য্য, তোমারই তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনা ঘাস হ'য়ে গাছ হ'য়ে আকাশে উঠ্‌চে, ব'ল্‌চে জয় হোক্! ব'ল্‌চে, অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দাও! এই ঢাকা-খোলাই তা'র প্রাণের লীলা, এই ঢাকা-খোলাই তা'র ফুল-ফলের বিকাশ। অপাবৃণু, এই প্রার্থনারই নির্ঝর-ধারা আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা ক'রে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত, প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চ'ল্‌লো। আমি তোমার দিকে বাহু তুলে ব'ল্‌চি, হে পূষন্, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু, তোমার হিরন্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য, তোমার মধ্যে তা'র অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্‌ঘাটিত হোক্।

২৭শে সেপ্টেম্বর

আজ মেঘ সম্পূর্ণ কেটে গেচে। আলোকের দাক্ষিণ্য আজ আকাশে বিস্তীর্ণ, রৌদ্র-চকিত সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে আজ আমন্ত্রণের ইঙ্গিত। সুরলোকের আতিথ্য থেকে আজ একটুও বঞ্চিত হ'তে ইচ্ছা ক'র্‌চে না।

আজকের দিনে কি ডায়ারি লিখ্‌তে একটুও মন সরে? ডায়ারি লেখাটা কৃপণের কাজ। প্রতিদিন থেকে ছোটোবড়ো কিছুই নষ্ট না হোক্, সমস্তই কুড়িয়ে-কুড়িয়ে রাখি, এই ইচ্ছে ওতে প্রকাশ পায়। কৃপণ এগোতে চায় না, আগ্‌লাতে চায়।

বিধাতা আমাকে মস্ত একটি বর দিয়েচেন, সে হ'চ্চে আমার অসামান্য বিস্মরণ-শক্তি। সংবাদের ভাণ্ডারঘরের জিম্মে তিনি আমার হাতে দেননি। প্রহরীর কাজ আমার নয়; আমাকে আমার মনিব প্রহরে প্রহরে ভুলে' যাবার অধিকার দিয়েচেন।

ভুলে'-যেতে দেওয়া যদি হারিয়ে-যেতে দেওয়া হ'তো, তাহ'লে তিনি তেমন বিষম ভুল ক'র্‌তেন না। বসন্ত বারে-বারেই তা'র ফুলের সমারোহ ভুলে' গিয়ে শূন্যসাজি-হাতে অন্যমনস্ক হ'য়ে উত্তরের দিকে চ'লে যায়; সেই ভুলের ফাঁকা রাস্তা দিয়েই ফুলের দল তাদের নবজন্মের সিংহদ্বার খোলা পায়। আমার চৈতন্যের উপরের তলায় আমি এত বেশি ভুলি যে, তা'তে আমার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ভারি অসুবিধা হয়। কিন্তু আমার ভোলা সামগ্রীগুলো চৈতন্যের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে নীচের তলায় নেপথ্যে এসে জড়ো হয়; সেখানে নতুন-নতুন বেশ পরিবর্ত্তনের সুযোগ ঘটে। আমার মনটাকে বিধাতা নাট্য-শালা ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'রেচেন, তা'কে তিনি জাদুঘর বানাতে চান না। তাই জমা-ক'রে পাওয়া আমার লোকসান, হারিয়ে-হারিয়ে পাওয়াই আমার লাভ। এই

হারিয়ে-যাওয়ার ভিতর দিয়ে এক যখন আর সেজে এসে হাজির হয়, তখন তীক্ষ্ণ স্মরণ-শক্তিওয়ালা, বৈজ্ঞানিক যদি সওয়ালজবাব ক'র্‌তে সুরু করে, তা হ'লে মুস্কিল। তখন বিশ্লেষণের চোটে বেরিয়ে পড়্‌তে পারে, যেটাকে নতুন ব'ল্‌চি সেটা পুরোনো, যেটাকে আমার বল্‌চি সেটা আর কারো। কিন্তু সৃষ্টির তো এই লীলা, এইজন্যেই তো তা'কে মায়া বলে। কড়া পাহারা বসিয়ে শিশির-বিন্দুর যদি আঁচল ঝাড়া দেওয়া যায়, তা হ'লে বেরিয়ে প'ড়্‌বে দুটো অদ্ভুত বাষ্প, তাদের নাম যেমন কর্কশ, তাদের মেজাজও তেম্‌নি রাগী। কিন্তু শিশির তবুও স্নিগ্ধ শিশির, তবুও সে মিলনের অশ্রুজলের মতোই মধুর।

কথায় কথায় কথা বেড়ে যায়। ব'ল্‌তে যাচ্ছিলুম ডায়ারি লেখাটা আমার স্বভাবসঙ্গত নয়। আমি ভোলানাথের চেলা, ঝুলি বোঝাই ক'রে আমি তথ্য সংগ্রহ করিনে। আমার জলাশয়ের যে-জলটাকে অন্যমনস্ক হ'য়ে উবে' যেতে দিই, সেইটেই অদৃশ্য শূন্যপথে মেঘ হ'য়ে আকাশে জমে, নইলে আমার বর্ষণ বন্ধ।

তা ছাড়া আমার ব্যক্তিগত জীবনের সব সত্যকেই আমি একটিমাত্র সরকারী বাট্‌খারা দিয়ে ওজন ক'র্‌তে চাইনে। কিন্তু বিশেষ ঘটনার বিশেষ তুলাদণ্ড তৈরি হ'য়ে উঠ্‌তে সময় লাগে। ঘটনা যখনি ঘটে তখনি সেটাকে পাওয়া যায় না। তখন সরকারী পরিমাপের আদর্শ যেটাকে দেখায় ভারি সেটাই হয়তো হাল্‌কা, যেটাকে বুঝি হাল্‌কা

সেটাই হয়তো ভারি। দীর্ঘকালে আনুষঙ্গিক অনেক বাজে জিনিষ ভুলে' যাওয়ার ভিতর দিয়েই বিশেষ জিনিষের বিশেষ ওজন পাওয়া যায়।

যারা জীবন-চরিত লেখে তা'রা সমসাময়িক খাতাপত্র থেকে অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ক'রে লেখে, সেই অচল সংবাদগুলো নিজেকে না কমাতে না বাড়াতে পারে। অথচ আমাদের প্রাণ-পুরুষ তা'র তথ্যগুলোকে পদে-পদে বাড়িয়ে-কমিয়েই এগিয়ে চ'লেচে। অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার ক'রে তা' দিয়ে স্মরণ-স্তম্ভ হ'তে পারে, কিন্তু জীবন-চরিত হবে কী ক'রে? জীবন-চরিত থেকে যদি বিস্মরণধর্ম্মী জীবনটাই বাদ পড়ে, তা হ'লে মৃত-চরিতের কবরটাকে নিয়ে হবে কী? আমি যদি বোকামি ক'রে প্রতিদিনের ডায়ারি লিখে' যেতুম, তা হ'লে তা'তে ক'রে হ'তো আমার নিজের স্বাক্ষরে আমার নিজের জীবনের প্রতিবাদ। তাহ'লে আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র-জীবনের সত্যকে মাটি ক'রে দিত।

যে-যুগে রিপোর্টার ছিল না, মানুষ খবরের কাগজ বের করেনি, তখন মানুষের ভুলে যাবার স্বাভাবিক শক্তি কোনো কৃত্রিম বাধা পেতো না। তাই তখনকার কালের মধ্যে থেকেই মানুষ আপন চিরস্মরণীয় মহাপুরুষদের পেয়েচে। এখন হ'তে আমরা তথ্য-কুড়ুনে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচারকের হাত থেকে প্রতিদিনের মানুষকে পাবো, চিরদিনের মানুষকে সহজে পাবো না। বিস্মরণের বৃহৎ ভিতের উপর স্থাপিত মহাসিংহা-

সনেই কেবল যাঁদের ধরে, সর্ব্বসাধারণের ঠাসাঠাসি ভিড়ে তাঁদের জন্যে জায়গা হবে না। এখন ক্যামেরাওয়ালা, ডায়ারিওয়ালা, নোটটুকনে-ওয়ালা অত্যন্ত সতর্ক হ'য়ে চারিদিকেই মাচা বেঁধে ব'সে।

ছেলেবেলায় আমাদের অন্তঃপুরের যে-বাগানে বিশ্বপ্রকৃতি প্রত্যহই এক-একটি সূর্য্যোদয়কে তা'র নীল থালায় সাজিয়ে এক-একটি বিশেষ উপহারের মতো আমার পুলকিত হৃদয়ের মাঝখানে রেখে দিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌তো, ভয় আছে একদিন আমার কোনো ভাবী চরিতকার ক্যামেরা-হাতে সেই বাগানের ফোটোগ্রাফ নিতে আস্‌বে। সে অরসিক জান্‌বেই না, সে-বাগান সেইখানেই, যেখানে আছে ইদেনের আদিম স্বর্গোদ্যান। বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের প্রতি উদাসীন আর্টিষ্ট্ সেই স্বর্গে যেতেও পারে কিন্তু কোনো ক্যামেরা-ওয়ালার সাধ্য নেই সেখানে প্রবেশ করে—দ্বারে দেবদূত দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতির্ম্ময় খড়্গ হাতে!

এতো বুদ্ধি যদি আমার, আর এতো ভয়, তবে কেন ডায়ারি লিখ্‌তে ব'সেচি? সে-কথা কাল ব'ল্‌বো।

২৮শে সেপ্টেম্বর

যখন কলম্বোতে এসে পৌঁছলুম বৃষ্টিতে দিগ্‌দিগন্তর ভেসে যাচ্চে। গৃহস্থের ঘরে যেদিন শোকের কান্না, যেদিন লোকসানের আলোড়ন, সেদিন তা'র বাড়িতে আগন্তুকদের

অধিকার থাকে না। কলম্বোর অশান্ত আকাশের আতিথ্য সেদিন আমার কাছে তেম্‌নি সঙ্কুচিত হ'য়ে গিয়েছিলো, মনটা নিজেকে বেশ মেলে' দিয়ে বস্‌বার জায়গা পাচ্ছিলো না। বাহির জগতের প্রথম গেট্‌টার কাছেই অভ্যর্থনায় ঔদার্য্যের অভাব দেখে মনে হ'লো, আমার নিমন্ত্রণের ভূমিকাতেই কোন্ কুগ্রহ এমন ক'রে কালী ঢেলে দিলে? দরজাটা খোলা থাক্‌লে হবে কী, নিমন্ত্রণকর্ত্তার মুখে যে হাসি নেই।

এমন সময়ে এই বিমর্ষ দিনের বিমুখতার মধ্যে একটি বাঙালী ঘরের বালিকার একখানি চিঠি পাওয়া গেলো। এই বালিকাই কিছুকাল পূর্ব্বে আমার শিলঙ্‌বাসের একটি পদ্যময় বর্ণনার জরুরী দাবি ক'রে তাড়া দিয়েছিলো। সে দাবি আমি অগ্রাহ্য করিনি। এবার সে আমার এই প্রবাস-যাত্রায় মঙ্গলকামনা জানিয়েচে। মনে হ'লো বাঙালী মেয়ের এই শুভ-ইচ্ছা আমার আজকের দিনের এই বদ্‌মেজাজী ভাগ্যটাকে অনুকূল ক'রে তুল্‌বে।

পুরুষের আছে বীর্য্য, আর মেয়েদের আছে মাধুর্য্য, এ কথাটা সব দেশেই প্রচলিত। আমরা তা'র সঙ্গে আরো একটা কথা যোগ ক'রেচি, আমরা বলি মেয়েদের মধ্যে মঙ্গল। অনুষ্ঠানের যে-সকল আয়োজন, যে-সকল চিহ্ন শুভ সূচনা করে, আমাদের দেশে তা'র ভার মেয়েদের উপর। নারী-শক্তিতে আমরা মধুরের সঙ্গে মঙ্গলের মিলন অনুভব করি। প্রবাসে যাত্রায় বাপের চেয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদের জোর বেশি ব'লে জানি। মনে হয় যেন ঘরের ভিতর থেকে মেয়েদের

প্রার্থনা নিয়ত উঠ্‌চে দেবতার কাছে, ধূপপাত্র থেকে সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ার মতো। সে-প্রার্থনা তাদের সিঁদূরের ফোঁটায়; তাদের কঙ্কণে, তাদের উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনিতে, তাদের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছায়। ভাইয়ের কপালে মেয়েরাই দেয় ভাই-ফোঁটা। আমরা জানি সাবিত্রীই মৃত্যুর হাত থেকে স্বামীকে ফিরিয়েছিলো। নারীর প্রেমে পুরুষের কেবল যে আনন্দ তা নয়, তা'র কল্যাণ।

তা'র মানে, আমরা এক-রকম ক'রে এই বুঝেচি, প্রেম জিনিষটা কেবল যে একটা হৃদয়ের ভাব তা নয়, সে একটা শক্তি, যেমন শক্তি বিশ্বের ভারাকর্ষণ। সর্ব্বত্রই সে আছে। মেয়েদের প্রেম সেই বিশ্বশক্তিকে সহজে নাড়া দিতে পারে। বিষ্ণুর প্রকৃতিতে যে-প্রেমের শক্তি বিশ্বকে পালন ক'র্‌চে সেই শক্তিই তো লক্ষ্মী, বিষ্ণুর প্রেয়সী। লক্ষ্মী-সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবকল্পনা আছে তাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখি নারীর আদর্শে।

লক্ষ্মীতে সৌন্দর্য্য হ'চ্চে পরিপূর্ণতার লক্ষণ। সৃষ্টিতে যতক্ষণ দ্বিধা থাকে ততক্ষণ সুন্দর দেখা দেয় না। সামঞ্জস্য যখন সম্পূর্ণ হয়, তখনি সুন্দরের আবির্ভাব।

পুরুষের কর্ম্মপথে এখনো তা'র সন্ধান চেষ্টার শেষ হয়নি। কোনো কালেই হবে না। অজানার মধ্যে কেবলি সে পথ খনন ক'র্‌চে, কোনো পরিণামের প্রান্তে এসে আজও সে অবকাশ পেলে না। পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্ত্তার তুলি আপন শেষ রেখাটা টানেনি। পুরুষকে অসম্পূর্ণ ই থাক্‌তে হবে।

নারী-প্রকৃতি আপনার স্থিতিতে প্রতিষ্ঠ। সার্থকতার সন্ধানে তা'কে দুর্গম পথে ছুট্‌তে হয় না। জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায় তা'র মধ্যে চরম পরিণতি পেয়েচে। সে জীবধাত্রী, জীবপালিনী, তা'র সম্বন্ধে প্রকৃতির কোনো দ্বিধা নেই! প্রাণসৃষ্টি, প্রাণপালন, ও প্রাণতোষণের বিচিত্র ঐশ্বর্য্য তা'র দেহে মনে পর্য্যাপ্ত। এই প্রাণসৃষ্টি বিভাগে পুরুষের প্রয়োজন অত্যল্প, এইজন্যে প্রকৃতির একটা প্রবল তাগিদ থেকে পুরুষ মুক্ত। প্রাণের ক্ষেত্রে ছুটি পেয়েচে ব'লেই চিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টিকার্য্যের পত্তন ক'র্‌তে পার্‌লে। সাহিত্যে কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্ম্মে বিধি-ব্যবস্থায় মিলিয়ে যা'কে আমরা সভ্যতা বলি, সে হ'লো প্রাণপ্রকৃতির পলাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্টি।

তানের বেগে চঞ্চল গান তা'র সুরসঙ্ঘের প্রবাহ বহন ক'রে ছোট্‌বার সময় যেমন নিজের কল্যাণের জন্যেই একটা মূল লয়ের মূল সুরের স্থিতির দিকে সর্ব্বদাই ভিতরে ভিতরে লক্ষ্য রাখে, তেম্‌নি গতিবেগমত্ত পুরুষের চলমান সৃষ্টি সর্ব্বদাই স্থিতির একটা মূল সুরকে কানে রাখ্‌তে চায়, পুরুষের শক্তি তা'র অসমাপ্ত সাধনার ভার বহন ক'রে চল্‌বার সময় সুন্দরের প্রবর্ত্তনার অপেক্ষা রাখে। সেই স্থিতির ফুলই হ'চ্চে নারীর মাঙ্গল্য, সেই স্থিতির সুরই হ'চ্চে নারীর শ্রীসৌন্দর্য্য।

নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্ত্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তাহ'লেই

তা'র সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলি পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েচে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন ক'রে ক'রে আন্‌চে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য্য সেখান থেকে নির্ব্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত ক'রে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেচে সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি; ভুলেচে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস ক'রে রাখ্‌বার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী ক'রেচে।

এমন সময়ে সেখানে নারী এলো, নন্দিনী এলো; প্রাণের বেগ এসে পড়্‌লো যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত ক'র্‌তে লাগ্‌লো লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্ত্তনায় কী ক'রে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত কর্‌বার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হ'লো, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।

যে-কথাটা ব'ল্‌তে সুরু ক'রেছিলুম সে হ'চ্চে এই যে, পুরুষের অধ্যবসায়ের কোথাও সমাপ্তি নেই, এইজন্যেই সুসমাপ্তির সুধারসের জন্যে তা'র অধ্যবসায়ের মধ্যে একটা প্রবল তৃষ্ণা আছে। মেয়েদের হৃদয়ের মাধুর্য্য এই রসই তা'কে পান করায়। পুরুষের সংসারে কেবলি চিন্তার দ্বন্দ্ব,

সংশয়ের দোলা, তর্কের সংঘাত, ভাঙা-গড়ার আবর্ত্তন। এই নিরন্তর প্রয়াসে তা'র ক্ষুব্ধ দোলায়িত চিত্ত প্রাণলোকের সরল পরিপূর্ণতার জন্যে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হ'য়ে থাকে। মেয়েদের মধ্যে সেই প্রাণের লীলা। বাতাসে লতার আন্দোলনের মতো, বসন্তের নিকুঞ্জে ফুল ফোটাবার মতোই এই লীলা সহজ, স্বতস্ফূর্ত্ত; চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তের পক্ষে পূর্ণতার এই প্রাণময়ী মূর্ত্তি নিরতিশয় রমণীয়। এই সুসমাপ্তির সৌন্দর্য্য, এই প্রাণের সহজ বিকাশ পুরুষের মনে কেবল যে তৃপ্তি আনে, তা নয়, তা'কে বল দেয়,—তা'র সৃষ্টিকে অভাবনীয় রূপে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিতে থাকে। আমাদের দেশে এই-জন্যে পুরুষের সাধনায় মেয়েকে শক্তি ব'লে স্বীকার করে। কর্ম্মের প্রকাশ্য-ক্ষেত্রে এই শক্তিকে দেখিনে; ফুলকে দেখি প্রত্যক্ষ কিন্তু যে গূঢ়-শক্তিতে সেই ফুল ফোটায় তা'কে কোথাও ধরা-ছোঁওয়া যায় না। পুরুষের কীর্ত্তিতে মেয়ের শক্তি তেম্‌নি নিগূঢ়।

২৯ সেপ্টেম্বর

যে-মেয়েটি আমাকে শুভ-ইচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলো তা'র চিঠিতে একটি অনুরোধ ছিলো, "আপনি ডায়ারি লিখ্‌বেন।" তখনি জবাব দিলুম "না, ডায়ারি লিখ্‌বো না।" কিন্তু মুখ দিয়ে একটা কথা বেরিয়ে গেচে ব'লেই যে সেই

কথাটা অটল সত্যের গৌরব লাভ ক'র্‌বে এতবড়ো অহঙ্কার আমার নেই।

তা'র পর ২৪ তারিখে জাহাজে উঠ্‌লুম। বাদলার হাওয়া আরো যেন রেগে উঠ্‌ল—সে যেন একটা অদৃশ্য প্রকাণ্ড সাপের মতো জাহাজটার উপর ক্ষণে-ক্ষণে ছোবল মেরে ফোঁস-ফোঁস ক'র্‌তে লাগ্‌ল। যখন দেখ্‌লুম দুর্দ্দৈবের ধাক্কায় মনটা হার মান্‌বার উপক্রম ক'র্‌চে, তখন তেড়ে উঠে ব'ল্‌লুম, "না, ডায়ারি লিখ্‌বোই"। কিন্তু লেখ্‌বার আছে কী? কিছুই না, যা-তা লিখ্‌তে হবে। সকল লেখার সেরা হ'চ্চে যা-তা লেখা। যথেচ্ছাচারের অধিকার রাজার অধিকার।

বিশেষ কোনো-একজনকে চিঠি লেখ্‌বার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি সাম্‌নে পাওয়া যেতো, তা হ'লে তা'রই নিভৃত-ছায়ার ভিতর দিয়ে আমার নিরুদ্দেশ বাণীকে অভিসারে পাঠাতুম। কিন্তু সে-বীথিকা আজ নেই। তাই অপরিচিত ক্যাবিনে আলো জ্বেলে নিজের কাছেই নিজে ব'ক্‌তে ব'স্‌লুম। আলাপের এই অদ্বৈতরূপ আমার পছন্দসই নয়। সংসারে যখন মনের মতো দ্বৈত দুর্লভ হ'য়ে ওঠে, তখনি মানুষ অদ্বৈত-সাধনায় মনকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চায়। কারণ, সকলের চেয়ে দুর্ব্বিপাক হ'চ্চে অ-মনের মতো দ্বৈত।

হারুনা-মারু জাহাজ
৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

আমার ডায়ারিতে মেয়ে-পুরুষের কথা নিয়ে যে আলোচনা ছিলো, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেচে এই যে, "আচ্ছা, বোঝা গেলো যে, প্রাণের টানে মেয়ে আট্‌কা প'ড়েচে আর পুরুষ ছুটেচে মনের তাড়ায়। তা'র পরে তা'রা যে-প্রেমে মেলে সেটা কি ঠিক একজাতের ?"

গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো যে, প্রাণই বলো আর মনই বলো মেয়ে কিম্বা পুরুষের একেবারে নিজস্ব দখলে নেই। অবস্থা-গতিকে পক্ষভেদে একটা মুখ্য, অন্যটা গৌণ।

মন জিনিষটা প্রাণের ঘরেই মানুষ, প্রাণের অন্ন খেয়ে ; সেই জন্যেই অন্তরে অন্তরে তা'র একটা অকৃতজ্ঞতা আছে। প্রাণের আনুগত্য ছাড়িয়ে একাধিপত্য করবার জন্যে সে প্রায় মাঝে মাঝে আস্ফালন করে। এই বিদ্রোহটা ভিতরে ভিতরে কম বেশি পরিমাণে প্রায় সব পুরুষের মধ্যেই আছে। প্রাণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে তা'র কিছু-না-কিছু কস্‌রৎ এবং কুচ-কাওয়াজ চ'ল্‌চেই। খামকা প্রাণটাকে ক্লিষ্ট করবার বিপন্ন করবার লোভ পুরুষের। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার সখটা পুরুষের ; তা'র একমাত্র কারণ, ঘরের খাওয়াতে তা'কে প্রাণের শাসন মান্‌তে হয় কিন্তু বনের মোষ তাড়ানোতে, প্রাণের প্রতি তা'র যে রাজভক্তি নেই এইটে প্রচার করবার একটা উপলক্ষ্য জোটে; সেটাকে সে

পৌরুষ মনে করে। পুরুষ যুদ্ধ ক'রে এসেচে সব সময়ে যে প্রয়োজন আছে ব'লে তা নয়, কেবল স্পর্দ্ধা ক'রে এইটে দেখাবার জন্যে যে, প্রাণের তাগিদকে সে গ্রাহ্যই করে না। এই জন্যে যুদ্ধ করার মতো এত বড়ো একটা গোঁয়ারের কাজকে পুরুষ চিরকালই অত্যন্ত বেশি সমাদর ক'রেচে; তা'র কারণ এ নয় যে, হিংসা করাটাকে সে ভালো মনে করে; তা'র কারণ এই যে, নানাপ্রকার লোভের ও ভয়ের বন্ধনে প্রাণ তা'কে বেঁধে রাখ্‌বার যে বিস্তৃত আয়োজন ক'রে রেখেচে সেইটেকে সে বিনা প্রয়োজনেও অস্বীকার ক'র্‌তে পারলে গর্ব্ব বোধ করে। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের একটি শিশু বালক আছে, তা'কে দেখি আমাদের বাড়িতে যে-জায়গাটা স্থিতির পক্ষে সবচেয়ে অযোগ্য, পৃথিবীর ভারাকর্ষণ শক্তিটাকে অশ্রদ্ধা জানানো ছাড়া যেখানে ওঠবার আর কোনো হেতুই নেই, সেইখানেই সে চ'ড়ে ব'সে আছে। মাঝে মাঝে ভারাকর্ষণ-শক্তিও তা'কে ছেড়ে কথা কয়নি, কিন্তু তবু তা'কে দমিয়ে দিতে পার্‌লে না। এম্‌নি ক'রে বিদ্রোহে সে হাত পাকাচ্চে আর কি!

মনে আছে, ছেলেবেলায় আমাদের তেতালার ছাদের সঙ্কীর্ণ কার্নিসটার উপর দিয়ে চ'লে যাওয়াটাকে উঁচুদরের খেলা ব'লে মনে ক'র্‌তুম। ভয় ক'র্‌তো না ব'লে নয়, ভয় ক'র্‌তো ব'লেই। ভয় নামক প্রাণের পাহারাওয়ালাটা ঠিক সেই মোড়ের মাথায় দেখা দিতো ব'লেই তা'কে ব্যঙ্গ করাটা মজা ব'লে মনে হ'তো।

পুরুষের মধ্যে এই যে কাণ্ডটা হয় এসমস্তই মনের চক্রান্তে। সে বলে, প্রাণের সঙ্গে আমার নন্-কো-অপারেশন যতই পাকা হবে ততই আমার মুক্তি হবে সহজ। কেন রে বাপু, প্রাণ তোমার কী অপরাধটা ক'রেচে, আর এই মুক্তি নিয়েই বা ক'র্‌বে কী? মন বলে, "আমি অশেষের রাজ্যে সন্ধান ক'র্‌তে বের'বো, আমি দুঃসাধ্যের সাধনা ক'র্‌বো, দুর্গমের বাধা কাটিয়ে দিয়ে দুর্লভকে উদ্ধার ক'রে আন্‌বো। আমি একটু ন'ড়ে ব'স্‌তে গেলেই যে-দুঃশাসন নানারকম ভয় দেখিয়ে আমাকে পিছ-মোড়া ক'রে বাঁধতে আসে তা'কে আমি সম্পূর্ণ হার মানাবো তবে ছাড়্‌বো।" তাই পুরুষ তপস্বী ব'লে বসে, "না খেয়েই বা বাঁচা যাবে না কেন? নিঃশ্বাস বন্ধ ক'র্‌লেই যে ম'র্‌তে হবে এমন কী কথা আছে?" শুধু তাই নয়, এর চেয়েও শক্ত কথা বলে,—বলে, "মেয়েদের মুখ দেখ্‌বো না, তা'রা প্রকৃতির গুপ্তচর, প্রাণ-রাজত্বের যতসব দাস সংগ্রহ করবার তা'রাই আড়কাঠি।" যে-সব পুরুষ তপস্বী নয়, শুনে' তা'রাও বলে "বাহবা।"

প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সাধারণত কোনো মেয়ের দল বলে না, পুরুষকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করাটাই তাদের জীবনের চরম এবং মহোচ্চ লক্ষ্য। সম্প্রতি কোথাও কোথাও কখনো এমন কথার আভাস শোনা যায়, কিন্তু সেটা হ'লো আস্ফালন। প্রাণের রাজ্যে মেয়েদের যে চিরকেলে স্থান আছে, সেখান-কার বন্দরের নোঙর ছিঁড়ে' মনটাকে নিয়ে তা'রা নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাবে এমন কথা দুই একজন মেয়ে ব'ল্‌তেও পারে;

কারণ যাত্রারম্ভে ভাগ্যদেবতা যখন জীবনের সম্বল স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বাঁটোয়ারা ক'রে দেয় তখন প্যাক করবার সময় কিছু যে উল্টোপাল্টা হয় না, তা নয়।

আসল কথা হ'চ্চে প্রকৃতির ব্যবস্থায় মেয়েরা একটা জায়গা পাকা ক'রে পেয়েচে, পুরুষরা তা পায়নি। পুরুষকে চিরদিন জায়গা খুঁজ্‌তে হবে। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে সে কত নতুনেরই সন্ধান পাচ্চে, কিন্তু চরমের আহ্বান তা'কে থাম্‌তে দিচ্চে না, ব'ল্‌চে আরো এগিয়ে এসো।

একজায়গায় এসে যে পৌঁছেচে তা'র একরকমের আয়োজন, আর যাকে চল্‌তে হবে তা'র আর একরকমের। এ তো হওয়াই চাই। স্থিতি যে পেয়েচে, ব'সে ব'সে ক্রমে ক্রমে চারিদিকের সঙ্গে আপন সম্বন্ধকে সে সত্য ক'র্‌তে, পূর্ণ ক'র্‌তে চেষ্টা করে। কেননা সম্বন্ধ সত্য হ'লে তবেই তা'র মধ্যে মুক্তি পাওয়া যায়। যার সঙ্গে ঘর ক'রতে হ'চ্চে তা'র সঙ্গে যদি কেবলি খিটিমিটি বাধ্‌তে থাকে তা হ'লে তা'র মতো জীবনের বাধা আর কিছু নেই। যদি ভালোবাসা হয় তা হ'লেই তা'র সঙ্গে সম্বন্ধের মধ্যে মুক্তি ঘটে। সে-মুক্তি বাইরের সমস্ত দুঃখ অভাবের উপর জয়ী হয়। এই জন্যেই মেয়ের জীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সার্থকতা হ'চ্চে প্রেমে। এই প্রেমে সে স্থিতির বন্ধনরূপ ঘুচিয়ে দেয়। বাইরের অবস্থার সমস্ত শাসনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

মুক্তি না হ'লে কর্ম্ম হ'তে পারে কিন্তু সৃষ্টি হ'তে পারে না। মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে চরমশক্তি হ'চ্চে সৃষ্টি-

শক্তি। মানুষের সত্যকার আশ্রয় হ'চ্চে আপনার সৃষ্টির মধ্যে ;—তা'র থেকে দৈন্যবশত যে বঞ্চিত, সে "পরাবসথ-শায়ী"। মেয়েকেও সৃষ্টি ক'র্‌তে হবে, তবে সে আপনার বাসা পাবে। তা'র পক্ষে এই সৃষ্টি প্রেমের দ্বারাই সম্ভব। যে-পুরুষসন্ন্যাসী নিজের কৃচ্ছ্রসাধনের প্রবল দম্ভে মনে করে যে, যে-হেতু মেয়েরা সংসারে থাকে এই জন্যে তাদের মুক্তি নেই, সে সত্যকে জানে না। যে-মেয়ের মধ্যে সত্য আছে, সে আপন বন্ধনকে স্বীকার ক'রেই প্রেমের দ্বারা তা'কে অতিক্রম করে, বন্ধনকে ত্যাগ করার চেয়ে এই মুক্তি বড়ো। সব মেয়েই যে তা'র জীবনের সার্থকতা পায় তা নয়, সব পুরুষই কি পায় ? অনুরাগের সত্যশক্তি সব মেয়ের নেই, বৈরাগ্যের সত্যশক্তি সব পুরুষে মেলে না।

কিন্তু, অন্তত আমাদের দেশে দেখা যায়, পুরুষ সাধক সংসারকে বন্ধনশালা ব'লেই জানে, তা'র থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে বহুদূরে পালিয়ে যাওয়াকেই মুক্তির উপায় মনে করে। তা'র মানে, আমরা যাকে সংসার বলি স্বভাবত সেটা পুরুষের সৃষ্টিক্ষেত্র নয়। এইজন্যে সেখানে পুরুষের মন ছাড়া পায় না। মেয়েরা যখনই মাতৃত্বের অধিকার পেয়েচে তখনি এমন সকল হৃদয়বৃত্তি পেয়েচে যাতে ক'রে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপন তাদের পক্ষে সহজ হ'তে পারে। এই জন্যে যে-মেয়ের মধ্যে সেই হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ আছে, সে আপনার ঘরসংসারকে সৃষ্টি ক'রে তোলে। এ সৃষ্টি তেম্‌নিই, যেমন সৃষ্টি কাব্য, যেমন সৃষ্টি সঙ্গীত, যেমন সৃষ্টি রাজ্যসাম্রাজ্য। এ'তে কত

সুবুদ্ধি, কত নৈপুণ্য, কত ত্যাগ, কত আত্ম-সংযম পরিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হ'য়ে অপরূপ সুসঙ্গতি লাভ ক'রেচে। বিচিত্রের এই সম্মিলন একটি অখণ্ডরূপের ঐক্য পেয়েচে;—তা'কেই বলে সৃষ্টি। এই কারণেই ঘরকন্নায় মেয়েদের এত একান্ত প্রয়োজন; নির্ভরের জন্যে নয়, আরামের জন্যে নয়, ভোগের জন্যে নয়;—মুক্তির জন্যে। কেননা আত্মপ্রকাশের পূর্ণতাতেই মুক্তি।

পূর্ব্বেই ব'লেচি মেয়েদের এই সৃষ্টির কেন্দ্রগত জ্যোতির উৎস হ'চ্চে প্রেম। এই প্রেম নিজের স্ফূর্ত্তির জন্যে, সার্থকতার জন্যে যাকে চায় সেই জিনিষটি হ'চ্চে মানুষের সঙ্গ। প্রেমের সৃষ্টিক্ষেত্র নিঃসঙ্গ নির্জ্জনে হ'তেই পারে না, সে ক্ষেত্র সংসারে। ব্রহ্মার সৃষ্টির ক্ষেত্র হ'তে পারে শূন্যে, কিন্তু বিষ্ণুর শক্তি খাটে লোক-জগতে। নারী সেই বিষ্ণুর শক্তি, তা'র সৃষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য; ব্যক্তিবিশেষের তুচ্ছতাও প্রেমের কাছে মূল্যবান। ব্যক্তি-বিশেষের ছোটোবড়ো বিচিত্র দাবীর সমস্ত খুঁটিনাটিতে সেই প্রেমের আত্মদানশক্তি নিজেকে বহুধারায় উন্মুক্ত করে। ব্যক্তিবিশেষের সেই নানা ক্ষুধার নানা চাওয়া মেয়ের প্রেমের উদ্যমকে কেবলি জাগিয়ে রেখে দেয়। যে-পুরুষ আপন দাবীকে ছোট করে সে খুব ভালো লোক হ'তে পারে, কিন্তু মেয়েকে সে পীড়া দেয়, অপূর্ণ ক'রে রাখে। এই জন্যে দেখা যায় যে-পুরুষ দৌরাত্ম্য করে বেশি মেয়ের ভালোবাসা সে-ই পায় বেশি।

নারীর প্রেম যে-পুরুষকে চায় তা'কে প্রত্যক্ষ চায়, তা'কে নিরন্তর নানা আকারে বেষ্টন করবার জন্যে সে ব্যাকুল। মাঝখানে ব্যবধানের শূন্যতাকে সে সইতে পারে না। মেয়েরাই যথার্থ অভিসারিকা। যেমন ক'রেই হোক্, যত দুর্গমই হোক্, বিচ্ছেদ পার হবার জন্য তাদের সমস্ত প্রাণ ছট্‌ফট্ ক'র্‌তে থাকে। এই জন্যেই সাধনারত পুরুষ মেয়ের এই নিবিড় সঙ্গবন্ধনের টান এড়িয়ে অতি নিরাপদ দূরত্বের মধ্যে পালাতে ইচ্ছা করে।

পূর্ব্বেই ব'লেচি, আপন পূর্ণতার জন্যে প্রেম ব্যক্তিবিশেষকে চায়। এই ব্যক্তিবিশেষ জিনিষটি অত্যন্ত বাস্তব জিনিষ। তা'কে পেতে গেলে তা'র সমস্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটির কোনোটাকে বাদ দেওয়া চলে না, তা'র দোষ ত্রুটিকেও মেনে নিতে হয়। ব্যক্তিরূপের উপর ভাবের আবরণ টেনে দিয়ে তা'কে অপরূপ ক'রে তোলা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক। অভাবকে অসম্পূর্ণতাকে প্রেম কামনা করে, নইলে তার নিজের সম্পূর্ণতা সফল হবে কিসে?

দেবতার মনের ভাব ঠিকমতো জানি ব'লে অভিমান রাখিনে কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কার্ত্তিকের চেয়ে গণেশের 'পরে দুর্গার স্নেহ বেশি। এমন-কি লম্বোদরের অতি অযোগ্য ক্ষুদ্র বাহনটার পরে কার্ত্তিকের খোষ-পোষাকী ময়ূর লোভদৃষ্টি দেয় ব'লে তা'র পেখমের অপরূপ সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও তা'র উপরে তিনি বিরক্ত; ঐ দীনাত্মা ইঁদুরটা যখন তাঁর ভাণ্ডারে ঢুকে তাঁর ভাঁড়গুলোর গায়ে সিঁধ কাট্‌তে থাকে তখন হেসে তিনি

তা'কে ক্ষমা করেন। শাস্ত্রনীতিজ্ঞ পুরুষবর নন্দী বলে, "মা, তুমি ওকে শাসন করো না, ও বড়ো প্রশ্রয় পাচ্চে।" দেবী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেন, "আহা, চুরি ক'রে খাওয়াই যে ওর স্বধর্ম্ম, তা ওর দোষ কী! ও-যে চোরের দাঁত নিয়েই জন্মেচে, সে কি বৃথা হবে?"

বাক্যের অপূর্ণতাকে সঙ্গীত যেমন আপন রসে পূর্ণ ক'রে তোলে, প্রেম তেম্‌নি সুযোগ্যতার অপেক্ষা করে না, অযোগ্যতার ফাঁকের মধ্যে সে নিজেকে ঢেলে দেবার সুযোগ পায়।

মেয়েদের সৃষ্টির আলো যেমন এই প্রেম, তেম্‌নি পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনাবৃত্তি। পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গ'ড়ে তোলে। "We are the dreamers of dreams," এ কথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মানুষের ইতিহাসে নানা কীর্ত্তির মধ্যে নিরন্তর রূপ-পরিগ্রহ ক'রচে। এই ধ্যান সমগ্রকে দেখ্‌তে চায় ব'লেই বিশেষের অতিবাহুল্যকে বর্জ্জন করে;—যে-সমস্ত বাজে খুঁটিনাটি নিয়ে বিশেষ, সেইগুলো সমগ্রতার পথে বাধার মতো জ'মে ওঠে। নারীর সৃষ্টি ঘরে, এই জন্যে সব-কিছুকেই সে যত্ন ক'রে জমিয়ে রাখ্‌তে পারে; তা'র ধৈর্য্য বেশি, কেননা তা'র ধারণার জায়গাটা বড়ো। পুরুষের সৃষ্টি পথে-পথে, এই জন্যে সব-কিছুর ভার লাঘব ক'রে দিয়ে সমগ্রকে সে পেতেও রাখ্‌তে চায়। এই সমগ্রের তৃষ্ণা, এই সমগ্রের দৃষ্টি নির্ম্মম পুরুষের কত শত কীর্ত্তিকে বহুব্যয়, বহুত্যাগ, বহু-

পীড়নের উপর স্থাপিত ক'রেচে। পুরুষ অমিতব্যয়ী, সে দুঃসাহসিক লোকসানের ভিতর দিয়ে লাভ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হয় না। কারণ, তা'র ধ্যান সমস্ত লোকসানকে পেরিয়ে সমগ্র লাভটাকে সুস্পষ্ট দেখে,—ছোটো ছোটো ক্ষতি তা'র কাছে নগণ্য হ'য়ে যায়। পুরুষের কল্পনাবৃত্তির সাহস এতো অত্যন্ত বেশি, তা'র কারণ, স্থিতির ক্ষেত্রে স্থির হ'য়ে ব'সে বিচিত্রের সহস্র খুঁটিনাটিকে মমত্বের আঁকৃড়ি দিয়ে জড়িয়ে ধরবার দীর্ঘ সময় তা'র কখনো ছিলো না। এই জন্যে সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রলয় ক'র্‌তে তা'র দ্বিধা নেই।

মোট কথা, বাস্তবের মধ্যে যেসব বিশেষের বাহুল্য আছে তা'কে বাদ দিয়ে পুরুষ একের সম্পূর্ণতা খোঁজে। এই জন্যেই অধ্যাত্মরাজ্যে পুরুষেরই তপস্যা, এই জন্যে সন্যাসের সাধনায় এতো পুরুষের এতো আগ্রহ। এবং এই জন্যেই ভাবরাজ্যে পুরুষের সৃষ্টি এতো বেশি উৎকর্ষ এবং জ্ঞানরাজ্যে এতো বেশি সম্পদ লাভ ক'রেচে।

পুরুষের এই সমগ্রতার পিপাসা তা'র প্রেমেও প্রকাশ পায়। সে যখন কোনো মেয়েকে ভালোবাসে তখন তা'কে একটি সম্পূর্ণ অখণ্ডতায় দেখ্‌তে চায় আপনার চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে, ভাবের দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষের কাব্যে বারবার তা'র পরিচয় পাওয়া যায়। শেলির এপিসিকীডিয়ন্‌ প'ড়ে দেখো। মেয়েরা একথা জানে। পুরুষের এই প্রার্থনা মেয়েদের বিশেষ ক'রে সৃষ্টি ক'র্‌তে থাকে। কেননা প্রার্থনার বেগ প্রার্থনার তাপ মানুষের সংসারে সৃষ্টির একটা

প্রধান শক্তি। আমরা কী চাইবো সেটা যদি ঠিকমতো ধ'র্‌তে পারি তা হ'লে আমরা কী পাবো সেটা নিয়ে ভাব্‌তে হয় না। পুরুষেরা একরকম ক'রে চেয়ে চেয়ে মেয়েদের একরকম ক'রে গ'ড়ে তুলেচে। মেয়েরা আপনার জীবনে এতো জায়গায় এতো পর্দ্দা খাটায় এই জন্যে; আপনার থেকে সে কত কী বাদ দিয়ে চলে। আমরা বলি লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। তা'র মানে, লজ্জা হ'চ্চে সেই বৃত্তি যাতে ক'রে মেয়েরা আপনার বাস্তবের বাহুল্যকে সরিয়ে রাখে; মেয়ের রাজ্যে এই জন্যে মস্ত একটা অগোচরতার ব্যবস্থা আছে। সে আপনার এতখানি বাকি রেখেচে যা পুরুষ আপনার মন দিয়ে পূরিয়ে নিতে পারে। সে আপনার খাওয়া-শোওয়া, চাল-চলন, বাসনা-সাধনা সমস্ত থেকেই অতিবাস্তবের প্রত্যক্ষতা এতটা পরিমাণে ঢাকা দেয় যাতে পুরুষের ভাবের মধ্যে তা'র ছবি সম্পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌তে বাধা না পায়।

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের ব্যবহারে সম্পূর্ণ এর উল্টো দিক্‌টাও দেখা যায়। পুরুষ কখনো কখনো এমন কাণ্ড করে যেন নারীর মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তার কোনো আভাস নেই, যেন তা'র মাটির প্রদীপে কোনো আলোই জ্বলেনি; তখন লুব্ধ দাঁত দিয়ে তা'কে সে আখের মতো চিবিয়ে আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলে দেয়। সাত্ত্বিকের ঠিক উল্টোপিঠেই থাকে তামসিক, পূর্ণিমারি অন্য পারে অমাবস্যা। রাস্তার এ দিক্‌টাতে যে-সত্য থাকে ঠিক তা'র সামনের দিকেই তা'র বিপরীতের বাসা। ফেউ সাক্ষ্য দেয় বাঘেরই অস্তিত্বের।

সেই একই কারণে, মেয়ে সংসার-স্থিতির লক্ষ্মী; আবার সংসার ছারখার কর্‌বার প্রলয়ঙ্করীও তা'র মতো কেউ নেই।

যা হোক্, এটা দেখা যাচ্চে, সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালেই মেয়ে নিজের চারদিকেই একটা বিচিত্র চিত্রখচিত বেড়ার দূরত্ব তৈরি ক'রে রেখেচে। দুর্গমকে পার হবার জন্যে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধ্যবসায় আছে, সেইটেকে যতটা পারে সে জাগরূক ক'রে রাখে। প'ড়ে-পাওয়া জিনিষ মূল্যবান হ'লেও তা'তে পুরুষের তৃপ্তি নেই; যা'কে সে জয় ক'রে পায় তা'কেই সে যথার্থ পায় ব'লে জানে; কেননা জয় ক'রে পাওয়া হ'চ্চে মন দিয়ে পাওয়া। এই জন্যে অনেক ছল-যুদ্ধের আয়োজনে মেয়েদের সময় কাটে।

নীতিনিপুণ ব'লে ব'স্‌বে, এই মায়া তো ভালো নয়। পুরুষ নিজেই চিরকাল ধ'রে দাবী ক'র্‌লে এই মায়াকে, এই মায়াসৃষ্টির বড়ো বড়ো উপকরণ সে জুগিয়ে দিলে নিজের কল্পরাজ্য থেকে, কবিরা চিত্রীরা মিলে' নারীর চারদিকে রংবেরঙের মায়া-মণ্ডল আপন ইচ্ছায় বানিয়ে দিলে; অবশেষে এই মায়ার কাছে পরাভবশঙ্কায় ত্রস্ত সাধুসজ্জন মেয়ে জাতকে মায়াবিনী ব'লে গাল দিতে লেগেচে; তা'র মায়াদুর্গের উপরে বহুকাল থেকে তা'রা নীরস শ্লোকের শতঘ্নী বর্ষণ ক'র্‌চে, কোথাও দাগ প'ড়্‌চে না।

যারা বাস্তবের উপাসক তা'রা অনেকে বলে, মেয়েরা অবাস্তবের কুয়াশা দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলেচে—এ সমস্তর ভিতর থেকে একেবারে খাঁটি সত্য মেয়েটিকে উদ্ধার করা

চাই। তাদের মতে সাহিত্যে শিল্পে সব জায়গাতেই এই অবাস্তব মেয়ের ভূতের উপদ্রব অত্যন্ত বেশি। এরা মনে করে মায়া থেকে ছাড়িয়ে নিলেই বাস্তব সত্যকে পাওয়া যাবে।

কিন্তু বাস্তব সত্য ব'লে কোনো জিনিষ কি সৃষ্টিতে আছে? সে সত্য যদি বা থাকে তবে এমন সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার মন কোথায় পাওয়া যাবে যার মধ্যে তা'র বিশুদ্ধ প্রতিবিম্ব প'ড়্তে পারে? মায়াই তো সৃষ্টি; সেই সৃষ্টিকেই যদি অবাস্তব বলো তা হ'লে অনাসৃষ্টি আছে কোন্ চুলোয়, তা'র নাগাল পাবে কোন্ পণ্ডিত?

নানা ছলাকলায়, হাবেভাবে, সাজেসজ্জায় নারী নিজের চারদিকে যে একটি রঙীন্ রহস্য সৃষ্টি ক'রে তুলেচে সেই আবরণটা ছাড়িয়ে নিয়ে দেখাই তা'কে সত্য দেখা এ কথা মানিনে। গোলাপ ফুলের মায়ার পর্দ্দাটা তু'লে ফেলে তা'কে কার্ব্বন নাইট্রোজেন ব'লে দেখা যেমন সত্য দেখা নয় এও তেম্‌নি। তুমি বাস্তববাদী ব'ল্‌বে, গোলাপ ফুলের মায়া অকৃত্রিম, মেয়ের মায়া কৃত্রিম। একেবারেই বাজে কথা। মেয়ে নিজের হাতে রঙ বেঁটে যখন তা'র কাপড় রাঙায় তখন তা'র হাতের গোপনে সেই প্রকৃতিই থাকে যে প্রকৃতি সকলের অগোচরে প্রজাপতির পাখায় নিজের অদৃশ্য তুলি বুলিয়ে দেয়। প্রাণের রাজ্যে মায়ার খেলা কত বর্ণে গন্ধে রসে কত লুকোচুরিতে আভাসে ইসারায় দিনরাত প্রকাশ পাচ্চে। প্রকৃতির সেই সকল নিত্য অথচ অনিত্য

চঞ্চলতায়, সেই সব নিরর্থক হাবভাবেই তো বিশ্বের সৌন্দর্য্য। চিরপলাতকের এই চিরপরিবর্ত্তনশীল লীলা থেকে বাদ দিয়ে যে অতি সারবান ভারবান নিশ্চল ধূলোমাটি লোহাপাথরের পিণ্ডটা বাকি থাকে তা'কেই তুমি বাস্তবসত্য বলো না কি? বসনে ভূষণে, আড়ালে আবডালে, দ্বিধায় দ্বন্দ্বে, ভাবে ভঙ্গীতে মেয়ে তো মায়াবিনীই বটে। তা'র মায়ার জগতে সে ইন্দ্রজাল বিস্তার ক'রেচে, যেমন মায়া, যেমন ইন্দ্রজাল জলে স্থলে, ফুলে ফলে, সমুদ্র পর্ব্বতে, ঝড়ে বন্যায়।

যাই হোক্ এই মায়াবিনীই চাঁদের সঙ্গে, ফুলের সঙ্গে, নববর্ষার মেঘের সঙ্গে, কলনৃত্যভঙ্গিনী নদীর সঙ্গে মিলে' পুরুষের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। এই নারী একটা বাস্তবের পিণ্ড মাত্র নয়, এর মধ্যে কলাসৃষ্টির একটা তত্ত্ব আছে, অগোচর একটি নিয়মের বাঁধনে, ছন্দের ভঙ্গীতে সে রচিত, সে একটি অনির্ব্বচনীয় সুসমাপ্তির মূর্ত্তি। নানা বাজে খুঁটি-নাটিকে সে মধুর নৈপুণ্যে সরিয়ে দিয়েচে, সাজে সজ্জায় চালে চলনে নানা ব্যঞ্জনা দিয়ে নিজেকে সে বস্তুলোকের প্রত্যন্ত-দেশে রসলোকের অধিবাসিনী ক'রে দাঁড় ক'রিয়েচে। "কাজ ক'রে থাকি"—এই কথাটা জানিয়ে পুরুষ হাত খালি রেখেচে; মেয়ে সেই হাতে কাঁকন প'রে জানিয়েচে, "আমি তো কাজ করিনে, আমি সেবা করি।" সেবা হ'লো হৃদয়ের সৃষ্টি, শক্তির চালনা নয়। যে-রাস্তায় চ'ল্‌বে সেই রাস্তাটাকে খুব স্পষ্ট ক'রে নিরীক্ষণ কর্‌বার জন্যে পুরুষ তা'র চোখ দুটো খুলে রেখেচে, ওটাকে সে গম্ভীর ভাষায় বলে দর্শনেন্দ্রিয়। মেয়ে

সেই চোখে একটু কাজলের রেখা টেনে দিয়ে ব'লেচে, চোখ দিয়ে বাইরের জিনিষ দেখা যায় এইটেই চরম কথা নয়, চোখের ভিতরেও দেখ্‌বার জিনিষ আছে, হৃদয়ের বিচিত্র মায়া।

অন্তরে বাহিরে হৃদয়ের রাগরঞ্জিত লীলা নিয়ে পুরুষের জগতে নারী মূর্ত্তিমতী কলালক্ষ্মী হ'য়ে এলো। রস যেখানে রূপ গ্রহণ করে সেই কলামূর্ত্তির গুণ হ'চ্চে এই যে, তা'র রূপ তা'কে অচল বাঁধনে বাঁধে না। খবরের কাগজের সংবাদ-লেখা প্যারাগ্রাফে ছন্দ নেই, রস নেই, সেই জন্যে সে একেবারে নিরেট, সে যা সে তাই মাত্র। মন তা'র মধ্যে ছুটি পায় না। ভালো কবিতা যে-রূপ গ্রহণ করে সে-রূপ নির্দ্দিষ্ট হ'য়েও অনির্দ্দিষ্ট, পাঠকের স্বাতন্ত্র্যকে সে হাঁকিয়ে দেয় না। মনে আছে, বহুকাল হ'লো, রোগশয্যায় কালিদাসের কাব্য আগাগোড়া সমস্ত পড়েছিলুম। যে-আনন্দ পেলুম সে তো আবৃত্তির আনন্দ নয়, সৃষ্টির আনন্দ। সেই কাব্যে আমার মন আপন বিশেষ স্বত্ব উপলব্ধি কর্‌বার বাধা পেলো না। বেশ বুঝ্‌লুম, এ সব কাব্য আমি যেরকম ক'রে প'ড়্‌লুম দ্বিতীয় আর কেউ তেমন ক'রে পড়েনি।

মেয়ের মধ্যেও পুরুষের কল্পনা তেম্‌নি করে'ই আপন মুক্তি পায়। নারীর চারিদিকে যে পরিমণ্ডল আছে তা অনির্ব্বচনীয়তার ব্যঞ্জনা দিয়ে তৈরি: পুরুষের কল্পনা সেখানে আপনার রসের রঙ, আপনার ভাবের রূপ মিলিয়ে দিতে কঠিন বাধা পায় না। অর্থাৎ সেখানে তা'র নিজের

সৃষ্টি চলে এই জন্যে তা'র বিশেষ আনন্দ। মোহমুক্ত মানুষ তাই দেখে' হাসে; কিন্তু মোহমুক্ত মানুষের কাছে সৃষ্টি ব'লে কোনো বালাই নেই, সে প্রলয়ের মধ্যে বাস করে।

পূর্ব্বেই ব'লেচি মেয়ের প্রেম পুরুষের সমস্ত খুঁটিনাটি দোষত্রুটি সমেত বিশেষত্বকে প্রত্যক্ষ ক'রে পেতে চায়। সঙ্গ তা'র নিতান্তই চাই। পুরুষও আপনাকে লুকিয়ে রাখেনি, ঢেকে রাখেনি; সে অত্যন্ত অসজ্জিত এলোমেলো আটপৌরে ভাবেই মেয়ের ভালোবাসার কাছে আগাগোড়া নিজেকে ফেলে' রেখে দিয়েচে; এতেই মেয়ে যথার্থ সঙ্গ পায়, আনন্দ পায়।

কিন্তু পুরুষের পক্ষে মেয়ে আপনার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দূরত্ব নিয়ে আসে; তা'র মধ্যে খানিকটা পরিমাণে নিষেধ আছে, ঢাকা আছে। ফোটোগ্রাফের মধ্যে সব আছে, কিন্তু আর্টিষ্টের ছবির মধ্যে সব নেই, এই জন্যে তা'তে যে-ফাঁকা থাকে সেইখানে রসজ্ঞের মন কাজ ক'র্‌তে পারে। সেই-রকমের ফাঁকাটুকু মেয়েদের একটা সম্পদ, সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত ক'র্‌তে নেই। বিয়াত্রীচে দান্তের কল্পনাকে যেখানে তরঙ্গিত ক'রে তুলেচে সেখানে বস্তুত একটি অসীম বিরহ। দান্তের হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে পেয়েছিলো বিচ্ছেদের দূর আকাশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর হয়তো বাইরের বিচ্ছেদ ছিলো না, কিন্তু কবি যেখানে তা'কে ডেকে ব'ল্‌চে—

তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা,—

সেখানে রজকিনী রামী কোন্ দূরে চ'লে গেচে তা'র ঠিক নেই। হোক্ না সে নয়নের তারা তবুও যে-নারী বেদবাদিনী হরের ঘরণী সে আছে বিরহলোকে। সেখানে তা'র সঙ্গ নেই, ভাব আছে। নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেদনা।

২রা অক্টোবর

আমি ব'ল্‌ছিলুম, মেয়েরা পর্দ্দানসীন্। যে কৃত্রিম পর্দ্দা দিয়ে কৃপণ পুরুষ তাদের অদৃশ্য ক'রে লুকিয়ে রাখে, আমি সেই বর্ব্বর পর্দ্দাটার কথা ব'ল্‌চিনে; নিজেকে সুসমাপ্তভাবে প্রকাশ কর্‌বার জন্যেই তা'রা যেসব আবরণকে সহজপটুত্বে আভরণ ক'রে তুলেচে, আমি তা'র কথাই ব'ল্‌চি। এই যে নিজের দেহকে, গৃহকে, আচরণকে, মনকে নানা বর্ণ দিয়ে ভঙ্গী দিয়ে সংযম দিয়ে অনুষ্ঠান দিয়ে নিজের বিচিত্র একটি বেষ্টনকে তা'রা সুসজ্জিত ক'র্‌তে পেরেচে, এর কারণ, তা'রা স্থিতির অবকাশ পেয়েচে। স্থিতির মূল্যই হ'চ্চে তা'র আবরণের ঐশ্বর্য্যে, তা'র চারিদিকের দাক্ষিণ্যে, তা'র আভাসে, ব্যঞ্জনায়, তা'র হাতে যে-সময় আছে সেই সময়টার মনোহর বৈচিত্র্যে। সবুরে মেওয়া ফলে, কেননা, মেওয়া যে প্রাণের জিনিষ, কলের ফরমাসে তা'কে তাড়াহুড়ো ক'রে গ'ড়ে তোলা যায় না। সেই বহুমূল্য সবুরটা হ'চ্চে স্থিতির ঘরের জিনিষ। এই সবুরটাকে যদি সরস এবং সফল ক'র্‌তে

না পারা গেলো তবে তা'র মতো আপদ আর নেই। মরুভূমি অনাবৃত, তা'র অবকাশের অভাব নেই অথচ সেই অবকাশ রিক্ত, এই কঠিন নগ্নতা পীড়া দেয়। কিন্তু যেখানে পোড়ো জমি পোড়ো হ'য়ে নেই, সেখানে সে ফসলে ঢাকা, ফুলে বিচিত্র; সেখানে তা'র সবুজ ওড়না বাতাসে দুলে' উঠ্‌চে। যে-পথিক পথে চলে সেখানেই সে পায় তা'র তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন, তা'র আরামের ছায়া, ক্লান্তির শুশ্রূষা। সেখানকার স্থিতির পূর্ণতাই তা'র গতির সহায়, অবারিত মরুভূমি সবচেয়ে বাধা। নারী স্বভাবতই যে-স্থিতি পেয়েচে, ব'সে ব'সে ধীরে ধীরে সেই স্থিতিকে রাঙিয়ে তুলে আপন হৃদয়-রসে রসিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে আপন বুকের কাঁচলি আপন মুখের ঘোমটা বানিয়েচে। এই ঢাকাতেই সে আপনার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ক'রেচে, পুষ্প-পল্লবের আবরণেই যেমন লতার ঐশ্বর্য্য।

কিন্তু হঠাৎ আজকাল পাশ্চাত্য সমাজে শুন্‌তে পাচ্চি, নারী ব'ল্‌চে, "আমি মায়ার আবরণ রাখ্‌বো না, পুরুষের সঙ্গে ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবো। আমি হবো বিজ্ঞানের চাঁদ; তা'র চারিদিকে বায়ুমণ্ডল নেই, মেঘ নেই, রঙ্ নেই, কোমল শ্যামলের চঞ্চল বিচিত্রতা নেই, তা'র কালো কালো ক্ষতগুলোর উপরে পর্দ্দা নেই, আমিও হবো তেম্‌নি। এতদিন যাকে ব'লে এসেচি লজ্জা, যা'কে ব'লে এসেচি শ্রী, আজ তা'তে আমার পরাভব ঘ'ট্‌চে, সেসব বাধা বর্জ্জন ক'র্‌বো। পুরুষের চালে তা'র সমান তালে পা ফেলে' তা'র সমান

রাস্তায় চ'ল্‌বো।" এমন কথা যে একদল স্ত্রীলোকের মুখ দিয়ে বের হ'লো এটা সম্ভব হ'ল কী ক'রে? এ'তে বোঝা যায় পুরুষের প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন এসেচে। মেয়েকে সে চাচ্চে না। এমন নয় যে সে হঠাৎ সন্ন্যাসী হ'য়ে উঠেচে,—ঠিক তা'র উল্টো; সে হ'য়েচে বিষয়ী, মেয়েকে সে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে' নিতে চায়, কড়ায় গণ্ডায় যার হিসাব মেলে না তা'কে সে মনে করে বাজে জিনিষ, তা'কে সে মনে করে ঠকা। সে বলে, আমি চোখ খুলে' তন্ন তন্ন ক'রে দেখ্‌বো; অর্থাৎ ধ্যানের দেখায় যা মনকে ভরিয়ে তোলে সেটাকে সে জানে ফাঁকি। কিন্তু পুরুষের সংসারে সত্যকার মেয়ে তো কেবলমাত্র চোখের দেখার নয়, সে তো ধ্যানের জিনিষও বটে। সে যে শরীরী অশরীরী তু'য়ে মিলিয়ে, পৃথিবী যেমন নিজের মাটি ধূলো এবং নিজের চারদিকের অসীম আকাশ ও বায়ুমণ্ডল মিলিয়ে। মেয়ের যা অশরীরী তা যে শরীরী মেয়েকে ঘিরে' আছে,—তা'র ওজন নেই কিন্তু তা'র বর্ণ আছে, ভঙ্গী আছে; তা ঢাকে অথচ তা প্রকাশ করে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় যারা উন্নতির বড়াই করে, তা'রা ব'ল্‌বে এই মেয়েলির প্রতি অসহিষ্ণুতায় চলার উৎসাহ প্রকাশ পায়। আমার মনে হয় এটাই থাম্‌বার পূর্ব্ব লক্ষণ। চলার ছন্দই থাকে না যদি স্থিতির সঙ্গে তা'র সমস্ত অপোষ একেবারেই মিটে' যায়। গাড়িটার ঘোড়াও চ'ল্‌চে, সারথিও চ'ল্‌চে, যাত্রীরাও চ'ল্‌চে, গাড়ির জোড় খুলে' গিয়ে তা'র

অংশ প্রত্যংশগুলোও চ'ল্‌চে, এ'কে তো চলা বলে না, এ হ'চ্চে মরণোন্মুখ চলার উন্মত্ত প্রলাপ, সাংঘাতিক থামার ভূমিকা। মেয়েরা সমাজের চলাকেই স্থিতির ছন্দ দেয়—সে সুন্দর।

একদল মেয়ে ব'ল্‌তে সুরু ক'রেচে যে, "মেয়ে হওয়াতে আমাদের অগৌরব, আমাদের ক্ষতি। অর্থাৎ আমাদের আত্মপ্রকাশের ধারায় পুরুষের সঙ্গে প্রভেদটাতে পীড়া পাচ্চি।" এর থেকে বোধ হ'চ্চে একদিন যে-পুরুষ সাধক ছিলো এখন সে হ'য়েচে বণিক। বণিক বাইরের দিকে যদিবা চলে, অন্তরের দিকে আপনার সঞ্চয়ের বোঝার কাছে সতর্ক হ'য়ে প'ড়ে আছে। তা'র স্থিতি সারবান কিন্তু সুন্দর নয়। তা'র কারণ মানুষের সম্বন্ধকে হৃদয়মাধুর্য্যে সত্য ক'রে পূর্ণ ক'রে তোলা তা'র স্থিতির ধর্ম্ম নয়। ধনসঞ্চয়ের তলায় মানুষের সম্বন্ধকে চাপা দিয়ে চ্যাপ্‌টা ক'রে দেওয়াই হ'য়েচে তা'র কাজ। সুতরাং সে যে কেবল চলে না তা নয়, আপন স্থিতিকে ভারগ্রস্ত নীরস নির্ম্মম অসুন্দর করে। অঙ্কের কোঠার মধ্যে যাকে ধরে না তা'কে সে আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলে' দেয়।

পুরুষ একদিন ছিলো mystic, ছিলো অতল রসের ডুবারি, ছিলো ধ্যানী। এখন সে হ'য়েচে মেয়েদের মতোই সংসারী। কেবল প্রভেদ এই যে, তা'র সংসারে আলো নেই, বাতাস নেই আকাশ নেই; বস্তুপিণ্ডে সমস্ত নিরেট। সে ভারি ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মধ্যে সেই আকাশ সে পায় না যে-আকাশে আপন কল্পনাকে রূপে রসে মুক্তি দিতে পারে।

আজকালকার কবি আপন কাব্যে, শিল্পী আপন কারুতে অনির্ব্বচনীয়কে সুন্দরকে অবজ্ঞা প্রকাশ ক'র্‌তে আরম্ভ ক'রেচে। এটা কি পৌরুষের উল্টো নয়? পুরুষই তো চিরদিন সুন্দরের কাছ থেকে আপন শক্তির জয়মাল্য কামনা ক'রেচে। Mystic পুরুষ ধ্যানশক্তিতে, তা'র ফলাসক্তিবিহীন সাধনায় বাস্তবের আবরণ একটার পর একটা যতই মোচন ক'রেচে ততই রসের লোকে, অধ্যাত্মলোকে সে ভূমার পরিচয় পেয়েচে। আজ কেবলি সে থলির পর থলির মুখ বাঁধ্‌চে, সিন্ধুকের পর সিন্ধুকে তালা লাগাচ্চে,—আজ তা'র সেই মুক্তি নেই যে-মুক্তির মধ্যে সুন্দর আপন সিংহাসন রচনা করে। তাই তা'র মেয়েরা ব'ল্‌চে, আমরা পুরুষ সাজ্‌বো, তাই তা'র কাব্যসরস্বতী ব'ল্‌চে, বীণার তারগুলোকে যত্ন ক'রে না বাঁধ্‌লে যে-সুরটা ঝন্‌ঝন্‌ ক'র্‌তে থাকে সেইটেই খাঁটি বাস্তবের সুর, উপেক্ষার উচ্ছৃঙ্খল দুরন্তপনায় রূপের মধ্যে যে-বিপর্য্যয়, যে-ছিন্নভিন্নতা ঘটে সেইটেই আর্ট্‌।

দিন চ'লে গেলো। ভু'লে ছিলুম যে, সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে চ'লেচি। মন চ'লেছিলো আপন রাস্তায়,—এক ভাবনা থেকে আরেক্‌ ভাবনায়। চ'লেছিলো ব'ল্‌লে বেশি বলা হয়। উট যেমন বোঝা পিঠে নিয়ে মরুর মধ্যে পথ আন্দাজ ক'রে চলে, এ তেমন চলা নয়,—এ যেন পথের খেয়াল না রেখে ভেসে যাওয়া, কোনো বিশেষ ঘাটের কাছে বায়না না নিয়ে শুধু-শুধু বেরিয়ে পড়া; কথাগুলোকে নিজের চেষ্টায় চালনা না ক'রে, দিকের হিসেব না রেখে, তাদের আপনার ঝোঁকে চ'ল্‌তে

দেওয়া। তা'র সুবিধা হ'চ্চে এই যে, কথাগুলো নিজেরাই হয় বক্তা, আর মনটা হয় শ্রোতা। মন তখন অন্যকে কিছু দেবার কথা ভাবে না, নিজের কাছ থেকে নিজে পায়। মনের ভূগোলে অনাবিষ্কৃতের আর অন্ত নেই। সেসব জায়গায় পৌঁছে দেবার পথগুলো সবই নদীর মতো, অর্থাৎ সে-পথ নিজে চলে ব'লেই চালায়;—তা'রই স্রোতে মন আপনাকে ভাসিয়ে দিতে পার্‌লে নিজের মধ্যে অপরিচিতের পরিচয় পেতে থাকে। আর্য্যাবর্ত্তের বুকের উপর দিয়ে যে-গঙ্গা চ'লে গেচে, সেই তো ভারতবর্ষের অপরিচিত পূর্ব্বের সঙ্গে অপরিচিত পশ্চিমকে সহজেই মুখোমুখি ক'রে দিয়েছিলো। তেম্‌নি যে-মানুষের মনের মাঝখান দিয়ে চ'ল্‌তি নদী থাকে সে মানুষ আপনার কাছ থেকে আপনি শিক্ষা কর্‌বার সুযোগ পায়। আমার মনে সেই নদীটা আছে। তা'রই ডাকে ছেলেবেলায় আমি ইস্কুল পালিয়েছিলুম। যেসব জ্ঞান শিখে' শিখ্‌তে হয় তা'র বিস্তর অভাব র'য়ে গেলো কিন্তু অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ হ'য়েচে। সে জন্যে আমার মনের ভিতরকার ভাগীরথীকে আমি প্রণাম করি।

বাইরে ডেক্‌-এ এসে দাঁড়ালুম। তখন সূর্য্য অল্পক্ষণ আগেই অস্ত গেচে। শান্ত সমুদ্র, মৃদু বাতাসটা যেন মুখচোরা। জল ঝিল্‌মিল ক'র্‌চে। পশ্চিম দিক্‌প্রান্তে দু-একটা মেঘের টুক্‌রো সোনার ধারায় অভিষিক্ত হ'য়ে স্থির হ'য়ে প'ড়ে আছে। আর-একটু উপরে তৃতীয়ার চাঁদের কণা। সেখানকার আকাশে তখনো সন্ধ্যার ঘোর লাগেনি

—দিনের সভা যদিও ভেঙে গেচে, তবু সেখানে তা'র সাদা জাজিমখানা পাতা। চাঁদটাকে দেখে' মনে হ'চ্চে যেন অসময়ে অজায়গায় এসে প'ড়েচে। যেন এক-দেশের রাজপুত্র আরেক রাজার দেশে হঠাৎ উপস্থিত, যথোচিত অভ্যর্থনার আয়োজন হয়নি,—তা'র নিজের অনুচর তারাগুলো পিছিয়ে প'ড়েচে। এদিকে ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম আকাশের সমস্ত সোনার মশাল, সমস্ত সমারোহ সূর্য্যের অস্তযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত, ঐ চাঁদটুকুকে কেউ দেখ্‌তেই পাচ্চে না।

এই জনশূন্য সমুদ্র ও আকাশের সঙ্গমস্থলে পশ্চিম দিগন্তে একখানি ছবি দেখ্‌লুম। অল্প কয়েকটি রেখা, অল্প কিছু উপকরণ; আকাশ এবং সমুদ্রের নীলের ভিতর দিয়ে অবসান দিনের শেষ আলো যেন তা'র শেষ কথাটি কোনো একটা জায়গায় রেখে যাবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে বেরিয়ে আস্‌তে চায়, কিন্তু উদাস শূন্যের মধ্যে ধ'রে 'রাখ্‌বার জায়গা কোথাও না পেয়ে ম্লান হ'য়ে প'ড়্‌চে,—এই ভাবটিই যেন সেই ছবিটির ভাব।

ডেক্‌-এর উপর স্তব্ধ দাঁড়িয়ে শান্ত একটি গভীরতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে আমি যা দেখলুম তা'কে আমি বিশেষ অর্থেই ছবি ব'ল্‌চি, যা'কে বলে দৃশ্য, এ তা নয়। অর্থাৎ এর মধ্যে যা-কিছুর সমাবেশ হ'য়েচে, কেউ যেন সেগুলিকে বিশেষভাবে বেছে নিয়ে পরস্পরকে মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণতার মধ্যে সাজিয়ে ধ'রেচে। এমনি একটি সরল গভীর মহৎ সম্পূর্ণতার ছবি ক'লকাতার আকাশে একমুহূর্ত্তে এমন সমগ্র

হ'য়ে আমার কাছে হয়তো দেখা দিতো না। এখানে চারিদিকের এই বিপুল রিক্ততার মাঝখানে এই ছবিটি এমন একান্ত এক হ'য়ে উঠে' আমার কাছে প্রকাশ পেলে। এ'কে সম্পূর্ণ ক'রে দেখবার জন্যে এতবড়ো আকাশ এবং এতো গভীর স্তব্ধতার দরকার ছিলো।

জাপানের কথা আমার মনে পড়ে। ঘরের মধ্যে একেবারে কোনো আসবাব নেই। একটি দেয়ালে একখানি ছবি ঝুল্‌চে। ঐ ছবি আমার সমস্ত চোখ একা অধিকার করে; চারিপাশে কোথাও চিত্তবিক্ষেপ কর্‌বার মত কিছুই নেই। রিক্ততার আকাশে তা'র সমস্ত অর্থটি জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে প্রকাশ পায়। ঘরে যদি নানা জিনিষ ভিড় ক'র্‌তো, তবে তাদের মধ্যে এই ছবি থাক্‌তো একটি আসবাবমাত্র হ'য়ে, তা'র ছবির মাহাত্ম্য ম্লান হ'তো, সে আপনার সব কথা ব'ল্‌তে পা'র্‌তো না।

কাব্য সঙ্গীত প্রভৃতি অন্য সমস্ত রসসৃষ্টিও এই-রকম বস্তুবাহুল্যবিরল রিক্ততার অপেক্ষা রাখে। তাদের চারিদিকে যদি অবকাশ না থাকে তা হ'লে সম্পূর্ণ মূর্ত্তিতে তাদের দেখা যায় না। আজকালকার দিনে সেই অবকাশ নেই, তাই এখনকার লোকে সাহিত্য বা কলাসৃষ্টির সম্পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত। তা'রা রস চায় না, মদ চায়; আনন্দ চায় না, আমোদ চায়। চিত্তের জাগরণটা তাদের কাছে শূন্য, তা'রা চায় চমক লাগা। ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে অন্যমনস্কের মন যদি কাব্যকে গানকে পেতে হয় তা হ'লে তা'র খুব

আড়ম্বরের ঘটা করা দরকার। কিন্তু সে-আড়ম্বরে শ্রোতার কানটাকেই পাওয়া যায় মাত্র, ভিতরের রসের কথাটা আরো বেশি ক'রে ঢাকাই পড়ে। কারণ, সরলতা স্বচ্ছতা আর্টের যথার্থ আভরণ। যেখানে কোলাহল বেশি, ভিড় বৃহৎ, মন নানা-কিছুতে বিক্ষিপ্ত, আর্ট্ সেখানে কস্‌রৎ দেখাবার প্রলোভনে মজে, আপনাকে দেখাতে ভুলে' যায়। আড়ম্বর জিনিষটা একটা চীৎকার; যেখানে গোলমালের অন্ত নেই সেখানে তা'কে গোচর হ'য়ে ওঠ্‌বার জন্যে চীৎকার ক'র্‌তে হয়, সেই চীৎকারটাকেই ভিড়ের লোক শক্তির লক্ষণ জেনে পুলকিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু আর্ট্ তো চীৎকার নয়, তা'র গভীরতম পরিচয় হ'চ্চে তা'র আত্মসম্বরণে। আর্ট্ বরঞ্চ ঠেলা খেয়ে চুপ ক'রে যেতে রাজি আছে, কিন্তু ঠেলা মেরে পালোয়ানি করার মতো লজ্জা তা'র আর নেই। হায়রে, লোকের মন, তোমাকে খুসি কর্‌বার জন্যে রামচন্দ্র একদিন সতীকে বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন,—তোমাকে ভোলাবার জন্যেই আর্ট্ আজ আপনার শ্রী ও হ্রী বিসর্জ্জন দিয়ে নৃত্য ভুলে' পাঁয়তাড়া মেরে বেড়াচ্চে।

৩ অক্টোবর, ১৯২৪।
হারুনা-মারু জাহাজ

এখনো সূর্য্য ওঠেনি। আলোকের অবতরণিকা পূর্ব্ব আকাশে। জল স্থির হ'য়ে আছে সিংহবাহিনীর পায়ের

তলাকার সিংহের মতো। সূর্য্যোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে ম'জে গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ ছন্দে-গাঁথা এই কথাটা আপ্‌নিই ভেসে উঠ্‌লো :—

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড়ো বারে বারে ?

বুঝ্‌তে পার্‌লুম, আমার কোনো একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌঁছবার আগেই তা'র ধুয়োটা এসে পৌঁছেচে। এইরকমের ধুয়ো অনেক সময়ে উড়ো বীজের মতো মনে এসে পড়ে, কিন্তু সব সময়ে তাকে এমন স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের দূর তীরে যে-ধরণী আপনার নানা-রঙ্‌ আঁচল-খানি বিছিয়ে দিয়ে পূবের দিকে মুখ ক'রে একলা ব'সে আছে, ছবির মতো দেখ্‌তে পেলুম তা'র কোলের উপর একখানি চিঠি প'ড়্‌লো খ'সে কোন্‌ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে ধ'রে সে একমনে পড়্‌তে ব'সে গেলো ; তাল-তমালের নিবিড় বনচ্ছায়া পিছনে রইলো এলিয়ে, নুয়ে-পড়া মাথার-থেকে ছড়িয়ে-পড়া এলোচুল।

আমার কবিতার ধুয়ো ব'ল্‌চে, প্রতিদিন সেই একই চিঠি। সেই একখানির বেশি আর দরকার নেই ; সেই ওর যথেষ্ট। সে এত বড়ো, তাই সে এত সরল। সেই একখানিতেই সব আকাশ এমন সহজে ভ'রে গেচে।

ধরণী পাঠ ক'র্‌চে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-করাটা

আমি মনে মনে চেয়ে দেখ্‌চি। সুরলোকের বাণী পৃথিবীর বুকের ভিতর দিয়ে কণ্ঠের ভিতর দিয়ে, রূপে রূপে বিচিত্র হ'য়ে উঠ্‌লো। বনে বনে হ'লো গাছ, ফুলে ফুলে হ'লো গন্ধ, প্রাণে প্রাণে হ'লো নিঃশ্বসিত। একটি চিঠির সেই একটি মাত্র কথা,—সেই আলো। সেই সুন্দর, সেই ভীষণ; সেই হাসির ঝিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কান্নার কাঁপনে ছলছল।

এই চিঠি-পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত,—যে দিচ্চে আর যে পাচ্চে, সেই দু'জনের কথা এতে মিলেচে, সেই মিলনেই রূপের ঢেউ। সেই মিলনের জায়গাটা হ'চ্চে বিচ্ছেদ। কেননা, দূর-নিকটের ভেদ না ঘ'ট্‌লে স্রোত বয় না, চিঠি চলে না। সৃষ্টি-উৎসের মুখে কী-একটা কাণ্ড আছে, সে এক ধারাকে দুই-ধারায় ভাগ করে। বীজ ছিলো নিতান্ত এক, তাকে দ্বিধা ক'রে দিয়ে দু'খানি কচি পাতা বেরোলো, তখনি সেই বীজ পেলো তা'র বাণী; নইলে সে বোবা, নইলে সে কৃপণ, আপন ঐশ্বর্য্য আপ্‌নি ভোগ ক'র্‌তে জানে না। জীব ছিলো একা, বিদীর্ণ হ'য়ে স্ত্রী-পুরুষে সে দুই হ'য়ে গেলো। তখনি তা'র সেই বিভাগের ফাঁকের মধ্যে ব'স্‌লো তা'র ডাক-বিভাগ। ডাকের পর ডাক, তা'র অন্ত নেই। বিচ্ছেদের এই ফাঁক একটা বড়ো সম্পদ্‌, এ নইলে সব চুপ, সব বন্ধ। এই ফাঁকটার বুকের ভিতর দিয়ে একটা অপেক্ষার ব্যথা, একটা আকাঙ্ক্ষার টান টন্‌টন্‌ ক'রে উঠ্‌লো, দিতে-চাওয়ার আর পেতে-চাওয়ার উত্তর-প্রত্যুত্তর এ-পারে ও-পারে চালা-

'চালি হ'তে লাগ্‌লো। এ'তেই দুলে উঠ্‌লো সৃষ্টি-তরঙ্গ, বিচলিত হ'লো ঋতু-পর্য্যায়; কখনো বা গ্রীষ্মের তপস্যা, কখনো বর্ষার প্লাবন, কখনো বা শীতের সঙ্কোচ, কখনো বা বসন্তের দাক্ষিণ্য। এ'কে যদি মায়া বলো তো দোষ নেই, কেননা এই চিঠি-লিখনের অক্ষরে আব্‌ছায়া, ভাষায় ইসারা;— এর আবির্ভাব-তিরোভাবের পূরো মানে সব সময়ে বোঝা যায় না। যাকে চোখে দেখা যায় না, সেই উত্তাপ কখন্‌ আকাশ-পথ থেকে মাটির আড়ালে চ'লে যায়; মনে ভাবি একেবারেই গেলো বুঝি। কিছু কাল যায়, একদিন দেখি মাটির পর্দ্দা ফাঁক ক'রে দিয়ে একটি অঙ্কুর উপরের দিকে কোন্‌-এক আর-জন্মের চেনা-মুখ খুঁজ্‌চে। যে-উত্তাপটা ফেরার হ'য়েচে ব'লে সেদিন রব উঠ্‌লো, সেই তো মাটির তলার অন্ধকারে সেঁধিয়ে কোন্‌ ঘুমিয়ে-পড়া বীজের দরজায় ব'সে ব'সে ঘা দিচ্ছিলো। এম্‌নি ক'রেই কত অদৃশ্য ইসারার উত্তাপ এক-হৃদয়ের থেকে আর-এক হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন্‌ চোর-কোঠায় গিয়ে ঢোকে, সেখানে কার সঙ্গে কী কানাকানি করে জানিনে, তা'র পরে কিছুদিন বাদে একটি নবীন বাণী পর্দ্দার বাইরে এসে বলে "এসেচি"।

আমার সহযাত্রী বন্ধু আমার ডায়ারি প'ড়ে ব'ল্‌লেন, "তুমি ধরণীর চিঠি পড়ায় আর মানুষের চিঠি পড়ায় মিশিয়ে দিয়ে একটা যেন কী গোল পাকিয়েচো। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহী-বিরহিণীর বেদনাটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে। তোমার এই লেখায় কোন্‌খানে রূপক কোন্‌খানে শাদা কথা

বোঝা শক্ত হ'য়ে উঠেচে।” আমি ব'ল্লুম, কালিদাস যে মেঘদূত কাব্য লিখেচেন সেটাও বিশ্বের কথা। নইলে তা'র একপ্রান্তে নির্ব্বাসিত যক্ষ রামগিরিতে, আর-একপ্রান্তে বিরহিণী কেন অলকাপুরীতে? স্বর্গ-মর্ত্ত্যের এই বিরহই তো সকল সৃষ্টিতে। এই মন্দাক্রান্তাছন্দেই তো বিশ্বের গান বেজে উঠ্‌চে। বিচ্ছেদের ফাঁকের ভিতর দিয়ে অণু-পরমাণু নিত্যই যে-অদৃশ্য চিঠি চালাচালি করে, সেই চিঠিই সৃষ্টির বাণী। স্ত্রী-পুরুষের মাঝখানেও, চোখে-চোখেই হোক্, কানে-কানেই হোক্, মনে মনেই হোক্, আর কাগজে-পত্রেই হোক্, যে-চিঠি চলে সেও ঐ বিশ্ব-চিঠিরই একটি বিশেষ রূপ।

৫ অক্টোবর।

মানুষের আয়ুতে ষাটের কোঠা অস্ত দিগন্তের দিকে হেলে'-পড়া। অর্থাৎ উদয়ের দিগন্তটা এই সময়ে সাম্‌নে এসে পড়ে, পূর্ব্ব-পশ্চিমে মুখোমুখি হয়।

জীবনের মাঝ-মহলে, যে-কালটাকে বলে পরিণত বয়স, সেই সময়ে অনেক বড়ো বড়ো সঙ্কল্প, অনেক কঠিন সাধনা, অনেক মস্ত লাভ, অনেক মস্ত লোকসান এসে জমেছিলো। সব জড়িয়ে ভেবেচি এইবার আসা গেলো পাকা-পরিচয়ের কিনারাটাতে। সেই সময়ে কেউ যদি হঠাৎ এসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তো, “তোমার বয়স কত?” তা হ'লে আমার গোড়ার দিকের ৩৬টা বছর সরিয়ে রেখে ব'ল্‌তুম, আমি হ'চ্চি বাকি-

টুকু। অর্থাৎ আমার বয়স হ'চ্চে কুষ্টির শেষদিকের সাতাশ। এই পাকা সাতাশের রকম-সকম দেখে' গম্ভীর লোকে খুসি হ'লো। তা'রা কেউ ব'ল্‌লে নেতা হও, কেউ ব'ল্‌লে সভাপতি হও, কেউ ব'ল্‌লে উপদেশ দাও। আবার কেউ বা ব'ল্‌লে দেশটাকে মাটি ক'র্‌তে বসেচো। অর্থাৎ স্বীকার ক'র্‌লে দেশটাকে মাটি ক'রে দেবার মতো অসামান্য ক্ষমতা আমার আছে।

এমন সময়ে ঘাটে প'ড়লুম। একদিন বিকেল বেলায় সাম্‌নের বাড়ির ছাতে দেখি দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি-গায়ে যা-খুসি ক'রে বেড়াচ্চে। ঠিক সেই সময়ে চা খেতে-খেতে একটা জরুরি কথা ভাব্‌চি।

ভাবনাটা একদমে এক-লাইন থেকে আর-এক লাইনে চ'লে গেলো। হঠাৎ নিতান্ত এই একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে উঠ্‌লো, যে, ঐ ছেলেটা এই অপরাহ্নের আকাশের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ মিশ খেয়ে গেচে; কোনো একটা অন্যমনস্ক-তার ঠেলায় বিশ্ব-পৃথিবীর সঙ্গে ওর জোড় ভেঙে যায়নি। সমস্ত দিগ্‌দিগন্তরকে ঐ ছেলে তা'র সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে পেয়েচে, দিগম্বর শিবের মতো। কিসে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দিলে যে, অম্‌নি ক'রেই নগ্ন হ'য়ে সমস্তর মধ্যে মগ্ন হ'য়ে নিখিলের আঙিনায় আমিও একদিন এসে দাঁড়িয়েছিলুম। মনে হ'লো সেটা কম কথা নয়। অর্থাৎ আজো যদি বিশ্বের স্পর্শ প্রত্যক্ষ প্রাণের মধ্যে তেম্‌নি ক'রে এসে লাগ্‌তো তা হ'লে ঠক্‌তুম না। তা হ'লে আমার জীবন-

ইতিহাসের মধ্য-যুগে অকালে যুগান্তর অবতারণার যে-সব আয়োজন করা গেচে, তা'র ভার আমার চেয়ে যোগ্যতর লোকের হাতেই পড়্‌তো, আর বাদ্‌শাই কুঁড়ের সিংহাসনটা আমি স্থায়ীরূপে দখল ক'রে বস্‌বার সময় পেতুম। সেই কুঁড়েমির ঐশ্বর্য্য আমি যে একলা ভোগ ক'র্‌তুম তা নয়, এই রসের রসিক যারা তাদের জন্যে ভাণ্ডারের দ্বার খুলে' দিয়ে বলা যেতো, পীয়তাং ভুজ্যতাম্।

চায়ের পাত্রটা ভুলে' গিয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, যে-পুলকটাতে আজ মন আবিষ্ট হ'য়েচে সেটার কথা সবাইকে বুঝিয়ে বলি কী ক'রে? বয়স যখন ৩৬-এর নীচে ছিলো, তখন বলাই আমার কাজ ছিলো, বুঝিয়ে বলার ধার ধার্‌তুম না। কেননা তখন তেপান্তর মাঠের মাঝখানটাতে আমার ঘোড়া ছুট্‌চে, যারা না বুঝে কিছুতেই ছাড়ে না, তা'রা আমার ঠিকানা পায়নি। আজ পনেরো-ষোলো, বিশ-পঁচিশ আশি-পঁচাশি প্রভৃতি নানা-বয়সের প্রাচীন লোকের ঠেসাঠেসি ভিড়ের মধ্যে এসে প'ড়েচি। ওদের বোঝাবো কী ক'রে, এই দুর্ভাবনা এখন ভুলে' থাকাই শক্ত। মুস্কিল এই যে, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ আছে, মশা আছে, পুলিশ আছে, স্বরাজ, পররাজ, দ্বৈরাজ, নৈরাজের ভাবনা আছে, এরই মধ্যে ঐ গা-খোলা ছেলেটা দিনের শেষ প্রহরের বেকার বেলাতে ছাদের উপরে ঘুরে বেড়ায়। আকাশের আলিঙ্গনে-বাঁধা ঐ ভোলা-মন ছেলেটিতে একটি নিত্য-কালের কথা আছে, সে আমি শুনেচি, কিন্তু সে আমি ভাষায় কেমন ক'রে স্পষ্ট ক'রে তুল্‌বো?

আজ মনে হ'চ্চে, ঐ ছেলেটার কথা আমারি খুব ভিতরের কথা, গোলেমালে অনেক-কাল তা'র দিকে চোখ পড়েনি। বারো বছরের সেই নিত্য-ভোলা ইস্কুল-পালানো লক্ষ্মীছাড়াটা গাম্ভীর্য্যের নিবিড় ছায়ায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা ক'র্‌ছিলো। এখন ভাবনা ধরিয়ে দিলে, আমার আসল পরিচয় কোন্ দিক্‌টায়? সেই আরম্ভ-বেলাকার সাতাশের দিকে, না, শেষ বেলাকার?

দায়িত্বের বোঝা মাথায় ক'রে ষাঠের আরম্ভে একবার আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তখন য়ুরোপের যুদ্ধ সবে শেষ হ'য়েচে, কিন্তু তারি নেশায় তখনো আমেরিকার চোখ যে-রকম রক্তবর্ণ য়ুরোপেরও এমন নয়। তা'র উপর তখন ইংরেজ নানা উপায়ে আমেরিকার শ্রবণেন্দ্রিয়ের পথ জুড়ে' নিজের ভেঁপুটা বাজাচ্চে। ডিমক্রাসির গুণ এই যে, নিজে ভাব্‌বার না আছে তা'র উদ্যম, না আছে তা'র শক্তি। যে-চতুর লোক কানে মন্ত্র দেবার ব্যবসা আয়ত্ত ক'রেচে, সে নিজের ভাবনা তা'কে ভাবায়। ঠিক এখনকার খবর জানিনে, তখন ইংরেজ আমেরিকার বিপুলকায় ডিমক্রাসিকে কানে ধ'রে নিজের ভাবনা ভাবাচ্ছিলো। সেই কানে-মন্ত্র দেবার যন্ত্রটা আমার বিরুদ্ধে তা'র চাকা চালিয়ে দিলে। ভয় ছিলো পাছে আমি ইংরেজের অপযশ রটাই। তা'র আগেই জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের ব্যাপার ঘটেছিলো।

যাই হোক্ যে-কয়টা মাস আমেরিকায় কাটিয়েচি, হাওয়ার মধ্যে যেন একটা বিরোধের ঠেলা ছিলো। ভাবুক

যেখানেই আছে সেখানেই মানুষের আপনার দেশ, কোনো দেশে সেই ভাবুকতার স্রোতে যখন কম্‌তি পড়ে তখন পদে পদে পাঁকের বাধায় বিদেশী পথিককে গ্লানি দেয়। যেদিন ভাবুকতার ঔদার্য্য থেকে রিক্ত আমেরিকাকে দেখ্‌লুম সেদিন দেখি সে ভয়ঙ্কর ধনী, ভয়ঙ্কর কেজো, সিদ্ধির নেশায় তা'র দুই চক্ষু রক্তবর্ণ। তারি পাশে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চেয়ে দেখি আমি নিতান্ত কাঁচা, জন্ম-গরীব, একেবারে অস্থিতে-মজ্জাতে বে-হিসাবী। এও বুঝ্‌লুম, এ-জগতে কাঁচা মানুষের খুব একটা পাকা জায়গা আছে, চিরকেলে জায়গা। ষাট বছরে পৌঁছে হঠাৎ দেখ্‌লুম সেই জায়গাটা দূরে ফেলে' এসেচি।

যতই বুঝ্‌তে পারি ততই দেখ্‌তে পাই, পাকা দেয়াল-গুলোই মায়া, পাথরের কেল্লাই কয়েদখানা। মন কাঁদ্‌চে, মর্‌বার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আরেকবার শেষ ছেলে-খেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা। আর কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিলো, হাসিয়েছিলো, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ ক'রে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিলো, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুট্‌লো। তা'রা মস্ত বড়ো কিছুই নয়; তা'রা দেখা দিয়েচে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে। তা'রা স্থায়ী কীর্ত্তি রাখ্‌বার দল নয়, ক্ষমতার ক্ষয়-বৃদ্ধি নিয়ে তাদের ভাবনাই নেই; তা'রা চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে দুটো কথা ব'লেচে, সব কথা বল্‌বার সময় পায়নি;

তা'রা কালস্রোতের মাঝখানে বাঁধ বাঁধ্‌বার চেষ্টা করেনি, তারি ঢেউয়ের উপর নৃত্য ক'রে চ'লে গেচে, তারি কলস্বরে সুর মিলিয়ে; হেসে চ'লে গেচে, তারি আলোর ঝিলিমিলির মতো। তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে ব'ল্‌লুম, "আমার জীবনে যাতে সত্যিকার ফসল ফ'লিয়েচে সেই আলোর, সেই উত্তাপের দূত তোমরাই। প্রণাম তোমাদের। তোমাদের অনেকেই এসেছিলো ক্ষণকালের জন্য, আধো-স্বপ্ন আধো-জাগার ভোর-বেলায় শুকতারার মতো, প্রভাত না হ'তেই অস্ত গেলো। মধ্যাহ্নে মনে হ'লো তা'রা তুচ্ছ, বোধ হ'লো তাদের ভুলেই গেচি। তা'র পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে' আমার মুখের দিকে চাইলো তখন জানলুম সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয়, তা'রাই চির-কালের; ভোরের স্বপ্নে বা সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নাবেশে জান্‌তে-না-জান্‌তে তা'রা যার কপালে একটুখানি আলোর টিপ পরিয়ে দিয়ে যায় তাদের সৌভাগ্যের সীমা নেই। তাই মন ব'ল্‌চে, একদিন যারা ছোটো হ'য়ে এসেছিলো আজ আমি যেন ছোটো হ'য়ে তাদের কাছে আর একবার যাবার অধিকার পাই; যারা ক্ষণকালের ভাণ ক'রে এসেছিলো, বিদায় নেবার দিনে আর একবার যেন তা'রা আমাকে বলে, "তোমাকে চিনেচি", আমি যেন বলি "তোমাদের চিন্‌লুম।"

৭ অক্টোবর

একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে একদিন এক-মোটরে নিমন্ত্রণ-সভায় যাচ্ছিলুম। তিনি আমাকে কথা-প্রসঙ্গে খবর দিলেন যে, আজকাল পদ্য আকারে যে-সব রচনা ক'র্‌চি সেগুলি লোকে তেমন পছন্দ ক'র্‌চে না। যারা পছন্দ ক'র্‌চে না তাদের সুযোগ্য প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি উল্লেখ ক'র্‌লেন তাঁর কোনো আত্মীয়ের কথা—সেই আত্মীয়েরা কবি ;—আর, যে-সব পদ্য-রচনা লোকে পছন্দ করে না, তা'র মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ ক'র্‌লেন, আমার গানগুলো, আর আমার "শিশু ভোলানাথ" নামক আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। তিনি ব'ল্‌লেন, আমার বন্ধুরাও আশঙ্কা ক'র্‌চেন আমার কাব্য লেখ্‌বার শক্তি ক্রমেই ম্লান হ'য়ে আস্‌চে।

কালের ধর্ম্মই এই। মর্ত্ত্যলোকে বসন্ত-ঋতু চিরকাল থাকে না। মানুষের ক্ষমতার ক্ষয় আছে, অবসান আছে। যদি কখনো কিছু দিয়ে থাকি, তবে মূল্য দেবার সময় তা'রই হিসাবটা স্মরণ করা ভালো। রাত্রি-শেষে দীপের আলো নেব্‌বার সময় যখন সে তা'র শিখার পাখাতে বার-কতক শেষ ঝাপ্‌টা দিয়ে লীলা সাঙ্গ করে, তখন আশা দিয়ে নিরাশ কর্‌বার দাবীতে প্রদীপের নামে নালিশ করাটা বৈধ নয়। দাবীটাই যার বেহিসাবী, দাবী অপূরণ হবার হিসাবটাতেও তা'র ভুল থাক্‌বেই। পঁচানব্বই বছর বয়সে একটা মানুষ ফস্ ক'রে মারা গেলো ব'লে চিকিৎসা-শাস্ত্রটাকে ধিক্কার দেওয়া

বৃথা বাক্যব্যয়। অতএব কেউ যদি বলে আমার বয়স যতই বাড়্‌চে আমার আয়ু ততই ক'মে যাচ্চে, তা হ'লে তাকে আমি নিন্দুক বলিনে, বড়ো জোর এই বলি যে, লোকটা বাজে কথা এমনভাবে বলে যেন সেটা দৈববাণী। কালক্রমে আমার ক্ষমতা হ্রাস হ'য়ে যাচ্চে, এই বিধিলিপি নিয়ে যুবক হোক্ বৃদ্ধ হোক্ কবি হোক্, অকবি হোক্, কারো সঙ্গে তক্‌রার করার চেয়ে ততক্ষণ একটা গান লেখা ভালো মনে করি, তা সেটা পছন্দসই হোক্ আর না হোক্। এমন কি, সেই অবসরে "শিশু ভোলানাথ"-এর জাতের কবিতা যদি লিখ্‌তে পারি, তা হ'লেও মনটা খুসি থাকে। কারণটা কী, ব'লে রাখি।

আজ-নাগাদ প্রায় পনেরো-ষোলো বছর ধ'রে খুব ক'ষে গানই লিখ্‌চি। লোক-রঞ্জনের জন্যে নয়, কেননা, পাঠকেরা লেখায় ক্ষমতার পরিচয় খোঁজে। ছোটো ছোটো একটু একটু গানে ক্ষমতার কায়দা দেখাবার মতো জায়গাই নেই। কবিত্বকে যদি রীতিমতো তাল ঠুকে' বেড়াতেই হয়, তা হ'লে অন্তত একটা বড়ো আখ্‌ড়া চাই। তা ছাড়া গান জিনিষে বেশি বোঝাই সয় না,—যারা মালের ওজন ক'রে দরের যাচাই করে, তা'রা এরকম দশ-বারো লাইনের হাল্কা কবিতার বাজার মাড়াতে চায় না। তবু আমি এই কয় বছরে এত গান লিখেচি যে, অন্তত সংখ্যা হিসাবে লম্বা দৌড়ের বাজিতে আমি বোধ হয় পয়লা নম্বরের পুরস্কার পেতে পারি।

আর-একটা কথা ব'লে রাখি, গান লিখ্‌তে যেমন আমার

নিবিড় আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে, যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চ'লে যায়,—বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্ত্তব্যের দাবীগুলোকে মন এক-ধার থেকে নামঞ্জুর ক'রে দেয়।

এর কারণ হ'চ্চে, বিশ্বকর্ম্মার লীলাখেলার স্রোতটার মধ্যে হঠাৎ প'ড়ে গেলে শুক্‌নো ডাঙার কথাটা একেবারেই মনে থাকে না। শরতের গাছতলা শিউলি ফুলের অপব্যয়ে ছেয়ে গেলো, নিকেশ নেবার কোনো কথাই কেউ বলে না। যা হ'লো কেবল তাই দেখেই বলি, যথেষ্ট হ'য়েচে। ঘোর গরমে ঘাসগুলো শুকিয়ে সব হল্‌দে হ'য়ে গেলো; বর্ষার প্রথম পসলা বৃষ্টি হ'য়ে যাবার পরেই হঠাৎ দেখি ঘাসে ঘাসে অতি ছোটো ছোটো বেগ্‌নি ফুলে হল্‌দে ফুলে মাতামাতি। কে দেখে কে না দেখে তা'র খেয়াল নেই। এটা হ'লো রূপের লীলা, কেবলমাত্র হ'য়ে-ওঠাতেই আনন্দ। এই মেঠো ফুলের একটি মঞ্জরী তু'লে ধ'রে আমি বলি, বাহবা। কেন বলি? ও তো খাবার জিনিষ নয়, বেচ্‌বার জিনিষ নয়, লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ ক'রে রাখ্‌বার জিনিষ নয়। তবে ওতে আমি কী দেখ্‌লুম যাতে আমার মন ব'ল্‌লে "সাবাস্"। বস্তু দেখ্‌লুম? বস্তু তো একটা মাটির ঢেলার মধ্যে ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তবে? আমি দেখ্‌লুম, রূপ। সে কথাটার অর্থ কী? রূপ ছাড়া আর কোনোই অর্থ নেই। রূপ শুধু বলে "এই দেখো, আমি হ'য়ে-উঠেচি।" যদি আমার মন সায় দিয়ে বলে,

"তাই তো বটে, তুমি হ'য়েচো, তুমি আছ।" আর এই ব'লেই যদি সে চুপ ক'রে যায়, তা হ'লেই সে রূপ দেখ্‌লে; হ'য়ে-ওঠাকেই চরম ব'লে জান্‌লে। কিন্তু সজ্‌নে ফুল যখন অরূপ সমুদ্রে রূপের ঢেউ তু'লে দিয়ে বলে, "এই দেখো আমি আছি", তখন তা'র কথাটা না বুঝে, আমি যদি গোঁয়ারের মতো ব'লে বসি, "কেন আছ?" তা'র মুখ থেকে যদি অত্যন্ত মিথ্যে জবাব আদায় ক'রে নিই, যদি তাকে দিয়ে বলাই, "তুমি খাবে ব'লেই আছি" তা হ'লে রূপের চরম রহস্যটা দেখা হ'লো না। একটি ছোট্টো মেয়ে কোথা থেকে আমার যাত্রাপথে জুটে' গেচে। তা'র বয়স আড়াই বছর। তা'র মধ্যে প্রাণের আনন্দ টলমল ক'রে ওঠে, কত মধুর প্রলাপে, কত মন-ভোলানো ভঙ্গীতে—আমার মন বলে, "মস্ত একটা পাওনা আমি পেলুম।" কী-যে পেলুম তা'কে হিসাবের অঙ্কে ছকে' নেবার জো নেই। আর কিছু নয়, একটি বিশেষ হ'য়ে-ওঠাকেই আমি চরম ক'রে দেখলুম। ঐ ছোট্ট মেয়ের হ'য়ে-ওঠাই আমার পরম লাভ। ও আমার ঘর ঝাঁট দেয় না, রান্না করে না, তাতে ওর ঐ হ'য়ে-ওঠার হিসাবটাতে কিছুই কম প'ড়্‌চে না। বৈজ্ঞানিক এর হয়তো একটা মোটা কৈফিয়ৎ দেবে, ব'ল্‌বে, "জীবজগতে বংশরক্ষাটাই সবচেয়ে বড়ো দরকার,—ছোটো মেয়েকে সুন্দর না লাগ্‌লে সেই দরকারটাতে বাধা পড়ে।" মোটা কৈফিয়ৎটাকে আমি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিনে, কিন্তু তা'র উপরেও একটা সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে যার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। একটা ফলের ডালি দেখ্‌লে মন

খুসি হ'য়ে ওঠে, আর মাছের ঝোলের পাত্র দেখ্‌লে যারা নিরামিষাশী নয় তাদের মন খুসি হ'তে পারে; আহারের প্রয়োজনটা উভয়তই আছে; সুতরাং খুসির একটা মোটা কৈফিয়ৎ উভয়তই পাওয়া যায়। তৎসত্ত্বেও ফলের ডালিতে এমন একটি বিশেষ খুসি আছে যা কোনো কৈফিয়ৎ তলবই করে না। সেইখানে ঐ একটি মাত্র কথা, ফলগুলি ব'ল্‌চে, "আমি আছি,"—আর আমার মন বলে, সেইটেই আমার লাভ। আমার জীবনযাত্রার এই আড়াই বছরের ক্ষুদ্রতমা সহচরীটিও মানবের বংশরক্ষার কৈফিয়ৎ দাখিল ক'রেও এমন কিছু বাকি রাখে যেটা বিশ্বের মর্ম্মকুহর হ'তে উত্থিত ওঙ্কার ধ্বনিরই সুর। বিশ্ব ব'ল্‌চে, ওঁ; ব'ল্‌চে, হাঁ; ব'ল্‌চে, অয়মহং ভোঃ, এই-যে আমি। ঐ মেয়েটিও সেই ওঁ, সেই হাঁ, সেই এই-যে-আমি। সত্তাকে সত্তা ব'লেই যেখানে মানি, সেখানে তা'র মধ্যে আমি সেই-খুসিকেই দেখি যে-খুসি আমার নিজের মধ্যে চরমরূপে র'য়েচে। দাসের মধ্যে সেই খুসিকে দেখিনে ব'লেই দাসত্ব এত ভয়ঙ্কর মিথ্যে, আর মিথ্যে ব'লেই এত ভয়ঙ্কর তা'র পীড়া।

সৃষ্টির মূলে এই লীলা, নিরন্তর এই রূপের প্রকাশ। সেই প্রকাশের অহৈতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে গিয়ে মন পৌঁছ'য়। সেই মূল আনন্দ আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত, কারো কাছে তা'র কোনো জবাবদিহী নেই।

ছোটো ছেলে ধুলোমাটি কাটিকুটো নিয়ে সারাবেলা ব'সে

ব'সে একটা কিছু গ'ড়্চে। বৈজ্ঞানিকের মোটা কৈফিয়ৎ হ'চ্চে এই যে, গড়বার শক্তি তা'র জীবনযাত্রার সহায়, সেই শক্তির চালনা চাই। এ কৈফিয়ৎ স্বীকার ক'রে নিলুম; তবুও কথাটার মূলের দিকে অনেকখানি বাকি থাকে। গোড়াকার কথা হ'চ্চে এই যে, তা'র সৃষ্টিকর্ত্তা মন বলে "হোক্", "Let there be".—সেই বাণীকে বহন ক'রে ধূলোমাটি কুটোকাটি সকলেই ব'লে ওঠে, "এই দেখো হ'য়েচে।"

এই হওয়ার অনেকখানিই আছে শিশুর কল্পনায়। সাম্‌নে যখন তা'র একটা ঢিবি, তখন কল্পনা ব'ল্চে, "এই তো আমার রূপকথার রাজপুত্রের কেল্লা।" তা'র ঐ ধূলোর স্তূপের ইসারার ভিতর দিয়ে শিশু সেই কেল্লার সত্তা মনে স্পষ্ট অনুভব ক'র্চে। এই অনুভূতিতেই তা'র আনন্দ। গড়বার শক্তিকে প্রকাশ ক'র্চি ব'লে আনন্দ নয়, কেননা সে শক্তি এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকাশ পাচ্চে না। একটি রূপ-বিশেষকে চিত্তে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি ব'লে আনন্দ। সেই রূপটাকে শেষ-লক্ষ্য ক'রে দেখাই হ'চ্চে সৃষ্টিকে দেখা, তা'র আনন্দই সৃষ্টির মূল আনন্দ।

গান জিনিষটা নিছক সৃষ্টিলীলা। ইন্দ্রধনু যেমন বৃষ্টি আর রৌদ্রের জাদু, আকাশের দুটো খামখেয়ালি মেজাজ দিয়ে গড়া তোরণ, একটি অপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত-কাল সেই তোরণের নীচে দিয়ে জয়যাত্রা ক'র্বে। হ'য়ে গেলো এই খেলা, মুহূর্ত্তটি তা'র রঙীন উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে চ'লে গেলো,—তা'র বেশি

আর কিছু নয়। মেজাজের এই রঙীন খেলাই হ'চ্চে গীতি-কাব্য। ঐ ইন্দ্রধনুর কবিটিকে পাকড়াও ক'রে যদি জিজ্ঞাসা করা যেতো, "এটার মানে কী হ'লো", সাফ জবাব পাওয়া যেতো, "কিছুই না।" "তবে?" "আমার খুসি।" রূপেতেই খুসি,—সৃষ্টির সব প্রশ্নের এই হ'লো শেষ-উত্তর।

এই খুসির খেলাঘরে রূপের খেলা দেখে' আমাদের মন ছুটি পায় বস্তুর মোহ থেকে, একেবারে পৌঁছ'য় আনন্দে, এমন কিছুতে যার ভার নেই, যার মাপ নেই, যা অনির্ব্বচনীয়।

সেদিন সমুদ্রের মাঝে পশ্চিম আকাশে "ধূমজ্যোতিঃ-সলিলমরুতে" গড়া সূর্য্যাস্তের একখানি রূপসৃষ্টি দেখ্‌লুম। আমার যে-পাকাবুদ্ধি সোনার খনির মুনফা গোনে, সে বোকার মতো চুপ ক'রে রইলো, আর আমার যে-কাঁচা-মনটা ব'ল্‌লে, "দেখেচি," সে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লে সোনার খনির মুনফাটাই মরীচিকা, আর যার আবির্ভাবকে ক্ষণকালের জন্যে ঐ চিহ্নহীন সমুদ্রে, নামহীন আকাশে দেখা গেলো তা'রই মধ্যে চিরকালের অফুরান্ ঐশ্বর্য্য, সেই হ'চ্চে অরূপের মহা-প্রাঙ্গণে রূপের নিত্যলীলা।

সৃষ্টির অন্তরতম এই অহৈতুক লীলার রসটিকে যখন মন পেতে চায় তখনি বাদশাহী বেকারের মতো সে গান লিখ্‌তে বসে। চারখানি পাপড়ি নিয়ে একটি ছোটো জুঁইফুলের মতো একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে, তখন সেই মহাখেলা-ঘরের মেজের উপরেই তা'র জন্যে জায়গা করা হয় যেখানে যুগ যুগ ধ'রে গ্রহনক্ষত্রের খেলা হ'চ্চে। সেখানে যুগ আর মুহূর্ত্ত

একই, সেখানে সূর্য্য আর সূর্য্যমণি ফুলে অভেদাত্মা, সেখানে সাঁঝসকালে মেঘে মেঘে যে-রাগরাগিণী, আমার গানের সঙ্গে তা'র অন্তরের মিল আছে।

আজ পনেরো-ষোলো বছর ধ'রে কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাকে নানা ভাবনা নানা ব্যস্ততার মধ্যে জোরে টেনে নিয়ে ফেলে আমার কাছ থেকে ক'ষে কাজ আদায় ক'রে নিচ্চে। এখানকার সকল কাজই মোটা কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে। খোঁচা দিয়ে দিয়ে কেবলি জিজ্ঞাসা করে, "ফল হবে কি?" সেইজন্যে যার ফরমাস কৈফিয়তের সীমানা পেরিয়ে আপন বেদরকারী পাওনা দাবী করে, ভিতরে-ভিতরে সে আমাকে কেবলি প্রশ্ন ক'র্‌তে থাকে, "তুমি কবি, চির-ছুটির পরোয়ানা নিয়ে পৃথিবীতে এসেচো, তা'র ক'র্‌লে কী? কাজের ভিড়ের টানা-টানিতে প'ড়ে একেবারেই জাত খুইয়ে বোসো না।" নিশ্চয় ওরই এই তাগিদেই আমাকে গান লেখায়, হট্টগোলের মধ্যেও নিজের পরিচয়টা বজায় রাখ্‌বার জন্যে, লোকরঞ্জনের জন্যে নয়। কর্ত্তব্যবুদ্ধি তা'র কীর্ত্তি ফেঁদে গম্ভীরকণ্ঠে বলে, "পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে গুরুতর"—তাই আমার ভিতরকার বিধিদত্ত ছুটির খেয়াল বাঁশি বাজিয়ে বলে, "পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে লঘুতম।" লঘু নয় তো কী! সেইজন্যে সব জায়গাতেই হাওয়ায় হাওয়ায় তা'র পাখা চলে, তা'র রঙ-বেরঙের পাখা। ইমারতের মোটা ভিৎ ফেঁদে সময়ের সদ্ব্যয় করা তা'র জাত-ব্যবসা নয়, সে লক্ষ্মীছাড়া ঘুরে' বেড়ায় ফাঁকির পথে, যে-পথে রঙের ঝর্‌না, রসের ধারা ঝ'রে

ঝ'রে দিকে দিকে ছড়িয়ে প'ড়্চে বিপুল একটা বাজেখরচের মতো।

আমার কেজো পরিচয়টার প্রতি ঈর্ষা ক'রে অবজ্ঞা ক'রে আমার অকেজো পরিচয়টা আমাকে যখন-তখন গান লিখিয়ে লিখিয়ে নিজের দলিল ঠিক ক'রে রাখ্চে। যখন বিরুদ্ধপক্ষে মাতব্বর সাক্ষী এসে জোটে, তখনি নিজের দাবীর দলিল খুব বড়ো ক'রে তুল্তে হয়। যতদিন ধ'রে এক পক্ষে আমার কাজের রোকড় খুব মোটা হ'য়ে উঠ্চে ততদিন ধ'রেই অন্যপক্ষে আমার ছুটির নথীও অসম্ভব-রকম ভারি হ'য়ে উঠ্লো। এই-যে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চ'ল্চে, এটা আমার অন্তরের খাস-কামরায়। আমি আসলে কোন্ পক্ষের সেইটের বিচার নিয়ে আমারই কাছে নালিস।

তা'র পরে কথাটা এই যে, ঐ "শিশু ভোলানাথ"-এর কবিতাগুলো খামকা কেন লিখ্তে ব'সেছিলুম? সেও লোক-রঞ্জনের জন্যে নয়,—নিতান্ত নিজের গরজে।

পূর্ব্বেই ব'লেচি, কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্য্যপটুতার পাথরের দুর্গে আট্কা প'ড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম জমিয়ে তোল্বার মতো এত বড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্দ্ধা করে; কিন্তু কিছুই থাক্‌বে না, আজ বাদে কাল সব সাফ হ'য়ে যাবে। যে-স্রোতের ঘূর্ণিপাকে এক-এক জায়গায় এই সব বস্তুর পিণ্ডগুলোকে স্তূপাকার ক'রে দিয়ে গেচে, সেই স্রোতেরই

অবিরত বেগে ঠেলে ঠেলে সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে—পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলা-শক্তি আছে সে-যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ,—সে কিছু জ'মৃতে দেয় না ; কেননা জমার জঞ্জালে তা'র সৃষ্টির পথ আট্‌কায়,—সে-যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তা'র অবকাশকে নির্ম্মল ক'রে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জ়ড়ো ক'রে সেই-গুলোকে আগ্‌লে রাখ্‌বার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি ক'রে তুল্‌চে। সেই ধ্বংস-শাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়-গর্ব্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ ক'র্‌চে,—এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধূলা-নিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্য সূর্য্যকে পরাভূত ক'রে দিয়ে তা'র পরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোনো চিহ্ন না রেখে চ'লে যায়, এসব তেম্‌নি ক'রেই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে।

কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্গারের অন্ধ-যন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধ হ'য়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চির-পথিকের পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেতুম। সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ঐ পথিকের সহচর।

আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই "শিশু ভোলানাথ" লিখ্‌তে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে' আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে, তেম্‌নি ক'রে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আট্‌কা প'ড়্‌লে তবেই মানুষ স্পষ্ট ক'রে আবিষ্কার করে, তা'র চিত্তের জন্যে এত বড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আট্‌কা প'ড়ে সেদিন আমি তেম্‌নি ক'রেই আবিষ্কার ক'রেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে-শিশু আছে তা'রই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশু-লীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাট্‌লুম, মনটাকে স্নিগ্ধ কর্‌বার জন্যে, নির্ম্মল কর্‌বার জন্যে, মুক্ত কর্‌বার জন্যে।

এ-কথাটার এতক্ষণ ধ'রে আলোচনা ক'র্‌চি এইজন্যে যে, যে-লীলা-লোকে জীবনযাত্রা সুরু ক'রেছিলুম, যে-লীলাক্ষেত্রে জীবনের প্রথম অংশ অনেকটা কেটে গেলো, সেইখানেই জীবনটার উপসংহার কর্‌বার উদ্বেগে কিছুকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা মন-কেমন-করার হাওয়া বইচে। একদা পদ্মার ধারে আকাশের পারে সংসারের পথে যারা আমার সঙ্গী ছিল, তা'রা ব'ল্‌চে সেদিনকার পালা সম্পূর্ণ শেষ হ'য়ে যায়নি, বিদায়ের গোধূলি-বেলায় সেই আরম্ভের কথাগুলো সাঙ্গ ক'রে যেতে হবে। সেইজন্যেই সকালবেলাকার মল্লিকা সন্ধ্যাবেলাকার রজনী-গন্ধা হ'য়ে' তা'র গন্ধের দূত পাঠাচ্চে। ব'ল্‌চে, তোমার খ্যাতি তোমাকে না টানুক্‌, তোমার কীর্ত্তি

তোমাকে না বাঁধুক্, তোমার গান তোমাকে পথের পথিক ক'রে তোমাকে শেষ যাত্রায় রওনা ক'রে দিক্। প্রথম বয়সের বাতায়নে ব'সে তুমি তোমার দূরের বঁধুর উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে। শেষ-বয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলি-রাগের রাঙা আলোতে তোমার সেই দূরের বঁধুর সন্ধানে নির্ভয়ে চ'লে যাও। লোকের ডাকাডাকি শুনো না। সুর যে-দিক থেকে আস্‌চে সেই দিকে কান পাতো—আর সেই দিকেই ডানা মেলে দাও সাগরপারের লীলা-লোকের আকাশপথে। যাবার বেলায় কবুল ক'রে যাও যে, তুমি কোনো কাজের নও, তুমি অস্থায়ীদের দলে।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫
ক্রাকোভিয়া জাহাজ।

মার্সেল্‌স্ বন্দরে নেমে রেলে চ'ড়্‌লেম। পশ্চিমদেশের একটা পরিচয় পেলেম ভোজন-কামরায়। আকাশে গ্রহ-মালার আবর্ত্তনের মতো থালার পর থালা ঘুরে ঘুরে আস্‌চে, আর ভোজ্যের পর ভোজ্য।

ঘরের দাবী পথের উপর চলে না। ঘরে আছে সময়ের অবসর, ঘরে আছে স্থানের অবকাশ। সেখানে জীবন-যাত্রার আয়োজনের ভার বেশি ক'রে জ'মে ওঠ্‌বার বাধা নেই। কিন্তু চল্‌তি পথে উপকরণভার যথাসম্ভব হাল্‌কা করাই সাধারণ লোকের পক্ষে সঙ্গত। হরিণের শিঙ বটগাছের ডাল-

আব্‌ডালের মতো অত অধিক, অত বড়ো, অত ভারি হ'লে সেটা জঙ্গম প্রাণীর পক্ষে বেহিসাবী হয়।

চিরকাল, বিশেষত পূর্ব্বকালে, রাজা-রাজ্‌ড়া আমীর-ওম্‌রাওরা ভোগের ও ঐশ্বর্য্যের বোঝাকে সর্ব্বত্র সকল অবস্থা-তেই ভরপূরভাবে টেনে বেড়িয়েচে। সংসারের উপর তাদের আবদার অত্যন্ত বেশি। সে-আবদার সংসার মেনে নিয়েচে, কেন না এদের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। রেলগাড়ির ভোজন-শালায় থালার সংখ্যা, ভোজ্যের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য, পরি-চর্য্যার ব্যবস্থা, এত বাহুল্যময় যে পূর্ব্বকালের রাজকীয় সম্প্র-দায়ই পথিক-অবস্থাতেও তা দাবী ক'র্‌তে পার্‌ত। এখন জনসাধারণের সকলের জন্যে এই আয়োজন।

ভোগের এত বড়ো বাহুল্যে সকল মানুষেরই অধিকার আছে এই কথাটার আকর্ষণ অতি ভয়ানক। এই আকর্ষণে দেশজোড়া মানুষের সিঁধকাঠি বিশ্বভাণ্ডারের দেয়াল ফুটো ক'র্‌তে উদ্যত হয়; লুব্ধ সভ্যতার এই উপদ্রব সর্ব্বনেশে।

যেটা বাহুল্য তা'তে ছোটো বড়ো কোনো মানুষের কোনো অধিকার নেই এই কথাটা গত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মণী প্রভৃতি যুদ্ধরত দেশকে অনেকদিন ধ'রেই স্বীকার ক'র্‌তে হ'লো। তখন তা'রা আপনার সহজ আয়োজনের অনুপাতে নিজের ভোগকে সংযত ক'রেছিলো। তখন তা'রা বুঝেছিলো মানুষের আসল প্রয়োজনের ভার খুব বেশি নয়। যুদ্ধ-অবসানে সে-কথাটা ভুল্‌তে দেরি হয়নি।

অনতিপ্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় ক'রে তোলা যখন

দেশসুদ্ধ সকল লোকেরই নিত্য সাধনা হয় তখন বিশ্বব্যাপী দস্যুবৃত্তি অপরিহার্য্য হ'য়ে ওঠে। লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা নিয়ে পাশ্চাত্যেরা অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে থাকেন। সমস্যাটি কঠিন হবার প্রধান কারণ হ'চ্চে, সর্ব্ব সাধারণেরই ভোগ-বাহুল্যের প্রতি দাবী। এতো বড়ো ব্যাপক দাবী মেটাতে গেলে ধর্ম্মরক্ষা করা চলে না, মানুষকে মানুষপীড়ক হ'তেই হয়। সেই পীড়ন-কার্য্যে ভালো ক'রে হাত-পাকানো হয় দূরস্থ অনাত্মীয় জাতির উপর দিয়ে। এর বিপদ এই যে, জীবন-ক্ষেত্রের যে-কিনারাতেই ধর্ম্মবুদ্ধিতে আগুন লাগানো হোক্ না সে-আগুন সেইখানেই থেমে থাকে না। ভোগী স্বভাবতই যে-নিষ্ঠুরতার সাধনা করে তা'র সীমা নেই, কারণ আত্মম্ভরিতা কোথাও এসে ব'ল্‌তে জানে না, "এইবার বস্ হ'য়েচে।" বস্তুগত আয়োজনের অসঙ্গত বাহুল্যকেই যে-সভ্যতার প্রধান লক্ষণ ব'লে মানা হয় সে-সভ্যতা অগত্যাই নরভুক্। নররক্ত-শোষণের বিশ্বব্যাপী চর্চ্চা একদিন আত্মহত্যায় ঠেক্‌বেই এতে আর সন্দেহ করা চলে না।

রেলগাড়ির ভোজনশালায় একদিকে যেমন দেখা গেলো ভোগের বাহুল্য, আর একদিকে তেমনি দেখ্‌লেম কর্ম্মের গতিবেগ। সময় অল্প, আরোহী অনেক, ভোজ্যের বৈচিত্র্য প্রচুর, ভোজের উপকরণ বিস্তর,—তাই পরিবেষণ-কর্ম্মের অভ্যাস অতি আশ্চর্য্য দ্রুত হ'য়ে উঠেচে। পরিবেষণের যন্ত্রটাতে খুবই প্রবল জোরে দম দেওয়া হ'য়েচে। যেটা এই

পরিবেষণে দেখা গেলো। পাশ্চাত্ত্যের সমস্ত কর্ম্মচালনার মধ্যেই সেই ক্ষিপ্রবেগ।

যে-যন্ত্র বাহিরের ব্যবহারের জন্য, তা'র গতির ছন্দ দম দিয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত বাড়িয়ে তোলা চলে। কিন্তু আমাদের প্রাণের আমাদের হৃদয়ের ছন্দের একটা স্বাভাবিক লয় আছে, তা'র উপরে দ্রুত প্রয়োজনের জবরদস্তি খাটে না। দ্রুত-চলাই যে দ্রুত-এগোনো সে কথা সত্য হ'তে পারে কলের গাড়ির পক্ষে, মানুষের পক্ষে না। মানুষের চলার সঙ্গে হওয়া আছে; সেই চলাতে হওয়াতে মিল্ ক'রে চলাই মানুষের চলা, কলের গাড়ির সে-উপসর্গ নেই। আফিসের তাগিদে মুহূর্ত্তের মধ্যে এক গ্রাসের জায়গায় চার গ্রাস খাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই চার গ্রাস ঘড়ি ধ'রে হজম করা কলের মনিবের হুকুমে হ'তে পারে না। গ্রামোফোনের কান যদি ম'লে দেওয়া যায় তবে যে-গান গাইতে চার মিনিট লেগেছিলো তা'কে শুন্‌তে আধ মিনিটের বেশি না লাগ্‌তে পারে কিন্তু সঙ্গীত হ'য়ে ওঠে চীৎকার। রসভোগ কর্‌বার জন্যে রসনার নিজের একটা নির্দ্ধারিত সময় আছে; সন্দেশকে যদি কুইনীনের বড়ির মতো টপ ক'রে গেলা যায় তা হ'লে বস্তুটাকে পাওয়া যায়, বস্তুর রস পাওয়া যায় না। তীরবেগে বাইসিক্‌ল্ ছুটিয়ে যদি পদাতিকবন্ধুর চাদর ধরি তা হ'লে বাইসিক্‌লের জয়-পতাকা হাতে আস্‌বে, কিন্তু বন্ধুকে বুকে পাবার উপায় সেটা নয়। কলের বেগ বাইরের দরকারে কাজে লাগে, অন্তরের দাবী মেটাবার বেলায় অন্তরের ছন্দ না মান্‌লে চলে না।

বাইরের বেগ অন্তরের ছন্দকে অত্যন্ত বেশি পেরোয় কখন? যখন বাহ্য প্রয়োজনের বড়ো রাড় বাড়ে। তখন মানুষ পড়ে পিছিয়ে, কলের সঙ্গে সে তাল রাখ্‌তে পারে না। য়ুরোপে সেই মানুষ-ব্যক্তিটি দিনে দিনে বহু দূরে প'ড়ে গেলো; কল গেলো এগিয়ে। তাকেই সেখানকার লোকে বলে অগ্রসরতা, প্রোগ্রেস্।

সিদ্ধি, যাকে ইংরেজিতে বলে সাক্‌সেস্, তা'র বাহন যত দৌড়ে চলে ততই ফল পায়। য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্র-নীতির যুদ্ধ-নীতির বাণিজ্য-নীতির তুমুল ঘোড়-দৌড় চ'ল্‌চে জলে স্থলে আকাশে। সেখানে বাহ্য প্রয়োজনের গরজ অত্যন্ত বেশি হ'য়ে উঠ্‌লো তাই মনুষ্যত্বের ডাক শুনে কেউ সবুর ক'র্‌তে পার্‌চে না। বীভৎস সর্ব্বভুক্ পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্‌স্ নিয়ত ব্যস্ত। তা'র গাঁঠ-কাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছ'ড়িয়ে প'ড়েচে। পূর্ব্বকালে যুদ্ধ বিগ্রহের পদ্ধতিতে ধর্ম্ম-বুদ্ধি যেখানে মাঝে মাঝে বাধা খাড়া ক'রে রেখেছিলো, ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ-মারা hurdle race খেলে চ'লেচে। সবুর সয় না যে। বিষ-বায়ুবাণ যুদ্ধের অস্ত্ররূপে যখন এক পক্ষ ব্যবহার ক'র্‌লে তখন অন্য পক্ষ ধর্ম্ম-বুদ্ধির দোহাই পাড়্‌লে। আজ সকল পক্ষই বিষের সন্ধানে উঠে প'ড়ে লেগেচে। যুদ্ধকালে নিরস্ত্র পুরবাসীদের প্রতি আকাশ থেকে অগ্নিবাণ বর্ষণ নিয়ে প্রথমে শোনা গেলো ধর্ম্ম-বুদ্ধির নিন্দাবাণী। আজ দেখি ধার্ম্মিকেরা স্বয়ং সামান্য কারণে পল্লীবাসীদের প্রতি কথায় কথায় পাপ-বজ্র সন্ধান

ক'ৰ্চে। শত যুদ্ধের সময় শত্রুর সম্বন্ধে নানা উপায়ে সজ্ঞানে সচেষ্টভাবে সত্য-গোপন ও মিথ্যা-প্রচারের সয়তানী অস্ত্র ব্যবহার প্রকাণ্ডভাবে চ'ল্‌লো। যুদ্ধ থেমেচে কিন্তু সেই সয়তানী আজও থামে নি। এমন কি, অক্ষম ভারতবর্ষকেও প্রবলের প্রপাগাণ্ডা রেয়াৎ করে না। এই সব নীতি হ'চ্চে সবুর-না-করা-নীতি—এ'রা হ'লো পাপের দ্রুত চাল,—এরা প্রতি পদেই বাহিরে জিৎচে বটে কিন্তু সে জিৎ অন্তরের মানুষকে হারিয়ে দিয়ে। মানুষ আজ নিজের মাথা থেকে জয়মাল্য খুলে নিয়ে কলের গলায় পরিয়ে দিলে। রসাতল থেকে দানব ব'ল্‌চে বাহবা।

রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় ঊর্দ্ধস্বরে ডাকি'
"থামো, থামো, কোথা তুমি রুদ্রবেগে রথ যাও হাঁকি',
সম্মুখে আমার গৃহ।"
রথী কহে, "ঐ মোর পথ,
ঘুরে গেলে দেরি হবে, বাধা ভেঙে সিধা যাবে রথ।"
গৃহী কহে, "নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে,
কোথা যেতে হবে বলো।"
রথী কহে, "যেতে হবে আগে।"
"কোন্‌খানে," শুধাইল।
রথী বলে, "কোনোখানে নহে,
শুধু আগে।"
"কোন্ তীর্থে, কোন্ সে মন্দিরে," গৃহী কহে।
"কোথাও না, শুধু আগে।"

"কোন্ বন্ধু সাথে হবে দেখা ?"
"কারো সাথে নহে, যাবো সব-আগে আমি মাত্র একা।"
ঘর্ঘরিত রথবেগ গৃহভিত্তি করি' দিলো গ্রাস;
হাহাকারে, অভিশাপে, ধূলিজালে ক্ষুভিল বাতাস
সন্ধ্যার আকাশে। আঁধারের দীপ্ত সিংহদ্বার বাগে
রক্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে॥

ক

ক্রাকোভিয়া জাহাজ—
৯ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫

বিষয়ী-লোক শতদলের পাপ্‌ড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটি একটি ক'রে জমা করে, আর বলে, "পেয়েচি!" তা'র সঞ্চয় মিথ্যে। সংশয়ী লোক শতদলের পাপ্‌ড়ি একটি একটি ক'রে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাকে কেটে কুটে নিংড়ে মুচ্‌ড়ে বলে, "পাইনি।" অর্থাৎ সে উল্টো দিকে চেয়ে বলে, "নেই।" রসিক লোক সেই শতদলের দিকে "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি।" এই আশ্চর্য্যের মানে হ'লো পেয়েচি পাইনি দুইই সত্য। প্রেমিক ব'ল্‌লে "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।" অর্থাৎ ব'ল্‌লে লক্ষযুগের পাওয়া অল্প-কালের মধ্যেই পেয়েচি আবার সেই সঙ্গেই লক্ষযুগের না-পাওয়াও লেগেই রইলো। সময়টা-যে আপেক্ষিক, রসের ভাষায় সে-কথাটা অনেকদিন থেকে বলা চ'ল্‌চে, বিজ্ঞানের ভাষায় আজ বলা হ'লো।

যখন ছোটো ছিলেম, মনে পড়ে বিশ্বজগৎ আমার কাছে প্রতিদিন অন্ধকার রাত্রির গর্ভ থেকে নূতন দেহ ধ'রে জন্ম নিতো। পরিচয় আর অপরিচয় আমার মনের মধ্যে এক হ'য়ে মিলেছিলো। আমার সেই শিশুকাল পথিকের কাল। তখন পথের শেষের দিকে লক্ষ্য খুঁজিনি, পথের আশেপাশে চেয়ে চেয়ে চ'ল্‌চি, যেন কোন্‌ আবছায়ার ভিতর থেকে আচমকা দেখা দেবে একটা "কী জানি," একটা "হয়তো।" বারান্দার কোণে খানিকটা ধুলো জড়ো ক'রে আতার বীচি পুঁতে রোজ জল দিয়েচি। আজ যেটা আছে বীজ কাল সেটা হবে গাছ, ছেলেবেলায় সে একটা মস্ত "কী জানি"র দলে ছিলো। সেই কী-জানিকে দেখাই সত্য দেখা। সত্যের দিকে চেয়ে যে বলে জানি সেও তাকে হারায়, যে বলে জানিনে সেও করে ভুল, আমাদের ঋষিরা এই বলেন। যে বলে খুব জানি সেই অবোধ সোনা ফেলে চাদরের গ্রন্থিকে পাওয়া মনে করে, যে বলে কিছুই জানিনে সে তো চাদরটাকে সুদ্ধ খুইয়ে বসে। আমি ঈশোপনিষদের এই মানেই বুঝি। "জানিনা" যখন "জানির" আঁচলে গাঁঠছড়া বেঁধে দেখা দেয় তখন মন বলে ধন্য হ'লেম। পেয়েচি মনে করার মতো হারানো আর নেই।

খ

এই জন্যেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যেমন ক'রে হারিয়েচে এমন আর য়ুরোপের কোনো জাত নয়। ভারতবর্ষের মধ্যে

যে-একটা চিরকেলে রহস্য আছে সেটা তার কাছ-থেকে স'রে গেলো। তা'র ফৌজের গাঁঠের মধ্যে যে-বস্তুটাকে ক'ষে বাঁধ্‌তে পার্‌লে সেইটেকেই সে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ ব'লে বুক ফুলিয়ে গর্দীয়ান্‌ হ'য়ে ব'সে রইলো। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তা'র বিস্ময় নেই, অবজ্ঞা যথেষ্ট আছে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বাইরে ইংরেজ ভারত সম্বন্ধে যত অল্প আলোচনা ক'রেচে এমন ফ্রান্স করেনি জর্ম্মণি করেনি। পোলিটিশনের চশমার বাইরে ভারতবর্ষ ইংরেজজাতির গোচরে আছে একথাটা তা'র দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক কাগজ প'ড়ে দেখ্‌লে বোঝা যায় না।

এর একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। প্রয়োজন-সাধনের দেখা নিছক পাওয়ারই দেখা, তার মধ্যে না-পাওয়ার আমেজ নেই। এই জন্যেই এ'কে সত্যের দেখা বলা যায় না। এই দেখায় সত্য নেই ব'লেই তাতে বিস্ময় নেই, শ্রদ্ধা নেই।

প্রয়োজনের সম্বন্ধ হ'চ্চে কেবলি গ্রহণের সম্বন্ধ, তাতে লোভ আছে আনন্দ নেই। সত্যের সম্বন্ধ হ'চ্চে পাওয়া এবং দেওয়ার মিলিত সম্বন্ধ, কেননা আনন্দই মন খুলে দিতে জানে। এই কারণেই দেখ্‌তে পাই ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজের ব্যক্তিগত বদান্যতার অদ্ভুত অভাব। একথা নিয়ে নালিশ করা বৃথা, এইটেই স্বাভাবিক। ইংরেজের লোভ যে-ভারতবর্ষকে পেয়েচে ইংরেজের আত্মা সেই-ভারতবর্ষকে হারিয়েচে। এইজন্যেই ভারতবর্ষে ইংরেজের লাভ, ভারতবর্ষে ইংরেজের গর্ব্ব, ভারতবর্ষে ইংরেজের ক্লেশ। এইজন্যে

ভারতবর্ষকে স্বাস্থ্য দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ত্যাগ দুঃসাধ্য, কিন্তু শাস্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ক্রোধ অত্যন্ত সহজ। ইংরেজ ধনী বাংলা দেশের রক্ত-নেংড়ানো পাটের বাজারে শতকরা চার পাঁচশো টাকা মুনফা শুষে নিয়েও যে-দেশের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতার জন্যে এক পয়সাও ফিরিয়ে দেয় না, তা'র দুর্ভিক্ষে বন্যায় মারী-মড়কে যার ক'ড়ে আঙুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না, যখন সেই শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন উপবাসক্লিষ্ট বাংলাদেশের বুকের উপর পুলিসের জাঁতা বসিয়ে রক্তচক্ষু কর্ত্তৃপক্ষ কড়া আইন পাস করেন তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনফার উপর আরামের আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে, বলে "এই তো পাকা চালে ভারত-শাসন।"

এইটেই স্বাভাবিক। কেননা ঐ-ধনী বাংলা দেশকে একেবারেই দেখ্‌তে পায়নি, তা'র মোটা মুনফার ওপারে বাংলাদেশ আড়াল প'ড়ে গেচে। বাংলাদেশের প্রাণের নিকেতনে যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণার কান্না, বাংলাদেশের হৃদয়ের মাঝখানে যেখানে তা'র সুখদুঃখের বাসা, সেখানে মানুষের প্রতি মানুষের মৈত্রীর একটা বড়ো রাস্তা আছে, সেখানে ধর্ম্মবুদ্ধির বড়ো দাবী বিষয়বুদ্ধির গরজের চেয়ে বেশি একথা জান্‌বার ও ভাব্‌বার মতো তা'র সময়ও নেই শ্রদ্ধাও নেই। তাই যখনি দেখে দরোয়ানীর ব্যবস্থা কঠোরতর করা হ'চ্চে তখনি মুনফা-বৎসলেরা পুলকিত হ'য়ে ওঠে। Law and order রক্ষা হ'চ্চে দরোয়ানীতন্ত্র, পালোয়ানের পালা; Sympathy and respect হ'চ্চে ধর্ম্মতন্ত্র, মানুষের নীতি।

অবিচার ক'র্‌তে চাইনে, রাজ্যশাসন মাত্রেই law and order চাই। নিতান্ত স্নেহ প্রেমের এলাকাতেও কানমলার বরাদ্দ থাকে। রাজ্যে ছট্‌ফটানি বৃদ্ধি হ'লে সাধারণ দণ্ডবিধি অসাধারণ অবৈধ হ'য়ে উঠ্‌লেও দোষ দিইনে। একপক্ষে দুরন্তপনা ঘট্‌লে অন্যপক্ষে দৌরাত্ম্য ঘটা শক্তিমানের পক্ষে গৌরবের বিষয় না হ'লেও সেটাকে স্বাভাবিক ব'লে মেনে নেওয়া যেতে পারে। আসল কথা, কোনো শাসনতন্ত্রকে বিচার ক'র্‌তে হ'লে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি বিচার করা চাই। যদি দেখা যায় দেশের সকল মহলেই দরোয়ানের ঠেসাঠেসি ভিড়, অথচ তৃষ্ণায় যখন ছাতি ফাটচে, ম্যালেরিয়ায় যখন নাড়ী ছেড়ে যায়, তখন জনপ্রাণীর সাড়া নেই; যখন দেখি দরোয়ানের তক্‌মা, শিরোপা, বক্‌শিশ, বাহবা সম্বন্ধে দাক্ষিণ্যের অজস্রতা; কোতোয়ালি থেকে সুরু ক'রে দেওয়ানি ফৌজদারী কোনো বিভাগের কারো দুঃখ গায়ে সয় না, কারো আবদার ব্যর্থ হ'তে চায় না, অথচ ঘরের ছেলের প্রাণ যখন কণ্ঠাগত, তখন আত্মনির্ভর সম্বন্ধে সৎপরামর্শ ছাড়া আর কোনো কথা নেই, অর্থাৎ গলায় যখন ফাঁস তখন দুর্গানাম স্মরণ করা ছাড়া আর কোনো উপদেশ যেখান্ থেকে মেলে না, সেখানে পরিমাণের অসঙ্গতিতেই দরোয়ানটাকে যমদূত ব'লে সহজেই মনে হয়। যে-পাকা বাড়িটাতে সুহৃদ্ সহায় আত্মীয়ের চেয়ে পাহারাওয়ালার প্রভাবই বেশি সেই জায়গাটাকেই তো চল্‌তি ভাষায় জেলখানা ব'লে থাকে। বাগানে তো ইচ্ছে ক'রেই লোকে কাঁটাগাছের বেড়া দেয় সে

কি আমরা জানি নে? কিন্তু যেখানে কাঁটাগাছেরই যত আদর, ফুলগাছ শুকিয়ে মরে গেলো, সে-বাগানে আমাদের মনে যদি উৎসাহ না হয় তাহ'লে মালী সেটাকে আমাদের অবিবেচনা মনে করে কেন? যদি শাসনকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি চাওনা দেশে law and order থাকে, আমি বলি খুবই চাই, কিন্তু life and mind তা'র চেয়ে কম মূল্যবান নয়। মানদণ্ডের একটা পাল্লায় বিশ পঁচিশ মণ বাটখারা চাপানো দোষের নয় অন্য পাল্লাটাতে যে-মাল চাপানো হয় তাতে যদি আমাদের নিজের স্বত্ব কিছু থাকে। কিন্তু যখন দেখি এ-পক্ষের দিকটাতেই যত রাজ্যের ইঁট পাথর, আর মালের পনেরো আনাই হ'লো অন্য পক্ষের দিকে, তখন ফৌজে-পুলিশে গড়া মানদণ্ডটা অপমানদণ্ড ব'লেই ঠেকে। নালিশ আমাদের পুলিসের বিরুদ্ধে নয়, নালিশ আমাদের এই ওজনের বিরুদ্ধে; নালিশ, আগুন জ্বলে ব'লে নয়, রান্না চড়ানো হয় না ব'লে। বিশেষত সেই আগুনের বিল্ যখন আমাদেরই চোকাতে হয়। চুলিতে কাঠের খরচটাই এতো সর্ব্বনেশে হ'য়ে ওঠে যে হাঁড়িতে চাল ডাল যোগাবার কড়ি বাকি থাকে না। সেই অবস্থায় যখন পেটের জ্বালায় চোখে জল আসে তখন যদি কর্ত্তা রাগ ক'রে বলেন, "তবে কি চুলোতে আগুন জ্বাল্‌বো না," ভয়ে ভয়ে বলি, "জ্বাল্‌বে বই কি, কিন্তু ওটা-যে চিতার আগুন হ'য়ে উঠ্‌লো।"

যে-দুঃখের কথাটা ব'ল্‌চি এটা জগৎ জুড়ে আজ ছড়িয়ে প'ড়েচে, আজ মুনফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ম্ময় সত্য

রাহুগ্রস্ত। এই জন্যেই মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা, তাকে বঞ্চনা করা এতো সহজ হ'ল। তাই পাশ্চাত্যে পলিটিক্‌সই মানুষের সকল চেষ্টার সর্ব্বোচ্চ চূড়া দখল ক'রে ব'সেচে। অর্থাৎ মানুষের ফুলে'-ওঠা পকেটের তলায় মানুষের চুপ্‌সে-যাওয়া হৃদয় প'ড়েচে চাপা। সর্ব্বভূক্‌ পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো দিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয়নি।

গ

আমাদের রিপু সত্যের সম্পূর্ণ-মূর্ত্তিকে আচ্ছন্ন করে। কামে আমরা মাংসই দেখি আত্মাকে দেখিনে, লোভে আমরা বস্তুই দেখি মানুষকে দেখিনে, অহঙ্কারে আমরা আপনাকেই দেখি অন্যকে দেখিনে। একটা রিপু আছে যা এদের মতো উগ্র নয়, যা ফাঁকা। তাকে বলে মোহ, সে হ'চ্চে জড়তা, অসাড়তা। আমাদের চৈতন্যের আলো ম্লান ক'রে দিয়ে সে সত্যকে আবৃত করে। সে বিঘ্ন নয়, সে আবরণ। অভ্যাস অনেক সময় সেই মোহরূপে আমাদের মনকে আবিষ্ট করে।

কুয়াশায় পৃথিবীর বস্তুকে নষ্ট করে না, তা'র আকাশকে লুপ্ত করে। অসীমকে অগোচর ক'রে দেয়। অভ্যাসের মোহ মনের সেই কুয়াশা। অনির্ব্বচনীয়কে সে আড়াল করে, বিস্ময়-রসকে সে শুকিয়ে ফেলে। তাতে সত্য পদার্থের গুরুত্ব কমে না, তা'র গৌরব ক'মে যায়। আমাদের মন তখন

সত্যের অভ্যর্থনা ক’র্‌তে পারে না। বিস্ময় হ’চ্চে সত্যের অভ্যর্থনা।

ডাক্তার বলে প্রতিদিন একই অভ্যস্ত খাওয়া পরিপাকের পক্ষে অনুকূল নয়। ভোজ্যসম্বন্ধে রসনার বিস্ময় না থাক্‌লে দেহ তাকে গ্রহণ ক’র্‌তে আলস্য করে। শিশু-ছাত্রদের একই ক্লাসে একই সময়ে একই বিষয় শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করানোতেই তাদের শিক্ষার আগ্রহ ঘুচিয়ে দেওয়া হয়।

প্রাণের স্বভাবই চির-উৎসুক। প্রকৃতি তাকে ক্ষণে ক্ষণে আকস্মিকের স্পর্শে চঞ্চল ক’রে রাখে। এমন কি, এই আকস্মিক যদি দুঃখ আকারেও আসে তাতেও চিত্তের বড়ো রকমের উদ্বোধন ঘটে। সীমার অতীত যা, আকস্মিক হ’চ্চে তা’রই দূত, অভাবনীয়ের বার্ত্তা নিয়ে সে আসে, চেতনাকে জড়ত্ব থেকে মুক্তি দেয়।

আমাদের দেশে তীর্থযাত্রা ধর্ম্ম-সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। দেবতাকে যখন অভ্যাসের পর্দ্দায় ঘিরে রাখে তখন আমরা সেই পর্দ্দাকেই পূজা করি। যাদের মন স্বভাবতই বিষয়ী, ধর্ম্মচর্চ্চাতেও যারা বস্তুকে বেশি দাম দেয়, তা’রা দেবতার চেয়ে পর্দ্দাকেই বেশি শ্রদ্ধা করে।

তীর্থযাত্রায় সেই পর্দ্দা ঠেলে দিয়ে মন পথে বেরিয়ে পড়ে। তখন প্রতিদিনের সীমাবদ্ধ জানাকে চিরদিনের অসীম অজানার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সহজ হয়। প্রতিদিন ও চিরদিনের সঙ্গম-স্থলেই সত্যের মন্দির।

এবারে তাই পথের দুই পাশে চাইতে চাইতে বেরিয়ে

ছিলুম। অভ্যাসের জগতে যাকে দেখেও দেখিনে, মন জেগে উঠে ব'ল্‌লে সেই চির-অপরিচিত হয়তো কোথায় অজানা ফুলের মালা প'রে অজানা তারার রাত্রে দেখা দেবে। অভ্যাস ব'লে ওঠে, "সে নেইগো নেই, সে মরীচিকা।" গম্ভীর বাইরেকার বিশ্ব বলে, "আছে বই কি, তাকিয়ে দেখো। দেখা হ'য়ে চুকেচে মনে ক'রে দেখা বন্ধ করো, তাইতো দেখা হয় না।" তখন ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় "দেখা হ'লো বুঝি।" পথিকের প্রাণের উদ্বোধন সেই কী-জানি। সেই কী-জানির উদ্দেশে গান লিখেচি। জীবনের সকল নৈরাশ্য, সকল বিড়ম্বনা, সকল তুচ্ছতার অবসাদ অতিক্রম ক'রেও সেই কী-জানির আভাস আলোতে-ছায়াতে ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠ্‌চে, পথিক তা'রই চমক নেবার জন্যে তা'র জানা ঘরের কোণ্‌ ফেলে পথে বেরিয়েচে।

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫

বৈষ্ণবী আমাকে ব'লেছিলো, "কার বাড়িতে বৈরাগীর কখন্‌ অন্ন জোটে তা'র ঠিকানা নেই ; সে-অন্নে নিজের জোর দাবী খাটে না, তাইতো বুঝি এ অন্ন তিনিই জুগিয়ে দিলেন।" এই কথাই কাল ব'ল্‌ছিলেম, বাঁধা পাওয়ায় পাওয়ার সত্য ম্লান হ'য়ে যায়। না-পাওয়ার রসটা তা'কে ঘিরে থাকে না। ভোগের মধ্যে কেবলমাত্রই পাওয়া, পশুর পাওয়া ; আর

সম্ভোগের মধ্যে পাওয়া না-পাওয়া দুইই মিলেচে, সে হ'লো মানুষের।

ছেলেবেলা হ'তেই বিদ্যার পাকা বাসা থেকে বিধাতা আমাকে পথে বের ক'রে দিয়েচেন। অকিঞ্চন বৈরাগীর মতো অন্তরের রাস্তায় একা চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে মনের অন্ন যখন-তখন হঠাৎ পেয়েচি। আপন মনে কেবলি কথা ব'লে গেচি, সেই হ'লো লক্ষ্মীছাড়ার চাল। ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে এমন কিছু শুন্‌তে পাওয়া যায় যা পূর্ব্বে শুনি নি। বলার স্রোতে যখন জোয়ার আসে তখন কোন্ গুহার ভিতরকার অজানা সামগ্রী ভেসে ভেসে ঘাটে এসে লাগে। মনে হয়না তাতে আমার বাঁধা বরাদ্দের জোর আছে। সেই আচম্‌কা-পাওয়ার বিস্ময়ই তাকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে, উল্কা যেমন হঠাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে আগুন হ'য়ে ওঠে।

পৃথিবীতে আমার প্রেয়সীদের মধ্যে যিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ তাঁর বয়স তিন। ইনিয়ে বিনিয়ে কথা ব'লে যেতে তাঁর এক মুহূর্ত্ত বিরাম নেই। শ্রোতা যারা, তা'রা উপলক্ষ্য; বস্তুত কথাগুলো নিজেকেই নিজে শোনানো; যেমন বাষ্পরাশি ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে গ্রহতারারূপে দানা বেঁধে ওঠে তেম্‌নি কথা-বলার বেগে আপনিই তা'র সজাগ মনে চিন্তার সৃষ্টি হ'তে থাকে। বাইরে থেকে মাষ্টারের বাচালতা যদি এই স্রোতকে ঠেকায় তাহ'লে তা'র আপন চিন্তাধারার সহজ পথ বন্ধ হ'য়ে যায়। শিশুর পক্ষে অতি-মাত্রায় পুঁথিগত বিদ্যাটা ভাবনার স্বাভাবিক গতিকে আট্‌কিয়ে দেওয়া। বিশ্বপ্রকৃতি দিনরাত্রি

কথা কইচে, সেই কথা যখন শিশুর মনকে কথা কওয়ায় তখন তা'র সেই আপন কথাই তা'র সব চেয়ে ভালো শিক্ষা-প্রণালী। মাষ্টার নিজে কথা বলে, আর ছেলেকে বলে, চুপ্। শিশুর চুপ-করা মনের উপর বাইরের কথা বোঝার মতো এসে পড়ে, খাদ্যের মতো নয়। যে-শিশু-শিক্ষা-বিভাগে মাষ্টারের গলাই শোনা যায়, শিশুরা থাকে নীরব, সেখানে আমি বুঝি মরুভূমির উপর শিলবৃষ্টি হ'চ্চে।

যাই হোক্, মাষ্টারের হাতে বেশি দিন ছিলেম না ব'লে আমি যা-কিছু শিখেচি সে কেবল ব'ল্‌তে-ব'ল্‌তে। বাইরে থেকেও কথা শুনেচি, বই প'ড়েচি; সে কোনোদিনই সঞ্চয় কর্‌বার মতো শোনা নয়, মুখস্থ কর্‌বার মতো পড়া নয়। কিছু-একটা বিশেষ ক'রে শেখ্‌বার জন্যে আমার মনের ধারার মধ্যে কোথাও বাঁধ বাঁধিনি। তাই সেই ধারার মধ্যে যা এসে পড়ে তা কেবলি চলাচল করে, ঠাঁই বদল ক'র্‌তে ক'র্‌তে বিচিত্র আকারে তা'রা মেলে মেশে। এই মনোধারার মধ্যে রচনার ঘূর্ণি যখন জাগে তখন কোথা হ'তে কোন্ সব ভাসা কথা কোন্ প্রসঙ্গমূর্ত্তি ধ'রে এসে পড়ে তা কি আমি জানি?

অনেকে হয়তো ভাবেন ইচ্ছা ক'র্‌লেই বিশেষ বিষয় অবলম্বন ক'রে আমি বিশেষ ভাবে ব'ল্‌তে বা লিখ্‌তে পারি। যাঁরা পাকা বক্তা বা পাকা লেখক তাঁরা পারেন; আমি পারিনে। যার আছে গোয়াল, ফরমাস ক'র্‌লেই বিশেষ বাঁধা গোরুটাকে বেছে এনে সে দুইতে পারে। আর যার আছে অরণ্য, যে-গোরুটা যখন এসে পড়ে তা'কে নিয়েই তা'র

উপস্থিত মতো কারবার। আশু মুখুজ্জে মশায় ব'ল্লেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা ক'র্তে হবে। তখন তো ভয়ে ভয়ে ব'ল্লেম, আচ্ছা ! তা'র পরে যখন জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, বিষয়টা কী, তখন চোখ বুজে ব'লে দিলেম, সাহিত্য সম্বন্ধে। সাহিত্য সম্বন্ধে কী-যে ব'ল্বো আগেভাগে তা জান্বার শক্তিই ছিলো না। একটা অন্ধ ভর্সা ছিলো যে, ব'ল্তে ব'ল্তেই বিষয় গ'ড়ে উঠ্বে। তিনদিন ধ'রে বকেছিলেম। শুনেচি অনেক অধ্যাপকের পছন্দ হ'লো না। বিষয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় দুইয়েরই মর্য্যাদা রাখ্তে পারি নি। তাঁদের দোষ নেই, সভাস্থলে যখন এসে দাঁড়ালেম তখন মনের মধ্যে বিষয় ব'লে কোনো বালাই ছিল না। বিষয় নিয়েই যাঁদের প্রতিদিনের কারবার, বিষয়হীনের অকিঞ্চনতা তাঁদের কাছে ফস্ ক'রে ধরা প'ড়ে গেলো।

এবার ইটালিতে মিলান্ সহরে আমাকে বক্তৃতা দিতে হ'য়েছিলো। অধ্যাপক ফর্ম্মিকি বারবার জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, বিষয়টা কী ? কী ক'রে তাঁকে বলি যে, যে-অন্তর্য্যামী তা জানেন তাঁকে প্রশ্ন ক'রলে জবাব দেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিলো যদি একটা চুম্বক পাওয়া যায় তবে আগেই সেটা তর্জ্জমা ক'রে ছাপিয়ে রাখ্বেন। আমি বলি, সর্ব্বনাশ, বিষয় যখন দেখা দেবে চুম্বক তা'র পরেই সম্ভব। ফল ধর্বার আগেই তা'র আঁঠি খুঁজে পাই কী উপায়ে ? বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার ভদ্র অভ্যাস নেই, আমার অভ্যাস লক্ষ্মীছাড়া। ভেবে ব'ল্তে পারিনে, ব'ল্তে ব'ল্তে ভাবি, মৌমাছির পাখা যেমন উড়্তে

গিয়ে গুন্‌গুন্‌ করে। সুতরাং অধ্যাপক হবার আশা আমার নেই, এমন কি, ছাত্র হবারও ক্ষমতার অভাব।

এম্‌নি ক'রে দৈবক্রমে বৈরাগীর তত্ত্ব-কথাটা বুঝে নিয়েচি। যারা বিষয়ী তা'রা বিশ্বকে বাদ দিয়ে বিশেষকে খোঁজে। যারা বৈরাগী তা'রা পথে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তেই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে বিশেষকে চিনে নেয়। উপরি-পাওনা ছাড়া তাদের কোনো বাঁধা পাওনাই নেই। বিশ্বপ্রকৃতি স্বয়ং যে এই লক্ষ্যহীন বৈরাগী—চ'ল্‌তে চ'ল্‌তেই তা'র যা-কিছু পাওয়া। জড়ের রাস্তায় চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে সে হঠাৎ পেয়েছে প্রাণকে, প্রাণের রাস্তায় চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে সে হঠাৎ পেয়েছে মানুষকে। চলা বন্ধ ক'রে যদি সে জমাতে থাকে তা হ'লেই সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে জঞ্জাল। তখনি প্রলয়ের ঝাঁটার তলব পড়ে।

বিশ্বের মধ্যে একটা দিক আছে যেটা তা'র স্থাবর বস্তুর অর্থাৎ বিষয়-সম্পত্তির দিক্‌ নয়; যেটা তা'র চলচ্চিত্তের নিত্য প্রকাশের দিক্‌। যেখানে আলো ছায়া সুর, যেখানে নৃত্য গীত বর্ণ গন্ধ, যেখানে আভাস ইঙ্গিত। যেখানে বিশ্ববাউলের একতারার ঝঙ্কার পথের বাঁকে বাঁকে বেজে বেজে ওঠে, যেখানে সেই বৈরাগীর উত্তরীয়ের গেরুয়া রঙ বাতাসে বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে উড়ে যায়। মানুষের ভিতরকার বৈরাগীও আপন কাব্যে গানে ছবিতে তারি জবাব দিতে দিতে পথে চলে, তেম্‌নিতরই গানের নাচের রূপের রসের ভঙ্গীতে। বিষয়ী-লোক আপন খাতাঞ্চিখানায় ব'সে যখন তা শোনে তখন অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, "বিষয়টা কী? এতে

মুনফা কী আছে, এতে কী প্রমাণ করে?" অধরকে ধরার জায়গা সে খোঁজে তা'র মুখ-বাঁধা থলিতে, তা'র চাম্‌ড়া-বাঁধানো খাতায়। নিজের মনটা যখন বৈরাগী হয়নি তখন বিশ্ববৈরাগীর বাণী কোনো কাজে লাগে না। তাই দেখেছি খোলা রাস্তার বাঁশিতে হঠাৎ-হাওয়ায় যে-গান বনের মর্ম্মরে নদীর কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে বেজেছে, যে-গান ভোরের শুকতারার পিছে পিছে অরুণ আলোর পথ দিয়ে চ'লে গেলো, সহরের দরবারে ঝাড়-লণ্ঠনের আলোতে তা'রা ঠাঁই পেলো না; ওস্তাদেরা ব'ল্‌লে, "এ কিছুই না," প্রবীণেরা ব'ল্‌লে, "এর মানে নেই!" কিছু নয়ই তো বটে, কোনো মানে নেই, সে-কথা খাঁটি; সোনার মতো নিকষে কষা যায় না, পাটের বস্তার মতো দাঁড়িপাল্লায় ওজন চলে না। কিন্তু বৈরাগী জানে, অধর রসেই ওর রস। কতবার ভাবি, গান তো এসেচে গলায় কিন্তু শোনাবার লগ্ন রচনা ক'র্‌তে তো পারিনে; কান যদি-বা খোলা থাকে আন্‌-মনার মন পাওয়া যাবে কোথায়? সে-মন যদি তা'র গদি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়্‌তে পারে তবেই-তো যা বলা যায় না তাই সে শুন্‌বে; যা জানা যায় না তাই সে বুঝ্‌বে।

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫

জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জ্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হ'য়েচে। তীরে দেখ্‌তে

পাচ্চি লোকালয়ের আলো, জনতার কোলাহল; ক্ষণে ক্ষণে ঘাটেও নাম্‌তে হ'য়েচে, কিন্তু কোনোখানে জমিয়ে ব'স্‌তে পারিনি। বন্ধুরা ভাবে তাদের এড়িয়ে গেলুম, শত্রুরা ভাবে অহঙ্কারেই দূরে দূরে থাকি। যে-ভাগ্যদেবতা বরাবর আমাকে সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেলো, পাল গোটাতে সময় দিলে না, রসি যতবার ডাঙার খোঁটায় বেঁধেচি টান মেরে ছিঁড়ে দিয়েচে, সে কোনো কৈফিয়ৎ দিলে না।

সুখদুঃখের হিসাব-নিকাশ নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে তক্‌রার ক'রে লাভ নেই। যা হ'য়েচে তা'র একটা হেতু আছে, সেই হেতুর উপর রাগ ক'র্‌লে হওয়ার উপরেই রাগ্‌তে হয়। ঘড়া রাগ ক'রে ঠং ঠং শব্দে যদি বলে "আমাকে শূন্য ক'রে গড়েচে কেন," তা'র জবাব হ'চ্চে "তোমাকে শূন্য ক'র্‌বে ব'লেই ঘড়া করেনি, ঘড়া ক'র্‌বে ব'লেই শূন্য ক'রেচে।" ঘড়ার শূন্যতা পূর্ণতারই অপেক্ষায়; আমার একলা-আকাশের ফাঁকটাকে ভর্ত্তি ক'র্‌তে হবে, সেই প্রত্যাশাটা আমার সঙ্গে সঙ্গে লেগে আছে। দৈবের এই দাবীটিই আমার সম্মান; এ'কে রক্ষা ক'র্‌তে হ'লে পূরাপূরি দাম দিতে হবে।

তাই শূন্য আকাশে একলা ব'সে ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট কাজ ক'রে থাকি। তাতেই আমার হওয়ার অর্থটা বুঝি, কাজেই আনন্দও পাই। বাঁশির ফাঁক্‌টা যখন সুরে ভ'রে ওঠে তখন তা'র আর কোনো নালিশ থাকে না।

শরীরে মনে প্রাণের দক্ষিণ হাওয়া যখন জোরে বয় তখন আত্ম-প্রকাশের দাক্ষিণ্যেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার মেলে।

কিন্তু যখন ক্লান্তি আসে, যখন পথ ও পাথেয় দুইই যায় ক'মে অথচ সাম্‌নে পথটা দেখ্‌তে পাই সুদীর্ঘ, তখন ছেলেবেলা থেকে যে-ঘর বাঁধ্‌বার সময় পাইনি সেই ঘরের কথা মন জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে থাকে। তখনি আকাশের তারা ছেড়ে দীপের আলোর দিকে চোখ পড়ে। জীবলোকে ছোটো ছোটো মাধুরীর দৃশ্য যা তীরের থেকে দেখা দিয়ে স'রে স'রে গিয়েচে চোখের উপরকার আলো ম্লান হ'য়ে এলে সেই অন্ধকারে তাদের ছবি ফুটে ওঠে, তখন বুঝ্‌তে পারি সেইসব ক্ষণিকের দেখা প্রত্যেকেই মনের মধ্যে কিছুনা-কিছু ডাক দিয়ে গেচে। তখন মনে হয়, বড়ো বড়ো কীর্ত্তি গ'ড়ে তোলাই-যে বড়ো কথা তা নয়, পৃথিবীতে যে-প্রাণের যজ্ঞ সম্পন্ন কর্‌বার জন্যে নিমন্ত্রণ পেয়েচি তাতে উৎসবের ছোটো পেয়ালাগুলি রসে ভ'রে তোলা শুন্‌তে সহজ, আসলে দুঃসাধ্য।

এবারে ক্লান্ত দুর্ব্বল শরীর নিয়ে বেরিয়েছিলুম। তাই অন্তরে যে-নারীপ্রকৃতি অন্তঃপুরচারিণী হ'য়ে বাস করে ক্ষণে ক্ষণে সে আপন ঘরের দাবী জানাবার সময় পেয়েছিলো। এই দাবীর মধ্যে আমার পক্ষে কেবল যে আরামের লোভ তা নয়, সার্থকতার আশাও র'য়েচে। জীবন-পথের শেষদিকে বিশ্ব-লক্ষ্মীর আতিথ্যের জন্যে শ্রান্ত চিত্তের যে-ঔৎসুক্য সে কেবল শক্তির অপচয় নিবারণের আগ্রহে, পাথেয় পূর্ণ ক'রে নেবার জন্যে। কাজের হুকুম এখনো মাথার উপর অথচ উদ্যম এখন নিস্তেজ, মন তাই প্রাণশক্তির-ভাণ্ডারীর খোঁজ করে। শুষ্ক তপস্যার পিছনে কোথায় আছে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার?

দিনের আলো যখন নিবে আস্‌চে, সাম্‌নের অন্ধকারে যখন সন্ধ্যার তারা দেখা দিলো, যখন জীবনযাত্রার বোঝা খালাষ ক'রে অনেকখানি বাদ দিয়ে অল্প কিছু বেছে নেবার জন্যে মনকে তৈরি হ'তে হ'চ্চে তখন কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নেবার জন্যে মনের ব্যগ্রতা আমি তাই লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌চি। সমস্ত দিন প্রাণপণ চেষ্টায় যা-কিছু সে জমিয়েছিলো, গ'ড়ে তুলেছিলো, সংসারের হাটে যদি তা'র কিছু দাম থাকে তবে তা সেইখানেই থাক্‌, যারা আগ্‌লে রাখ্‌তে চায় তা'রাই তা'র খবরদারী করুক্‌; রইলো টাকা, রইলো খ্যাতি, রইলো কীর্ত্তি, রইলো প'ড়ে বাইরে; গোধূলির আঁধার যতই নিবিড় হ'য়ে আস্‌চে ততই তা'রা ছায়া হ'য়ে এলো; তা'রা মিলিয়ে গেলো মেঘের গায়ে সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটার সঙ্গে। কিন্তু যে-অনাদি অন্ধকারের বুকের ভিতর থেকে একদিন এই পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেচি সেখানকার প্রচ্ছন্ন উৎস থেকে উৎসারিত জলধারা ক্ষণে ক্ষণে আমার যাত্রাপথের পাশে পাশে মধুর কলস্বরে দেখা দিয়ে আমার তৃষ্ণা মিটিয়েচে, আমার তাপ জুড়িয়েচে, আমার ধূলো ধুয়ে দিয়েচে, সেই তীর্থের জল ভ'রে রইলো আমার স্মৃতির পাত্রখানি। সেই অন্ধকার অপরিসীমের হৃদয়কন্দর থেকে বারবার যে-বাঁশির ধ্বনি আমার প্রাণে এসে পৌঁচেছিলো, কত মিলনে, কত বিরহে, কত কান্নায়, কত হাসিতে; শরতের ভোর বেলায়, বসন্তের সায়াহ্নে, বর্ষার নিশীথ রাত্রে; কত ধ্যানের শান্তিতে, পূজার আত্মনিবেদনে, দুঃখের গভীরতায়; কত দানে, কত গ্রহণে,

কত ত্যাগে, কত সেবায়,—তা'রা আমার দিনের পথে সুর হ'য়ে বেজেছিলো, আজ তা'রাই আমার রাত্রের পথে দীপ হ'য়ে জ্ব'লে উঠ্‌চে। সেই অন্ধকারের ঝর্‌না থেকেই আমার জীবনের অভিষেক, সেই অন্ধকারের নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার মৃত্যুর আমন্ত্রণ; আজ আমি তাকে ব'ল্‌তে পার্‌বো, হে চিরপ্রচ্ছন্ন, আমার মধ্যে যা-কিছু তুমি তোমার গভীরের ভিতর থেকে তারার মতো প্রকাশ ক'রেচো রূপে ও বাণীতে, তাতেই নিত্যকালের অমৃত; আমি খুঁজে খুঁজে পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে কীর্ত্তির যে-জয়স্তম্ভ গেঁথেচি, কালস্রোতের ভাঙনের উপরে তা'র ভিৎ। সেইজন্যেই আজ গোধূলির ধূসর আলোয় একলা ব'সে ভাবছিলুম রঙীন্ রসের অক্ষরে লেখা যে-লিপি তোমার কাছ-থেকে ক্ষণে ক্ষণে এসেছিলো ভালো ক'রে তা পড়া হয়নি, ব্যস্ত ছিলুম। তা'র মধ্যে নিমন্ত্রণ ছিলো। কোথায়? কারখানাঘরে নয়, খাতাঞ্চিখানায় নয়, ছোটো ছোটো কোণে যেখানে ধরণীর ছোটো সুখগুলি লুকানো। তাই আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে মনে মনে ভেবে দেখ্‌চি, কতবার বঞ্চিত হ'লুম। জনতার জয়ধ্বনির ডাকে কতবার অন্যমনে গভীর নিভৃতের পাশ দিয়ে চ'লে এসেচি; মায়ামৃগের অনুসরণে কতবার সরল সুন্দরের দিকে চোখ প'ড়্‌লো না। জীবন-পথে আশে পাশে সুধার কণা-ভরা যে-বিনামূল্যের ফলগুলি পাতার আড়ালে ঢাকা ছিলো, তাদের এড়িয়ে উপবাসী হ'য়ে চ'লে এসেচি ব'লেই এত শ্রান্তি, এত অবসাদ। প্রভাত যেখান থেকে আপন পেয়ালা আলোতে

ভ'রে নেয়, রাত্রি যার আঙিনায় ব'সে প্রাণের ছিন্ন সূত্রগুলি বারে বারে জুড়ে তোলে ঐ লুকিয়ে-থাকা ছোটো ফলগুলি সেই মহান্ধকারেরই রহস্যগর্ভ থেকে রস পেয়ে ফ'লে উঠ্‌চে, সেই অন্ধকার "যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ।"

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫
ক্রাকোভিয়া জাহাজ

বাংলা ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল্‌ আছে; ভালোলাগা আর ভালোবাসা। এই দুটো শব্দে আছে প্রেম-সমুদ্রের দুই উল্টোপারের ঠিকানা। যেখানে ভালোলাগা সেখানে ভালো আমাকে লাগে, যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভালো অন্যকে বাসি। আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালোলাগা, যখন অন্যের দিকে তখন ভালোবাসা। ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন।

সংস্কৃত ভাষায় অনুভব ব'ল্‌তে যা' বুঝি তা'র খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ একদিন ছিলো। এত বড়ো একটা চ'ল্‌তি ব্যবহারের কথা হারালো কোন্‌ ভাগ্যদোষে ব'ল্‌তে পারিনে। এমনি দিন ছিলো যখন লাজবাসা ভয়বাসা ব'ল্‌তে বোঝাতো লজ্জা অনুভব করা, ভয় অনুভব করা। এখন বলি, লজ্জা পাওয়া, ভয় পাওয়া। কিল্‌ খাওয়া, গাল্‌ খাওয়া যেমন ভাষার বিকার, লজ্জা পাওয়া, ভয় পাওয়াও তেম্‌নি।

কারো 'পরে আমাদের অনুভব যখন সম্পূর্ণ ভালো হ'য়ে

ওঠে, ভালো ভাবায় ভালো ইচ্ছায় মন কানায় কানায় ভর্ত্তি হয় তখন তাকেই বলি ভালোবাসা। পূর্ণ উৎকর্ষের ভাবকেই বলা যায় ভালো। স্বাস্থ্য যেমন প্রাণের পূর্ণতা, সৌন্দর্য্য যেমন রূপের পূর্ণতা, সত্য যেমন জ্ঞানের পূর্ণতা, ভালোবাসা তেম্‌নি অনুভূতির পূর্ণতা। ইংরেজিতে good feeling বলে এ তা নয়, এ'কে বলা যেতে পারে perfect feeling

শুভইচ্ছার পূর্ণতা হ'চ্চে নৈতিক, তা'র ক্রিয়া ব্যবহারের উপর; ভালোবাসার পূর্ণতা আত্মিক, সে হ'চ্চে মানুষের ব্যক্তি স্বরূপের (personality) পরমপ্রকাশ; শুভইচ্ছা অন্ধকারে যষ্টি, প্রেম অন্ধকারে চাঁদ। মায়ের স্নেহ মায়ের শুভইচ্ছা মাত্র নয়, তা তাঁর পূর্ণতার ঐশ্বর্য্য। তা অন্নের মতো নয়, তা অমৃতের মতো। এই অনুভূতির পূর্ণতা একটি শক্তি। ভালোবাসার বিষয়ের মধ্যে অসীমকে বোধ কর্‌বার শক্তি, ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অপরিমেয়কে দেখ্‌তে পাওয়া এবং স্বীকার করাই অপরিমেয়কে সীমার মন্দিরে জাগিয়ে তোল্‌বার শক্তি।

নিজের অস্তিত্বের মূল্য যে-মানুষ ছোটো ক'রে দেখে আত্ম-অবিশ্বাসের অবসাদেই সে নিজের সম্পদ উদ্‌ঘাটিত ক'র্‌তে ভরসা পায় না। বিশ্ব আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রত্যেক মানুষকে গ্রহণ ও ধারণ করে, মানুষের অন্তরে এই মস্ত সত্যটির অনুবাদ হ'চ্চে প্রেম। ব্যক্তিবিশেষকে সে ডাক দিয়ে বলে, "তুমি কারোর চেয়ে কম নও, তোমার মধ্যে এমন মূল্য আছে যার জন্যে প্রাণ দেওয়া চলে।" মানুষ যেখানে

আপন সীমা টেনে দিয়ে নিজকে সাধারণের সামিল ক'রে অলস হ'য়ে ব'সে থাকে প্রেম ব্যক্তিবিশেষের সেই সাধারণ সীমাকে মানে না, তাকে অর্ঘ্য দিয়ে বলে, তোমার কপালে আমি তিলক দিয়েচি, তুমি অসাধারণ। সূর্য্যের আলো বৃষ্টির জল যেমন নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্রই মাটির জড়তা ও দৈন্য অস্বীকার করে, মরুকে বারবার স্পর্শ করে, তাকে শ্যামলতায় পুলকিত ক'রে তোলে, যে-ভূমি রিক্ত তারো সফলতার জন্যে যেমন তাদের নিরন্তর প্রতীক্ষা, তা'র কাছেও যেমন পূর্ণতার দাবী, মানুষের সমাজে প্রেম তেম্নি সব জায়গাতেই অসীম প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখে। ব্যক্তিকে সে যে-মূল্য দেয় সে-মূল্য মহিমার মূল্য। অন্তর্নিহিত এই মহিমার আশ্বাসে মানুষের সৃষ্টিশক্তি নানাদিকে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে; তা'র কর্ম্মের ক্লান্তি দূর হ'য়ে যায়।

এই ব্যক্তিগত প্রেমের বাহন নারী। ইতিহাসের অপ্রকাশিত লিখন যদি বের করা যেতো তাহ'লে দেখ্‌তে পেতেম নারীর প্রেমের প্রেরণা মানুষের সমাজে কী কাজ ক'রেচে। শক্তির যে-ক্রিয়া উদ্যত চেষ্টারূপে চঞ্চল আমরা তাকেই শক্তির প্রকাশরূপে দেখি, কিন্তু যে-ক্রিয়া গূঢ় উদ্দীপনারূপে পরিব্যাপ্ত তা'র কথা মনেই আনিনে। বিস্ময়ের কথা এই যে বিশ্বের স্ত্রীপ্রকৃতিকেই ভারতবর্ষ শক্তি ব'লে জেনেচে।

সকলেই জানে এই শক্তিরই বিকারের মতো এমন সর্ব্বনেশে বিপদ আর কিছুই নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমের

হৃদয়ের মধ্যে অদৃশ্য থেকে দ্রৌপদী তাঁকে বল জুগিয়েচেন। বীর আণ্টনির হৃদয় অধিকার ক'রে ক্লিওপাট্রা তাঁর বল হরণ ক'রে নিলো। সত্যবানকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করেন সাবিত্রী, কিন্তু কত নারী পুরুষের সত্য নষ্ট ক'রে তাকে মৃত্যুর মুখে নিয়ে গেচে তা'র সংখ্যা নেই।

তাইতো গোড়ায় ব'লেচি প্রেমের দুই বিরুদ্ধপার আছে। একপারে চোরাবালি, আরেকপারে ফসলের ক্ষেত। একপারে ভালোলাগার দৌরাত্ম্য, অন্যপারে ভালোবাসার আমন্ত্রণ। মাতৃস্নেহের মধ্যেও এই দুই জাতের প্রেম। একটাতে প্রধানত আসক্তি নিজের পরিতৃপ্তি খোঁজে,—সেই অন্ধ মাতৃস্নেহ আমাদের দেশে বিস্তর দেখ্‌তে পাই। তাতে সন্তানকে বড়ো ক'রে না তুলে তাকে অভিভূত করে। তাতে কোনো পক্ষেরই কল্যাণ নেই। যে-প্রেম ত্যাগের দ্বারা মানুষকে মুক্তি দিতে জানে না, পরন্তু ত্যাগের বিনিময়ে মানুষকে আত্মসাৎ ক'র্‌তে চায় সে-প্রেম তো রিপু। একপক্ষকে ক্ষুধার দাহে সে দগ্ধ করে অন্যপক্ষকে লালায়িত আসক্তি দ্বারা লেহন ক'রে জীর্ণ ক'রে দেয়। এই মাতৃলালন-পাশের পরিবেষ্টনের মধ্যে যারা চির-অবরুদ্ধ আমাদের দেশে তাদের সংখ্যা বিস্তর, তাদের শৈশব আর ছাড়্‌তে চায় না। আসক্তি-পরায়ণ মাতার মূঢ় আদেশ-পালনের অনর্থ বহন ক'রে অপমানের মধ্যে অভাবের মধ্যে চিরজীবনের মতো মাথা হেঁট হ'য়ে গেচে এমন সকল বয়স্ক নাবালকের দল আমাদের দেশে ঘরে ঘরে। আমাদের দেশে মাতার ক্রোড়-রাজত্ব বিস্তারের

পৌরুষের যত হানি হ'য়েচে এমন বিদেশী শাসনের হাত-কড়ির নির্ম্মমতার দ্বারাও হয়নি।

স্ত্রী পুরুষের প্রেমেও সেই একই কথা। নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত ক'র্‌তে পারে কিন্তু সে-প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হ'য়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই। পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়; নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম্ম সেবাধর্ম্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর-মেলানো; এই দু'য়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আরেক সুরও বাজ্‌তে পারে, মদনধনুর জ্যায়ের টঙ্কার, সে মুক্তির সুর না, সে বন্ধনের সঙ্গীত। তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়।

কেন বলি পুরুষের ধর্ম্ম তপস্যা? কারণ, জীবলোকের কাজে প্রকৃতি তাকে নারীর তুলনায় অনেক পরিমাণে অবকাশ দিয়েচে। সেই অবকাশটাকে নষ্ট ক'র্‌লেই তা'র সবচেয়ে ফাঁকি। পুরুষ সেই অবকাশকে আপন সাধনার ক্ষেত্র ক'রেচে ব'লেই মানুষের উৎকর্ষ জৈব প্রকৃতির সীমানা অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেলো। প্রকৃতির দাবী থেকে মুক্তি নিয়েই পুরুষ জ্ঞানকে ধ্যানকে শক্তিকে অসীমের মধ্যে অনুসরণ ক'রে চ'ল্‌চে। সেইজন্যে পুরুষের সাধনায় চিরকালই প্রকৃতির সঙ্গে বিরুদ্ধতা আছে। নারীর প্রেম যেখানে এই বিরোধের সমন্বয় ক'রে দেয়, কঠোর জ্ঞানের বেদি-প্রাঙ্গণে সে যখন পূজা-মাধুর্য্যের আসন রচনা করে; পুরুষের মুক্তিকে

যখন সে লুপ্ত করে না, তাকে সুন্দর ক'রে তোলে; তা'র পথকে অবরুদ্ধ করে না, পথের পাথেয় জুগিয়ে দেয়; ভোগবতীর জলে ডুবিয়ে দেয় না, সুরধুনীর জলে স্নান করায়, তখন বৈরাগ্যের সঙ্গে অনুরাগের, হরের সঙ্গে পার্ব্বতীর শুভপরিণয় সার্থক হয়।

বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই শক্তি কাজ কর্‌বার ক্ষেত্র পায়। চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝখানে যে-বিরহ আছে তা'রই অবকাশে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রকে চাঁদ কথা-কওয়ায়। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের মাঝে বিধাতা একটি দূরত্ব রেখে দিয়েচেন। এই দূরত্বের ফাঁকটাই কেবলি সেবায় ক্ষমায় বীর্য্যে সৌন্দর্য্যে কল্যাণে ভ'রে ওঠে, এইখানেই সীমায় অসীমে শুভদৃষ্টি। জৈবক্ষেত্রে প্রকৃতির অধিকারের মধ্যে মানুষের অনেক সৃষ্টি আছে কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে তা'র সৃষ্টির অন্ত নেই। চিত্তের মহাকাশ স্থূল আসক্তির দ্বারা জমাট হ'য়ে না গেলে তবেই সেই সৃষ্টির কাজ সহজ হয়। দীপশিখাকে দুই হাতে আঁক্‌ড়ে ধ'রে যে-মাতাল বেশি ক'রে পেতে চায়, সে নিজেও পোড়ে, আলোটিকেও নিবিয়ে দেয়।

মুক্ত অবকাশের মধ্যে পুরুষ মুক্তি-সাধনার যে-মন্দির বহুদিনের তপস্যায় গেঁথে তুলেচে পূজারিণী নারী সেইখানে প্রেমের প্রদীপ জ্বাল্‌বার ভার পেলো। সে-কথা যদি সে ভুলে যায়, দেবতার নৈবেদ্যকে যদি সে মাংসের হাটে বেচ্‌তে কুণ্ঠিত না হয়, তা হ'লে মর্ত্ত্যের মর্ম্মস্থানে যে-অমরাবতী আছে তা'র পরাভব ঘটে, পুরুষ যায় প্রমত্ততার রসাতলে, আর

নারীর হৃদয়ে যে রসের পাত্র আছে তা' ভেঙে গিয়ে সে-রস ধূলাকে পঙ্কিল করে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫
ক্রাকোভিয়া ষ্টীমার

পূর্ব্বেই ব'লেচি, নন্দিনী তা'র নাম, তিন বছর তা'র বয়স, সে তৃতীয়ার চাঁদটুকুর মতো। আধুনিক নবেল পড়্‌বার সময় তা'র এখনো হয়নি। ঘুম-পাড়াবার আগে তাকে গল্প শোনাবার লোক চাই। তাই যে-আমি এতকাল জনসাধারণকে ঘুম-পাড়াবার বায়না নিয়েছিলুম, দায়ে প'ড়ে সেই-আমার পদবৃদ্ধি হ'লো। আজকাল এই ক্ষুদ্র মহারাণীর শয্যাপার্শ্বে আমার তলব হ'চ্চে।

কাল রাত্রে আহার সেরে জাহাজের কামরায় এসে ব'সেচি। হুকুম হ'লো, "দাদামশায়, বাঘের গল্প বলো।" আমি কবি ভবভূতির মতো বিনয় ক'রে ব'ল্‌লুম, "আমার সমযোগ্য লোক হয়তো জাহাজে এক-আধজন মিল্‌তেও পারে, কারণ যাত্রী অনেক এবং বিপুলা চ তরণী।" কিন্তু নিষ্কৃতি পেলুম না।

তখন সুরু ক'রে দিলুম ;

এক যে ছিলো বাঘ,
তা'র সর্ব্ব অঙ্গে দাগ।

আয়নাতে তাই হঠাৎ দেখে
হ'লো বিষম রাগ।
ঝগ্‌ড়ুকে সেই ব'ল্‌লে ডেকে
এখ্‌খনি তুই ভাগ্‌,
যা চ'লে তুই Prague,
সাবান যদি না মেলে তো যাস্‌ হাজারিবাগ।

বীণাপাণির কৃপা এইখানে এসে থেমে গেলো, ছড়া আর এগোলো না। তখন ছন্দের বেড়া ডিঙিয়ে গদ্যের মধ্যে নেমে প'ড়্‌লুম। পাঠক নিশ্চয় বুঝ্‌তে পার্‌চেন গল্পের মূল ধারাটা হ'চ্চে, বাঘের সর্ব্বাঙ্গীণ কলঙ্ক-মোচনের জন্যে সাবান অন্বেষণের দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে ঝগ্‌ড়ু-নামধারী বেহারার যাত্রা।

কথা উঠ্‌বে, ঝগ্‌ড়ুর তাগিদটা কিসের। দয়ারও নয়, মৈত্রীরও নয়, ভয়ের তাগিদ। বাঘ শাসিয়েছিলো, সাবান না আন্‌তে পার্‌লে তা'র কান ছিঁড়ে নেবে। এতে বাস্তব-বিলাসীরা আশ্বস্ত হবেন, বুঝ্‌বেন, তা হ'লে গল্পটা নেহাৎ আজ্‌গুবি নয়।

প্রথমে দেখাতে হ'লো পাথেয় এবং সাবানের মূল্যের জন্যে কী অসম্ভব উপায়ে ঝগ্‌ড়ু একেবারে পাঁচ তিন নয়, সাত দশ পয়সা সংগ্রহ ক'র্‌লে। টেকে গুঁজে গোরুর-গাড়ি ক'রে সে বৃহস্পতিবারের বারবেলায় চেকোস্লোভাকিয়ায় রওনা হ'লো। বোলপুরের কাছে ধোবাপাড়ার রাস্তায় আস্‌তেই খামকা একটা ব্রাউন রঙের গাধা সাদারঙের গোরুটার গা চেটে দিলে। বর্ণভেদে শ্রদ্ধাবান্ গোরুটা জাতিচ্যুতির ক্ষোভে

গাড়িটা উল্‌টিয়ে দিয়ে বন্ধন-মুক্তভাবে চারপা তুলে সংসার ত্যাগ ক'রে যাওয়াতে সেই অপঘাতে ঝগ্‌ড়ুর পা ভেঙে তাকে রাস্তায় প'ড়ে থাকতে হ'লো। বেলা ব'য়ে যায়, দূর থেকে ক্ষণে-ক্ষণে বাঘের ডাকও শোনা যাচ্চে। এখন হতভাগার কান বাঁচে কী ক'রে? এমন সময় ঝুড়িকাঁখে জোড়াসাঁকোর মোক্ষদা চ'লেচে হাটে লাউশাক কিন্‌তে। ঝগ্‌ড়ু ব'ল্‌লে, "মোক্ষদা, ও মোক্ষদা, তোমার ঝুড়িতে ক'রে আমাকে ইষ্টিশনে পৌঁছিয়ে দাও।" মোক্ষদা যদি তখনি দয়া ক'রে সহজে রাজি হ'তো, তা হ'লে বাস্তবওয়ালার মতে সেটা বিশ্বাস যোগ্য হ'তো না। তাই দেখাতে হ'লো ঝগড়ু যখন টেঁকের থেকে দু-পয়সা নগদ দেবে কবুল ক'র্‌লে তখনই মোক্ষদা তাকে ঝুড়িতে তুলে নিলে। আশা ক'রেছিলুম, গল্পের এই সন্ধিস্থলে এসে পৌঁছোবার পূর্ব্বেই শ্রোত্রীর ঘুম আস্‌বে। তা'র পরে কাল আবার যদি আমাকে ধরে, তা হ'লে উপসংহারে দেখাতে হবে, ভালোমানুষ ঝগ্‌ড়ুর কানের তো কোনো অপচয় হ'লোই না, বরঞ্চ পূর্ব্বের চেয়ে এই প্রত্যঙ্গটা দীর্ঘতর হ'য়ে উঠে কানের বানানে দন্ত্য "ন"কে মাত্রা-ছাড়া মূর্দ্ধন্য "ণ"য়ে খাড়া ক'রে তোল্‌বার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে। কেবল কাটা গেলো ঐ দুষ্ট বাঘের লেজটা। সংসারে ধর্ম্মের পুরস্কার ও অধর্ম্মের তিরস্কার-মূলক উপদেশের সাহায্যে কলুষিত বঙ্গসাহিত্যে স্বাস্থ্যকর হাওয়া বইয়ে দেবার ইচ্ছাটাও আমার মনে ছিলো।

কিন্তু গল্পের গোড়ায় নন্দিনীর চোখে যে-একটু ঘুমের

আবেশ ছিলো, সেটা কেটে গিয়ে তা'র দৃষ্টি শরৎকালের আকাশের মতো জ্বল্‌জ্বল্ ক'র্‌তে লাগ্‌লো। ভয়ে হোক্, ভক্তিতে হোক্, বাঘ যদি-বা ঝগ্‌ড়ুর কানটা ছেড়ে দিতে রাজি হয়, নন্দিনী গল্পটাকে ছাড়্‌তে কিছুতেই রাজি হ'লো না। অবশেষে তুইচার-জন আত্মীয়-স্বজনের মধ্যস্থতায় কাল রাত্রির মতো ছুটি পেয়েচি।

আর্টিস্‌ট্ ব'ল্‌লেন, গল্পের প্রবাহে নানা-রকম ভেসে-আসা ছবি ওর মনকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে রাখ্‌ছিলো। তা হ'লেই তর্ক ওঠে, ছবির এমন কী গুণ আছে যাতে ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখে। কোনো দৃশ্য যখন বিশেষ ক'রে আমাদের চোখ ভোলায়, তখন কেন আমরা বলি, যেন ছবিটি ?

মুখ্যত ছবির গুণ হ'চ্চে দৃশ্যতা। তাকে আহার করা নয়, ব্যবহার করা নয়, তাকে দেখা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যই নেই। তা হ'লেই ব'ল্‌তে হবে, যাকে আমরা পুরোপুরি দেখ্‌তে পাই তাকে আমাদের ভালো লাগে। যাকে উদাসীন-ভাবে দেখি, তাকে পুরো দেখিনে ; যাকে প্রয়োজনের প্রসঙ্গে দেখি, তাকেও না ; যাকে দেখার জন্যেই দেখি, তাকেই দেখ্‌তে পাই। বোলপুরের রাস্তায় গোরু, গাধা, গাড়ি উল্টে ঝগ্‌ড়ুর পা-ভাঙা প্রভৃতি দৃশ্যের দাম কিসেরই বা ? চল্‌তি ভাষায় যাকে মনোহর বলে, এ তো তা নয়। কিন্তু গল্পের বেগে তা'রা মনের সাম্‌নে এসে হাজির হ'চ্ছিলো, শিশুর মন তাদের প্রত্যেককেই স্বীকার ক'রে নিয়ে ব'ল্‌লে, "হাঁ এরা আছে।" এই ব'লে

স্বহস্তে এদের কপালে অস্তিত্ব-গৌরবের টীকা পরিয়ে দিলে। এই দৃশ্যগুলি গল্প-বলার বেষ্টনীর মধ্যে একটি বিশেষ ঐক্য লাভ ক'রেছিলো। বিশ্বের ছাড়া-ছাড়া সমস্ত ছড়ানো তথ্যের অস্পষ্টতা থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে তা'রা সুনির্দ্দিষ্ট হ'য়ে উঠেছিলো। এই জোরে তা'রা কেবলি দাবী ক'র্‌তে লাগ্‌লো, আমাকে দেখো। সুতরাং নন্দিনীর চোখের ঘুম আর টিঁক্‌লো না।

কবি বলো, চিত্রী বলো, আপনার রচনার মধ্যে সে কী চায়? সে বিশেষকে চায়। বাতাসে যে-অঙ্গারবাষ্প সাধারণভাবে আছে, গাছ তাকে আত্মসাৎ ক'রে আপন ডালেপালায় ফলে ফুলে আপন ছন্দে রঙে অত্যন্ত বিশেষ ক'রে যখন তোলে, তখনই তাতে সৃষ্টি-লীলা প্রকাশ পায়। নীহারিকায় জ্যোতির্বাষ্প একটা একাকার ব্যাপার, নক্ষত্র-আকারে বিশেষত্ব লাভ করায় তা'র সার্থকতা। মানুষের সৃষ্টিচেষ্টাও সেইরকম অনির্দ্দিষ্ট সাধারণ থেকে সুনির্দ্দিষ্ট বিশেষকে জাগাবার চেষ্টা। আমাদের মনের মধ্যে নানা হৃদয়াবেগ ঘুরে বেড়ায়। ছন্দে সুরে কথায় যখন সে বিশেষ হ'য়ে ওঠে, তখন সে হয় কাব্য, সে হয় গান। হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করা হ'লো ব'লেই-যে আনন্দ তা নয়। তাকে বিশিষ্টতা দেওয়া হ'লো ব'লেই আনন্দ। সেই বিশিষ্টতার উৎকর্ষেই তা'র উৎকর্ষ। মানুষের যে-কোনো রচনা সেই উৎকর্ষ পেয়েচে, তাকেই আর্ট-সৃষ্টিরূপে দেখি; সেই ঐকান্ত দেখাতেই আনন্দ।

ইংরেজি ভাষায় character শব্দের একটা অর্থ স্বভাব, নৈতিক চরিত্র; আরেকটা অর্থ চরিত্ররূপ। অর্থাৎ এমন কতকগুলি গুণের এমন সমাবেশ যাতে এই সমাবেশটি বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। পূর্ব্বেই ব'লেচি, এইরকম বিশেষ গোচরতাই আর্টের ধর্ম্ম। নাট্যে কাব্যে চিত্রে নৈতিক সদ্‌গুণের চেয়ে এই characterএর মূল্য বেশি।

সৃষ্টির দিকে বিশেষত্ব এই তো আছে character, সৃষ্টি-কর্ত্তার দিকে বিশেষত্ব প্রতিভায়। সেটা হ'চ্চে দৃষ্টির বিশেষত্ব, অনুভূতির বিশেষত্ব, রচনার বিশেষত্ব নিয়ে। ভক্ত সমুদ্র পর্ব্বত অরণ্যে সৃষ্টিকর্ত্তার একটি স্বরূপ দেখ্‌তে পা'ন, তাতেই সেই দৃশ্যগুলি বিশেষভাবে তাঁর অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠে। রূপকারের রচনাতেও তেম্‌নি ক'রেই স্রষ্টাব্যক্তিটি আপন প্রতিভার স্বরূপ দিয়ে আপন সৃষ্টির রূপটিকে দ্রষ্টা ব্যক্তিটির কাছে সুনির্দ্দিষ্ট ক'রে দেয়। তাতে যে-আনন্দ পাই, সে সৌন্দর্য্যের বা স্বার্থবুদ্ধির বা শুভবুদ্ধির আনন্দ নয়, বিশেষকে ব্যক্ত দেখার আনন্দ। আমার ভিতরকার ব্যক্তি সেই পরিব্যক্তিতে নিজেরই বিস্তার দেখে। বস্তুতত্ত্ব (physics) সমস্ত বস্তুর মধ্যে সাধারণ, সেটা হ'লো বিজ্ঞানের; আর চেহারা পদার্থটা বিশেষের, সেটা হ'লো আর্টের। বিশেষের বেড়া ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে বিজ্ঞান যখন ব্যাপককে পায় তখন তা'র সার্থকতা; আর ব্যাপকের পর্দ্দাটা তুলে ধ'রে আর্ট যখন বিশেষকে পায়, তখন সে হয় খুশি।

সুন্দর সেই বিশেষের কোঠায় এসে পড়ে তো ভালো,

নইলে সুন্দর ব'লেই তা'র গুমোর নেই। আর্টের এলেকায় সাহেব-পাড়ার সরকারী বাগানের স্থান নেই, আছে চিৎপুর রোডের। সরকারী বাগানের অনেক সদ্‌গুণ আছে, তাকে সুন্দর ব'ল্‌লে লক্ষণে মেলে; সে-বাগানে সাধারণ উপকার আছে, কিন্তু বিশেষ স্বাদ নেই। চিৎপুরের রোডের স্বাদ আছে, উপকার নেই ব'ল্‌লেই হয়। ক'ল্‌কাতার ইডেন-গার্ডেন ফোটোগ্রাফের অন্ত্যজ পংক্তিতে স্থান পেতে পারে, কিন্তু চিৎপুর রোডের পংক্তি আর্টের অভিজাতবর্গের কোঠায়। কুলীনের মেয়ের মতোই চিৎপুর রোড আর্টিস্‌ট্-এর তুলিতে আপন পর্য্যায় পাবার জন্যে আজ পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে আছে। কোনো কালে না-ও যদি পায়, তবু তা'র কৌলীন্য ঘুচ্‌বে না।

হেড্‌মাষ্টার তাঁর ইস্কুলের সবচেয়ে শিষ্টশান্ত অধ্যয়নরত ভালো ছেলেটির প্রতি তর্জ্জনী নির্দ্দেশ ক'রে তাকে আমাদের দৃষ্টান্তগোচর ক'রে রাখ্‌বার চেষ্টা করেন। কিন্তু তর্জ্জনীর জোরেও আমরা তা'কে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাইনে। যাকে খুবই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সে হেড্‌মাষ্টারের আদর্শ ছেলে নয়, ছাত্রবৃত্তি তা'র কপালে প্রায়ই জোটে না। সেটা ডান্‌পিটে ইস্কুল-পালানো ছেলে, আপন প্রাণপূর্ণ বিশেষত্ব দ্বারা সে খুবই স্ব-প্রকাশ। ব্যবহারের দিক্ থেকে তাকে অবজ্ঞা করা চলে, কিন্তু প্রয়োজন-নিরপেক্ষ প্রকাশের দিক্ থেকে সে-ছেলে সেরা ছেলে। সে হেড্‌মাষ্টারের বর্জ্জনীয়, কিন্তু আর্টিস্‌ট্ বিধাতার বরণীয়। চরিত্রনীতি-বিলাসী ঐতিহাসিক তাঁর

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মরাজ নাম দিয়ে সদ্‌গুণের উচ্চ পীঠের উপর দাঁড় করিয়ে সর্ব্বদা আমাদের চোখের উপর ক'রে রেখেচেন, কিন্তু তবু যুধিষ্ঠির স্পষ্ট ক'রে চোখে পড়েন না; আর চরিত্র-চিত্র-বিলাসী কবি তাঁর ভীমসেনকে নানা অবিবেচনা ও অসংযমের অপবাদে লাঞ্ছিত ক'রেও আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ক'রে তুলেচেন। যারা সত্য কথা ব'ল্‌তে ভয় করে না, তা'রা স্বীকার ক'র্‌বেই যে সর্ব্বগুণের যুধিষ্ঠিরকে ফেলে দোষগুণে-জড়িত ভীমসেনকেই তা'রা ভালোবাসে। তা'র একমাত্র কারণ, ভীমসেন সুস্পষ্ট। শেক্‌স্‌পিয়রের ফল্‌স্‌টাফও স্বাস্থ্যকর দৃষ্টান্ত ব'লে সমাজে আদরণীয় নয়, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ব'লেই সাহিত্যে আদরণীয়। রামচন্দ্রের ভক্তদের আমি ভয় করি; তাই খুব চুপিচুপি ব'ল্‌চি, সাহিত্যে রামের চেয়ে লক্ষ্মণ বড়ো। বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে তিনি নিশ্চয়ই মান্‌বেন যে, রামকে তিনি ভালো বলেন, কিন্তু লক্ষ্মণকে তিনি ভালোবাসেন।

আমরা হাজার প্রমাণ দেখাতে পারি যে, আর্টে আমরা গুণবান্‌কে চাইনে, রূপবান্‌কে চাই। এখানে রূপবান্ ব'ল্‌তে সুন্দরকে ব'ল্‌চিনে। রূপের স্পষ্টতায় যে সুপ্রত্যক্ষ, সেই রূপবান্। শ্রীমন্ত সদাগরের চেয়ে রূপবান্ ভাঁড়ু দত্ত। বিষবৃক্ষে অনেক নামজাদা নায়কনায়িকা আছেন, অনেক সাধু লেখক তাদের চরিত্র বিচার ক'রেচেন, তা'র উপরে আমি আর কিছু ব'ল্‌তে চাইনে; কেবল এইটুকু ব'লে রাখি, বিষ-বৃক্ষে হীরা রূপবান্। হীরা আমাদের ঘুমোতে দেয় না, সে

সুন্দর ব'লে নয়, গুণবান্ ব'লে নয়, রূপবান্ ব'লে ; সাধারণ অস্পষ্টতার মাঝখানে সে বিশেষ ব'লে, সুপ্রত্যক্ষ ব'লে।

এ-কথা মান্‌তে হবে, চ'ল্‌তি ভাষায় যাকে সুন্দর বলে, তাকে নিয়ে কবি কিম্বা রূপকার আপনাদের রচনায় খুব ব্যবহার ক'রে থাকেন। তা'র প্রধান কারণ, সৌন্দর্য্য হ'চ্চে একটা বিশিষ্টতা। জীবনের পথে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে অগণ্য বস্তুর ভিড়কে আমরা পাশ কাটিয়েই যাই। সুন্দর হঠাৎ ব'লে ওঠে, "চেয়ে দেখো।" প্রতিদিন হাজার হাজার জিনিষকে যা না বলি, তাকে তাই বলি ; বলি, "তুমি আছ।" ঐটেই হ'লো আসল কথা। সে-যে নিশ্চিত আছে, এই বার্ত্তাটাই তা'র সৌন্দর্য্য আমার কাছে উপস্থিত ক'র্‌লে। সে-যে সৎ, এইটে একান্ত উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌লুম ব'লেই সে এত আনন্দ দিলে। শিশুর কাছে তা'র খেলার জিনিষ মহার্ঘ্য ব'লেই দামী নয়, সুন্দর ব'লেই প্রিয় নয়। আপন কল্পনা-শক্তি দিয়ে তাকে স্পষ্ট উপলব্ধি করে ব'লেই, ছেঁড়া নেক্‌ড়ায় তৈরি হ'লেও সে তা'র কাছে সত্য, এবং সত্য ব'লেই আনন্দময় ; কারণ সত্যের রসই হ'চ্চে আনন্দ।

এক-রকমের গায়ে-পড়া সৌন্দর্য্য আছে, যা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে অতিলালিত্যগুণে সহজে আমাদের মন ভোলায়। চোর যেমন দ্বারীকে ঘুষ দিয়ে চুরি ক'র্‌তে ঘরে ঢোকে। সেইজন্যে যে-আর্ট্ আভিজাত্যের গৌরব করে, সে-আর্ট্ এই সৌন্দর্য্যকে আমল দিতেই চায় না। এক-জাতের বাইজি-মহলে চলিত খেলো সঙ্গীত তা'র হাল্‌কা

চালের সুর-তালের উত্তেজনায় সাধারণ লোকের মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। বড়ো ওস্তাদেরা এই নেশা-ধরানো কান-ভোলানো ফাঁকিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করেন। তাতে তাঁরা সাধারণ লোকের সস্তা বক্‌শিষ থেকে বঞ্চিত হওয়াকেই পুরস্কার ব'লে মেনে নেন। তাঁরা যে-বিশিষ্টতাকে আর্টের সম্পদ্ ব'লে জানেন, সে-বিশিষ্টতা প্রলোভন-নিরপেক্ষ উৎকর্ষ। তাকে দেখাতে গেলে যেমন সাধনা, তাকে পেতে গেলেও তেম্‌নি সাধনা চাই। এইজন্যেই তা'র মূল্য। নিরলঙ্কার হ'তে তা'র ভয় নেই। সরলতার অভাবকে আড়ম্বরকে সে ইতর ব'লে ঘৃণা করে। সুললিত ব'লে নিজের পরিচয় দিতে সে লজ্জা বোধ করে, সুসঙ্গত ব'লেই তা'র গৌরব।

গীতায় আছে, কর্ম্মের বিশুদ্ধ মুক্তরূপ হ'চ্চে তা'র নিষ্কাম-রূপ। অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা নয়, বৈরাগ্যের দ্বারাই কর্ম্মের বন্ধন চ'লে যায়। তেম্‌নি ভোগেরও বিশুদ্ধরূপ আছে, সেই রূপটি পেতে গেলে বৈরাগ্য চাই। ব'ল্‌তে হয়, "মা গৃধঃ," লোভ কোরো না। সৌন্দর্য্যভোগ মনকে জাগাবে, এইটেই তা'র স্বধর্ম্ম ; তা না ক'রে মনকে যখন সে ভোলাতে বসে, তখন সে আপনার জাত খোয়ায়, তখন সে হ'য়ে যায় নীচ। উচ্চ-অঙ্গের আর্ট্ এই নীচতা থেকে বহু যত্নে আপনাকে বাঁচাতে চায়। লোভীর ভিড় তাড়াবার জন্যে সে অনেক সময়ে কঠোরকে দ্বারের কাছে বসিয়ে রাখে, এমন কি, অনেক সময় কিছু বিশ্রী, কিছু বেসুর তা'র রচনার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। কেননা, তা'র সাহস আছে। সে জানে,

যে-বিশিষ্টতা আর্টের প্রাণ, তা'র সঙ্গে গায়ে প'ড়ে মিষ্টি মিশোল করবার কোনো দরকার নেই। উমার হৃদয় পাবার জন্যে শিবকে কন্দর্প সাজ্‌তে হয়নি।

বিশেষকে দেখ্‌বার আর-একটা কৌশল আছে, সে হ'চ্চে নূতনত্ব। অতিপরিচয়ের আবরণে বিশেষ ঢাকা পড়ে, এই-জন্যে অনভ্যস্তকেই বিশেষ ব'লে খাড়া কর্‌বার দিকে দুর্ব্বল আর্টিস্‌ট্‌-এর প্রলোভন আস্‌তে পারে। এই প্রলোভন আর্টিস্‌ট্‌-এর তপোভঙ্গের কারণ। অতিপরিচয়ের ম্লানতার মধ্যেই চির-বিশেষের উজ্জ্বলরূপ দেখাতে পারে যে-গুণী, সেই তো গুণী। যেখানটা সর্ব্বদা আমাদের চোখে পড়ে অথচ দেখ্‌তে পাইনে, সেইখানেই দেখ্‌বার জিনিষকে দেখানো হ'চ্চে আর্টিস্‌ট্‌-এর কাজ। সেইজন্যেই তো বড়ো বড়ো আর্টিস্‌ট্‌-এর রচনার বিষয় চিরকালের জিনিষ। আর্ট পুরাতনকে বারে বারে নূতন করে। বিশেষকে সে দেখ্‌তে পায় হাতের কাছে, ঘরের কাছে। সৃষ্টি তো খনির জিনিষ নয়, যে, খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে তা'র পুঁজি ফুরিয়ে যাবে। সে-যে ঝর্‌না; তা'র প্রাচীন ধারা-যে চিরদিনই নবীন হ'য়ে বইচে, এইটে প্রমাণ কর্‌বার জন্যে তাকে কোনো অদ্ভুত ভঙ্গী ক'র্‌তে হয় না। অশোকের মঞ্জরী কালিদাসের আমলেও যে-রঙে বসন্তের শ্যামল বক্ষ রাঙিয়ে দিয়েচে, আজও নূতনত্বের ভাণ ক'রে সেই রঙ্‌ বদল কর্‌বার তা'র দরকার হয়নি। নির্ভয়ে সে বর্ষে বর্ষে পুরাতনের বাসর-ঘরেই নবীনের ঘোমটা খুলে দিচ্চে। বারে বারেই চোখের উপর থেকে জড়তার মোহ কেটে যাচ্চে,

আর চির-বিশেষকে দেখ্‌তে পাচ্চি। কিন্তু ইঁটের ঢেলার চেয়ে অশোকমঞ্জরীকেই বিশেষ ক'রে দেখি কেন, এইটেই দাঁড়ায় প্রশ্ন। এর উত্তর এই যে, আপন অংশ-প্রত্যংশের সমাবেশ নিয়ে অশোক আপনার মধ্যে একটি সুসঙ্গত বিশেষ ঐক্যকে প্রকাশ করে ব'লেই, তা'র মধ্যে আমাদের মন একটি পূরো দেখাকে দেখে। ইঁটের ঢেলায় আমাদের কাছে সত্তার সেই চরমতা নেই। একটা স্‌টীম্‌ ইঞ্জিনের মধ্যে প্রয়োজন-ঘটিত সুষমার ঐক্য আছে। কিন্তু সেই ঐক্য প্রয়োজনেরই অনুগত। সে নিজেকেই চরম ব'লে প্রকাশ করে না। আর-কিছুকে প্রকাশ করে। সেই ইঞ্জিনের মধ্যে ব্যবহারের আনন্দ, তা'র মধ্যে কৌতূহলের বিষয় থাক্‌তে পারে। কিন্তু তাতে বিশুদ্ধ দেখার অহৈতুক বিষয় নেই।

সত্তাকে সকলের চেয়ে অব্যবহিত ক'রে অনুভব করি নিজের মধ্যে। আমার মধ্যে একটি এক নিয়ত ব'ল্‌চে, "আছি"। গানের মধ্যে ছবির মধ্যে এক যদি তেম্‌নি জোরে ব'লে উঠ্‌তে পারে, "এই-যে আমি," তা হ'লেই তাতে-আমাতে মিলনের সুর পূর্ণ হ'য়ে বাজ্‌লো। এ'কেই বলে শুভদৃষ্টি; ঐক্যের উপলব্ধিতে দেখ্‌বার বিষয় চোখে-পড়া।

আর্টিস্‌ট্‌ প্রশ্ন ক'র্‌চে, আর্টের সাধনা কী। আমি বলি, "দেখো", তবেই দেখাতে পার্‌বে। সত্তার প্রবাহিনী ঝ'রে প'ড়্‌চে; তা'রই স্রোতের জলে মনের অভিষেক হোক; ছোটো বড়ো সুন্দর অসুন্দর সব নিয়ে তা'র নৃত্য। সেই প্রকাশ-

ধারার বেগ চিত্তকে স্পর্শ ক'র্‌লে চিত্তের মধ্যেও প্রকাশের বেগ প্রবল হ'য়ে ওঠে। সৃষ্টির লীলা চারদিকেই আছে, এই সহজ সত্যটি যদি আর্টিস্‌ট্‌ আজও আবিষ্কার ক'র্‌তে না পেরে থাকে, পুরাণ-কাহিনীর পুঁথির মধ্যে প্রাচীন রাজপুতানার পটের মধ্যে যদি সে দেখার জিনিষ খুঁজে বেড়ায়, তা হ'লে বুঝ্‌বো, কলা-সরস্বতীর পদ্মাসন তা'র মনের মধ্যে বিকশিত হয়নি। তাই সে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড্‌ আসবাবের দোকানে নির্জ্জীব কাঠের চৌকি খুঁজ্‌তে বেরিয়েচে।

ক্রাকোভিয়া
১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫।

ফুলের মধ্যে যে-আনন্দ সে প্রধানত ফলের প্রত্যাশার আনন্দ, এটা অত্যন্ত মোটা কথা। বিশ্বসৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাই সৃষ্টিতেই আনন্দ, হওয়াটাই চরম কথা। তা'র ফুলেও আছে হওয়া, ফলেও আছে হওয়া। ফুলটা হ'লো উপায় আর ফলটা হ'লো উদ্দেশ্য, তাই ব'লে উভয়ের মধ্যে মূল্যের কোনো ভেদ দেখ্‌তে পাইনে।

আমার তিনবছরের প্রিয়সখী, যাকে নাম দিয়েচি নন্দিনী, তা'র হওয়ার উদ্দেশ্য কী, এ প্রশ্নের কোনো জবাব-তলবের কথা মনে আসে না। সে-যে কুলরক্ষার সেতু, সে-যে পিণ্ড-জোগানের হেতু, সে-যে কোনো এক ভাবী-কালে প্রজনার্থং মহাভাগা, এসব হ'লো শাস্ত্রসঙ্গত বিজ্ঞানসম্মত মূল্যের কথা।

ফলের দরে ফুলের বিচার ব্যবসাদারের। কিন্তু ভগবান্ তো সৃষ্টির ব্যবসা ফাঁদেননি। তাঁর সৃষ্টি একেবারেই বাজে খরচ ;—অর্থাৎ আয় করবার জন্যে খরচ করা নয়, এইজন্যই আয়োজনে প্রয়োজনে সমান হ'য়ে মিশে গেচে। এইজন্য যে-শিশু জীবলোকের প্রয়োজনসাধনের পক্ষে অপূর্ণ, সেই তিনবছরের শিশুর অপূর্ণতাই সৃষ্টির আনন্দ-গৌরবে পূর্ণ। আমি তো দেখি বিশ্ব-রচনায় মুখ্যের চেয়ে গৌণটাই বড়ো। ফুলের রঙের মুখ্য কথাটা হ'তে পারে পতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ;—গৌণ কথাটা হ'চ্চে সৌন্দর্য্য। মানুষ যখন ফুলের বাগান করে, তখন সেই গৌণের সম্পদ্ই সে খোঁজে। বস্তুত গৌণ নিয়েই মানুষের সভ্যতা। মানুষ কবি যখন প্রেয়সীর মুখের একটি তিলের জন্য সমরখন্দ, বোখারা পণ ক'র্তে বসে, তখন সে "প্রজনার্থং মহাভাগা"র কথা মনেই রাখে না। এই বে-হিসাবী সৃষ্টিতে বে-হিসাবী আনন্দ-রূপকেই সে সৃষ্টির ঐশ্বর্য্য ব'লে জানে।

প্রাণীসংসারে জৈব-প্রকৃতিই সকলের গোড়ায় আপন ভিৎ ফেঁদে, জাজিম পেতে, আলো জ্বেলে, পৃথীর ভাণ্ডার থেকে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র, মাল্-মস্‌লা নিজের ব্যবহারের জন্যে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে সংসার পেতে বসেছিলো। ভোরের বেলায় সে মুখ্য জায়গাটা দখল ক'রে ব'স্‌লো। তারি বচন হ'চ্চে, সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী। অর্থাৎ যদি কাজে লাগ্‌লো তবেই তা'র দাম।

চিৎ-প্রকৃতি এসে জুট্‌লেন কিছু দেরিতে। তাই জৈব-

প্রকৃতির আশ্রয়ে তাঁকে পরাভূত হ'তে হ'লো। পুরানো পথে পুরানো ঘাটে পুরানো কালের মাল-মস্‌লা নিয়েই সে ফাঁদ্‌লে তা'র নিজের ব্যবসা। তখন সে সাবেক আমলের মুখ্য থেকে হাল আমলের গৌণ ফলিয়ে তুল্‌তে ব'স্‌লো। আহারকে ক'রে তুল্‌লে ভোজ, শব্দকে ক'রে তুল্‌লে বাণী, কান্নাকে ক'রে তুল্‌লে কাব্য। মুখ্যভাবে যেটা ছিলো আঘাত, গৌণভাবে সেটা হ'লো আবেদন; যেটা ছিলো বন্দিনীর শৃঙ্খল, সেটা হ'লো বধূর কঙ্কণ; যেটা ছিলো ভয়, সেটা হ'লো ভক্তি; যেটা ছিলো দাসত্ব, সেটা হ'লো আত্ম-নিবেদন। যারা উপরের স্তরের চেয়ে নীচের স্তরকে বিশ্বাস করে বেশি, তা'রা মাটি খোঁড়াখুঁড়ি ক'র্‌তে গেলেই পুরাতন তাম্রশাসন বেরিয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিকের চশ্‌মায় ধরা পড়ে যে, ক্ষেতের মালিক জৈব-প্রকৃতি, অতএব ফসলের অধিকার নির্ণয় কর্‌তে গেলে বৈজ্ঞানিকের কাছে চিৎপ্রকৃতির দাবী অগ্রাহ্য হ'য়ে আসে। আপিলে সে যতই বলে প্রণালী আমার, প্ল্যান আমার, হাল-লাঙল আমার, চাষ আমার, কিছুতেই অপ্রমাণ ক'র্‌তে পারে না যে, মাটির তলাকার তাম্রশাসনে মোটা অক্ষরে খোদা আছে, জৈব-প্রকৃতি। মোটা অক্ষরের উপরে বিচারকের নজরও পড়ে বেশি। কাজেই রায় যখন বেরায়, তখন পাকা প্রমাণসহ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে যে, সাবেক আমলের ভূতই বর্ত্তমান আমলে ভগবান্‌ সেজে এসেচে।

জৈব প্রকৃতিতে শিশুর একটা অর্থ আছে। সেই অর্থ টাকেই যদি সম্পূর্ণ ব'লে স্বীকার ক'রে নিই, তা হ'লে

ব'ল্‌তে হয় মাছের ছানার সঙ্গে মানুষের শিশুর কোনো প্রভেদ নেই। অর্থাৎ তা'র একমাত্র অর্থ বংশবৃদ্ধি।

কিন্তু চিৎপ্রকৃতি সেই অর্থটাকে নিয়ে যখন আপনার চিন্ময় জিনিষ ক'রে তুল্‌লে, তখন তাকে চোর বদ্‌নাম দিয়ে মূলকেই মালেক স্বীকার করি যদি, তা হ'লে সেক্‌স্‌পিয়ারেরও মাল থানায় আটক ক'র্‌তে হয়। মস্‌লা আর মাল তো একই জিনিষ নয়; মাটির মালেক যদি হয় ভূপতি, ভাঁড়ের মালেক ত কুমোর।

আমাদের চিত্ত শিশুর মধ্যে সৃষ্টির অহৈতুক আনন্দটি দেখ্‌তে পায়। বয়স্ক মানুষের মধ্যে উদ্দেশ্য-উপায়-ঘটিত নানা তর্ক আছে; কেউবা কাজের কেউবা অকাজের; কারো বা অর্থ আছে, কারো বা নেই। কিন্তু শিশুকে যখন দেখি, তখন কোনো প্রত্যাশার দ্বারা আচ্ছন্ন ক'রে দেখিনে। সে-যে আছে এই সত্যটাই বিশুদ্ধভাবে আমাদের মনকে টানে। সেই অপরিণত মানুষটির মধ্যে একটি পূর্ণতার ছবি দেখা দেয়। শিশুর মধ্যে মানুষের প্রাণময় রূপটি স্বচ্ছ অনাবিল আকাশে সুপ্রত্যক্ষ। নানা কৃত্রিম সংস্কারের ষড়যন্ত্রে তা'র সহজ আত্ম-প্রকাশে একটুও দ্বিধা ঘটিয়ে দেয় না। প্রাণের বেগে নন্দিনী যে-রকম সহজে নেচেকুঁদে গোলমাল ক'রে বেড়ায়, আমি যদি তা কর্‌তে যাই তা হ'লে যে-প্রভূত সংস্কারের পরিমণ্ডল আমাকে নিবিড় ক'রে ঘিরে আছে সে-সুদ্ধ নড়্‌চড়্‌ ক'র্‌তে থাকে, সেটা একটা অসঙ্গত ব্যাপার হ'য়ে ওঠে। শিশু যা-তা নিয়ে যেমন-তেমন ক'রে খেলে, তাতেই

খেলার বিশুদ্ধ রূপটি দেখি। খেলার উপকরণের কৃত্রিম মূল্য, খেলার লক্ষ্যের কৃত্রিম উত্তেজনা তা'র সঙ্গে জড়িয়ে থাকে না। নন্দিনী যখন লুব্ধভাবে কমলালেবু খায়, তখন সেই অসঙ্কোচ লোভটিকে সুন্দর ঠেকে। সহজ প্রাণের রসবোধের সঙ্গে কমলালেবুর যে-মধুর সম্বন্ধ, ভদ্রতার কোনো বিধানের দ্বারা সেটা ক্ষুণ্ণ হয়নি। ঝগ্ড়ু-বেহারাটার প্রতি নন্দিনীর যে বন্ধুত্বের টান সেটা দেখ্‌তে ভালো লাগে, কেননা যে-কোনো দুই মানুষের মধ্যে এই সম্বন্ধটি সত্য হওয়ার কোনো বাধা থাকা উচিত না; কিন্তু সামাজিক ভেদ-বুদ্ধির নানা অভ্যস্ত সংস্কারকে যেম্‌নি আমি স্বীকার করেচি অম্‌নি ঝগ্ড়ু-বেহারার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়েচে, অথচ এমন ভদ্রবেশধারীকে আমি সমকক্ষভাবে অনায়াসে গ্রহণ ক'র্‌তে পারি যার মনুষ্যত্বের আন্তরিক মূল্য ঝগ্ড়ুর চেয়ে অনেক কম। জাহাজে তা'র সমবয়স্ক য়ুরোপীয় বালিকার সঙ্গে নন্দিনীর ঝগ্ড়াও হয়, ভাবও হয়, পরস্পরের মধ্যে সম্পত্তির বিনিময়ও চ'ল্‌চে। য়ুরোপীয় পুরুষযাত্রীর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার মাথা নাড়ানাড়ি হ'য়ে থাকে, শরীরের স্বাস্থ্য ও আব্‌হাওয়া নিয়ে বাজে কথা বলাবলিও হয়; সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে তা'র বেশি আর সহজে এগোতে পারিনে। সহজ মানুষের সত্যটি সামাজিক মানুষের কুয়াসায় ঢেকে রেখে দেয়। অর্থাৎ আমরা নানা অবান্তর তথ্যের অস্বচ্ছতার মধ্যে বাস করি। শিশুর জীবনের যে-সত্য, তা'র সঙ্গে অবান্তরের মিশোল নেই। তাই তা'র দিকে যখন চেয়ে

দেখ্‌বার অবকাশ পাই, তখন প্রাণলীলার প্রত্যক্ষ স্বরূপটি দেখি, তাতে সংস্কারভারে পীড়িত চিন্তাক্লিষ্ট মন গভীর তৃপ্তি পায়।

শিশুর মধ্যে আমরা মুক্তির সহজ ছবি দেখ্‌তে পাই। মুক্তি ব'ল্‌তে কী বোঝায়? প্রকাশের পূর্ণতা। ভগবান্‌-সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর-ছলে ঋষি একটি চরম কথা বলেচেন; স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি? স্বে মহিম্নি। সেই ভগবান্ কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত? তা'র উত্তর, নিজের মহিমাতেই। অর্থাৎ তিনি স্ব-প্রকাশ। শিশুরও সেই কথা। সে আপনাতে আপনি পরিব্যক্ত। তাকে দেখে আমাদের যে-আনন্দ সে তা'র বাধামুক্ত সহজ প্রকাশে। য়ুরোপে আজকাল চিত্র-কলার ইতিহাসে একটা বিপ্লব এসেচে দেখ্‌তে পাই। এতকাল ধ'রে এই ছবি-আঁকার চারদিকে হিন্দুস্থানী গানের তানকর্ত্তব্যের মতো—যে-সমস্ত প্রভূত ওস্তাদী জ'মে উঠ্‌ছিলো, আজ সকলে বুঝেচে তা'র বারো-আনাই অবান্তর। তা সুঠাম হ'তে পারে, কোনো-না-কোনো কারণে মনোহর হ'তেও পারে, তা'র আড়ম্বর-বাহুল্যে বিশেষ-একটা শক্তি-সম্পদ্‌ও প্রকাশ ক'র্‌তে পারে; অর্থাৎ ঝড়ের মেঘের মতো তা'র আশ্চর্য্য রঙের ঘটা থাক্‌তে পারে, কিন্তু আসল যে-জিনিষটি প'ড়েচে ঢাকা, সে হ'চ্চে সরল সত্যের সূর্য্য, যাকে স্বচ্ছ আকাশে তা'র আপন নির্ম্মল মহিমায় দেখে বিশ্ব আনন্দিত হয়।

গান বলো চিত্র বলো কাব্য বলো ওস্তাদী প্রথমে নম্র-

শিরে—মোগল দর্‌বারে ঈস্‌ট্‌ ইণ্ডিয়া কম্পানির মতো—তাদের পিছনে থাকে। কিন্তু যেহেতু প্রভুর চেয়ে সেবকের পাগ্‌ড়ির রং কড়া, তা'র তক্‌মার চোখ-ধাঁধানি বেশি, এই কারণে তা'রা ভিড়ের উৎসাহ যতই পায়, ততই পিছন ছেড়ে সাম্‌নে এসে জ'মে যায়। যথার্থ আর্ট্‌ তখন হার মানে, তা'র স্বাধীনতা চ'লে যায়। যথার্থ আর্টের মধ্যে সহজ প্রাণ আছে ব'লেই তা'র বৃদ্ধি আছে, গতি আছে; কিন্তু যে-হেতু কারুনৈপুণ্যটা অলঙ্কার, যেহেতু তাতে প্রাণের ধর্ম্ম নেই, তাই তাকে প্রবল হ'তে দিলেই আভরণ হ'য়ে ওঠে শৃঙ্খল, তখন সে আর্টের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বন্ধ ক'রে দেয়, তা'র গতি রোধ করে। তখন যেটা বাহাদুরি ক'র্‌তে থাকে সেটা আত্মিক নয়, সেটা বৈষয়িক; অর্থাৎ তা'র মধ্যে প্রাণগত বৃদ্ধি নেই, বস্তুগত সঞ্চয় আছে। তাই আমাদের হিন্দুস্থানী গানে বৃদ্ধি দেখ্‌তে পাইনে। তানসেন প্রভৃতির অক্ষয় কমণ্ডলু থেকে যে-ধারা প্রবাহিত হয়েছিলো, ওস্তাদ প্রভৃতি জহ্নুমুনি কারদানি দিয়ে সেটি গিলে খেয়ে ব'সে আছে। মোট কথা, সত্যের রসরূপটি সুন্দর ও সরল ক'রে প্রকাশ করা যে-কলাবিদ্যার কাজ অবান্তরের জঞ্জাল তা'র সবচেয়ে শত্রু। মহারণ্যের শ্বাস-রুদ্ধ ক'রে দেয় মহাজঙ্গল।

আধুনিক কলারসজ্ঞ ব'ল্‌চেন, আদিকালের মানুষ তা'র অশিক্ষিত-পটুত্বে বিরলরেখায় যে-রকম সাদাসিধে ছবি আঁক্‌তো, ছবির সেই গোড়াকার ছাঁদের মধ্যে ফিরে না গেলে এই অবান্তরভার-পীড়িত আর্টের উদ্ধার নেই। মানুষ

বারবার শিশু হ'য়ে জন্মায় ব'লেই সত্যের সংস্কার-বর্জ্জিত সরলরূপের আদর্শ চিরন্তন হ'য়ে আছে, আর্টকেও তেম্‌নি শিশু-জন্ম নিয়ে অতি-অলঙ্কারের বন্ধনপাশ থেকে বারে বারে মুক্তি পেতে হবে।

এই অবান্তর-বর্জ্জন কি শুধু আর্টেরই পরিত্রাণ? আজকের দিনের ভারজর্জ্জর সভ্যতারও এই পথে মুক্তি। মুক্তি-যে সংগ্রহের বাহুল্যে নয়, ভোগের প্রাচুর্য্যে নয়, মুক্তি-যে আত্ম-প্রকাশের সত্যতায়, আজকের দিনে এই কথাই মানুষকে বারবার স্মরণ করাতে হবে। কেননা আজ মানুষ যে-রকম বন্ধনজালে জড়িত, এমন কোনো দিনই ছিলো না।

লোভ-মোহের বন্ধন থেকে মানুষ কবেই বা মুক্ত ছিলো? কিন্তু তা'র সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির সাধনা ছিলো সজাগ। বৈষয়িকতার বেড়ায় তখন ফাঁক ছিলো, সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে সত্যের আলো আস্‌তো ব'লে সেই আলোর প্রতি কোনো দিন বিশ্বাস যায়নি। আজ জটিল অবান্তরকে অতিক্রম ক'রে সরল চিরন্তনকে অন্তরের সঙ্গে স্বীকার কর্‌বার সাহস মানুষের চ'লে গেঁচে।

আজ কত পণ্ডিত তথ্যের গভীর অন্ধকূপে ঢুকে টুক্‌রো-টুক্‌রো সংবাদের কণা খুঁটে খুঁটে জমাচ্চেন। য়ুরোপে যখন বিদ্বেষের কলুষে আকাশ আবিল, তখন এই সকল পণ্ডিতদেরও মন দেখি বিষাক্ত। সত্য-সাধনার যে-উদার বৈরাগ্য ক্ষুদ্রতা থেকে ভেদবুদ্ধি থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, তাঁরা তা'র আহ্বান শুন্‌তে পান্‌নি। তা'র প্রধান

কারণ, জ্ঞানসাধনায় উপরের দিকে খাড়া হ'য়ে মানুষের যে-মাথা একদিন বিশ্ব-দেখা দেখ্‌তো আজ সেই মাথা নীচে ঝুঁকে প'ড়ে দিনরাত টুক্‌রো-দেখা দেখ্‌চে।

ভারতের মধ্যযুগে যখন কবীর দাদু প্রভৃতি সাধুদের আবির্ভাব হ'য়েছিলো, তখন ভারতের সুখের দিন না। তখন রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙাগড়ায় দেশের অবস্থার কেবলি উলট্‌পালট্‌ চ'ল্‌ছিলো। তখন শুধু অর্থবিরোধ নয়, ধর্ম্মবিরোধের তীব্রতাও খুব প্রবল। যখন অন্তরে বাহিরে নানা বেদনা, সেই অস্থিরতার কালে স্বভাবত মানুষের মন ছোটো হয়, তখন রিপুর সংঘাতে রিপু জেগে ওঠে। তখন বর্ত্তমানের ছায়াটাই কালো হ'য়ে নিত্যকালের আলো আচ্ছন্ন করে, কাছের কান্নাই বিশ্বের সকল বাণী ছাপিয়ে কানে বাজে। কিন্তু সেই বড়ো কৃপণ সময়েই তাঁরা মানুষের ভেদের চেয়ে ঐক্যকে সত্য ক'রে দেখেছিলেন। কেননা, তাঁরা সকলেই ছিলেন কবি, কেউ পণ্ডিত ছিলেন না। শব্দের জালে তাঁদের মন জড়িয়ে যায়নি, তথ্যের খুঁটিনাটির মধ্যে উঞ্ছবৃত্তি ক'র্‌তে তাঁরা বিরত ছিলেন। তাই হিন্দু-মুসলমানের অতি-প্রত্যক্ষ বিরোধ ও বিদ্বেষ-বুদ্ধির মধ্যে থেকেও তাদের মনুষ্যত্বের অন্তরে একের আবির্ভাব তাঁরা বিনাবাধায় স্পষ্ট ক'রে দেখেছিলেন। সেই দেখাতেই দেখার মুক্তি।

এর থেকেই বুঝ্‌তে পারি, তখনো মানুষ শিশুর নবজন্ম নিয়ে সত্যের মুক্তিরাজ্যে সহজে সঞ্চরণ করবার অবকাশ ও অধিকার হারায়নি। এইজন্যেই আকবরের মতো

সম্রাটের আবির্ভাব তখন সম্ভবপর হ'য়েছিলো, এইজন্যেই যখন ভ্রাতৃরক্ত-পঙ্কিল পথে অওরংজেব গোঁড়ামির কঠোর শাসন বিস্তার ক'রেছিলেন, তখন তাঁরই ভাই দারাশিকো সংস্কার-বর্জ্জিত অসাম্প্রদায়িক সত্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রেছিলেন। তখন বড়ো দুঃখের দিনেও মানুষের পথ ছিলো সহজ। আজ সে-পথ বড়ো দুর্গম। এখনকার দিনে প্রবীণেরা পথের প্রত্যেক কাঁকর গুণে বাধারই হিসাবকে প্রকাণ্ড ক'রে তোলে ;—মৃত্যুঞ্জয় মানবাত্মার অপরাহত শক্তিকে তা'রা উপস্থিতের ছোটো ছোটো বিরুদ্ধ সাক্ষ্যের জোরে অবজ্ঞা করে। তাই তা'রা এত কৃপণ, এত সন্দিগ্ধ, এত নিষ্ঠুর, এত আত্মম্ভরি। বিশ্বাস যার নেই, সে কখনো সৃষ্টি ক'র্‌তে পারে না, সে কেবল সংগ্রহ ক'র্‌তে পারে, অবশেষে এই সংগ্রহ নিয়েই যত মারামারি কাটাকাটি।

আজকের এই বিশ্বাসহীন আনন্দহীন অন্ধযুগ কবির বাণীকে প্রার্থনা ক'র্‌চে, এই কথা শোনাবার জন্যে যে, আত্মম্ভরিতায় বন্ধন, আত্মপ্রকাশেই মুক্তি ; আত্মম্ভরিতায় জড় বস্তুরাশির জটিলতা, আত্মপ্রকাশে বিরলভূষণ সত্যের সরলরূপ।

১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫ ;
ক্রাকোভিয়া।

হারুনা-মারু জাহাজ থেকে নেমে প্যারিসে কয়েক দিন মাত্র ভূমিমাতার শুশ্রূষা ভোগ ক'র্‌তে পেরেছিলাম। হঠাৎ

খবর এলো, যথাসময়ে পেরুতে পৌঁছ'তে হ'লে অবিলম্বে জাহাজ ধরা চাই। তাড়াতাড়ি শের্‌বুর্গ-বন্দর থেকে আণ্ডেস্‌ জাহাজে উঠে প'ড়্‌লুম। লম্বায়-চওড়ায় জাহাজটা খুব মস্ত, কিন্তু আমার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় আরামের পক্ষে যে-সব সুবিধার প্রয়োজন ছিলো, তা পাওয়া গেলো না। জাপানী জাহাজে আতিথ্যের প্রচুর দাক্ষিণ্যে আমার অভ্যাসটাও কিছু খারাপ ক'রে দিয়েছিলো। সেইজন্যে এখানে ক্যাবিনে প্রবেশ ক'রেই মনটা অপ্রসন্ন হ'লো। কিন্তু যেটা অনিবার্য্য, নিজের গরজেই মন তা'র সঙ্গে যত শীঘ্র পারে রফা ক'রে নিতে চায়। অত্যন্ত দুষ্পাচ্য জিনিষও পেটে প'ড়্‌লে পাকযন্ত্র হাল ছেড়ে দিয়ে জারক-রস প্রয়োগ বন্ধ করে না। মনেরও জারক-রস আছে, অনভ্যস্ত কোনো দুঃখকে হজম ক'রে নিয়ে তাকে সে আপনার অভ্যস্ত বিশ্বের সামিল ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। অসুবিধাগুলো এক-রকম সহ্য হ'য়ে এলো, আর দিনের-পর-দিন চর্‌কার একঘেয়ে সুতো কাটার মতো একটানে চল্‌তে লাগ্‌লো।

বিষুবরেখা পার হ'য়ে চ'লেচি, এমন সময় হঠাৎ কখন্‌ শরীর গেলো বিগ্‌ড়ে, বিছানা ছাড়া গতি রইলো না। ক্যাবিন জিনিষটাই একটা স্থায়ী ব্যাধি, ইন্দ্রিয়গুলো যদি তা'র সঙ্গে যোগ দিয়ে জুলুম সুরু করে, তা হ'লে পুলিশের আকস্মিক বন্ধনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে পর্য্যন্ত আপিল বন্ধ হয়, কোথাও কিছুই সান্ত্বনা থাকে না। শান্তিহীন দিন আর নিদ্রাহীন রাত আমাকে পিঠমোড়া ক'রে শিকল ক'ষ্‌তে

লাগ্‌লো। বিদ্রোহের চেষ্টা ক'র্‌তে গেলে শাসনের পরিমাণ বাড়্‌তেই থাকে। রোগ-গারদের দারোগা আমার বুকের উপর দুর্ব্বলতার বিষম একটা বোঝা চাপিয়ে রেখে দিলে—মাঝে মাঝে মনে হ'তো, এটা স্বয়ং যমরাজের পায়ের চাপ। দুঃখের অত্যাচার যখন অতিমাত্রায় চ'ড়ে ওঠে, তখন তাকে পরাভূত ক'র্‌তে পারিনে; কিন্তু তাকে অবজ্ঞা কর্‌বার অধিকার তো কেউ কাড়্‌তে পারে না—আমার হাতে তা'র একটা উপায় আছে, সে হ'চ্চে কবিতা-লেখা। তা'র বিষয়টা যাই হোক্‌ না কেন, লেখাটাই দুঃখের বিরুদ্ধে সিডিশন-বিশেষ। সিডিশনের দ্বারা প্রতাপশালীর বিশেষ অনিষ্ট হয় না, তাতে পীড়িত চিত্তের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা হয়।

আমি সেই কাজে লাগ্‌লুম, বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে কবিতা লেখা চ'ল্‌লো। ব্যাধিটা-যে ঠিক্‌ কী, তা নিশ্চিত ব'ল্‌তে পারিনে, কেবল এই জানি, সে একটা অনির্ব্বচনীয় পীড়া। সে-পীড়া শুধু আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নয়, ক্যাবিনের সমস্ত আস্‌বাব-পত্রের মধ্যে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত—আমি আর আমার ক্যাবিন সমস্তটা মিলে যেন একটা অখণ্ড-রুগ্নতা।

এমনতর অসুখের সময় স্বভাবতই দেশের জন্যে ব্যাকুলতা জন্মে। ক্যাবিনের জঠরের মধ্যে দিবারাত্রি জীর্ণ হ'তে হ'তে আমারও মন ভারতবর্ষের আকাশের উদ্দেশে উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু অন্ধ উত্তাপের পরিমাণ বেড়ে বেড়ে ক্রমে যেমন তা আলোকিত হয়, দুঃখেরও তেম্‌নি পরিমাণ-ভেদে প্রকাশভেদ হ'য়ে থাকে। যে-দুঃখ প্রথমে কারাগারের

মতো বিশ্ব থেকে পৃথক ক'রে মনকে কেবলমাত্র নিজের ব্যথার মধ্যেই বদ্ধ করে, সেই-দুঃখেরই বেগ বাড়্তে বাড়্তে অবশেষে অবরোধ ভেঙে পড়ে এবং বিশ্বের দুঃখ-সমুদ্রের কোটালের বানকে অন্তরে প্রবেশ কর্বার পথ ছেড়ে দেয়। তখন নিজের ক্ষণিক ছোটো দুঃখটা মানুষের চিরকালীন বড়ো দুঃখের সাম্‌নে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ায়, তা'র ছট্‌ফটানি চ'লে যায়। তখন দুঃখের দণ্ডটা একটা দীপ্ত আনন্দের মশাল হ'য়ে জ্ব'লে ওঠে। প্রলয়কে ভয় যেই না-করা যায়, অম্‌নি দুঃখ-বীণার সুর বাঁধা সাঙ্গ হয়। গোড়ায় ঐ সুর-বাঁধ্‌বার সময়টাই হ'চ্চে বড়ো কর্কশ, কেননা তখনো-যে দ্বন্দ্ব ঘোচেনি। এই অভিজ্ঞতার সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের অবস্থা কল্পনা ক'র্‌তে পারি। বোধ হয়, প্রথম অবস্থায় ভয়ে ভরসায় যতক্ষণ টানাটানি চ'ল্‌তে থাকে, ততক্ষণ ভারি কষ্ট। যতক্ষণ ভীষণকেই একমাত্র ক'রে দেখিনে, যতক্ষণ তাকে অতিক্রম ক'রেও জীবনের চিরপরিচিত ক্ষেত্রটা দেখা যায়, ততক্ষণ সেই দ্বন্দ্বের টানে ভয় কিছুতেই ছাড়্‌তে চায় না। অবশেষে তাপের তীব্রতা বাড়্‌তে বাড়্‌তে রুদ্র যখন অদ্বিতীয় হ'য়ে দেখা দেন, প্রলয়ের গর্জ্জন তখন সঙ্গীত হ'য়ে ওঠে—তখন তা'র সঙ্গে নির্ব্বিচারে সম্পূর্ণভাবে যোগ দেবার নিরতিশয় আগ্রহে মরীয়া ক'রে তোলে। মৃত্যুকে তখন সত্য ব'লে জেনে গ্রহণ করি, তা'র একটা পূর্ণাত্মক রূপ দেখ্‌তে পাই ব'লে তা'র শূন্যাত্মকতার ভয় চ'লে যায়।

কয়দিন রুদ্ধকণ্ঠে সঙ্কীর্ণ শয্যায় প'ড়ে প'ড়ে মৃত্যুকে খুব

কাছে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম, মনে হ'য়েছিলো প্রাণকে বহন কর্‌বার যোগ্য শক্তি আমার শেষ হ'য়ে গেচে। এই অবস্থায় প্রথম ইচ্ছার ধাক্কাটা ছিলো দেশের আকাশে প্রাণটাকে মুক্ত ক'রে দেওয়া। ক্রমে সেই ইচ্ছার বন্ধন শিথিল হ'য়ে এলো। তখন মৃত্যুর পূর্ব্বেই ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার যে-প্রথা আমাদের দেশে আছে, তা'র অর্থটা মনে জেগে উঠ্‌লো। ঘরের ভিতরকার সমস্ত অভ্যস্ত জিনিষ হ'চ্চে প্রাণের বন্ধনজাল। তা'রা সকলে মিলে মৃত্যুকে তীব্রভাবে প্রতিবাদ ক'র্‌তে থাকে। জীবনের শেষ-ক্ষণে মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের কোলাহল যদি জেগে ওঠে, তবে তাতেই বেসুর কর্কশ হয়; মৃত্যুর সম্পূর্ণ সঙ্গীত শুন্‌তে পাইনে. মৃত্যুকে সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নেবার আনন্দ চ'লে যায়।

বহুকাল হ'লো আমি যখন প্রথম কাশীতে গিয়েছিলাম তখন মৃত্যুকালের যে-একটি মনোহর দৃশ্য চোখে প'ড়েছিলো, তা আমি কোনোদিন ভুল্‌তে পার্‌বো না। ঠিক মনে নেই, বোধ করি তখন শরৎকাল; নির্ম্মল আকাশ থেকে প্রভাত-সূর্য্য জীবধাত্রী বসুন্ধরাকে আলোকে অভিষিক্ত ক'রে দিয়েচে। এপারের লোকালয়ের বিচিত্র চাঞ্চল্য, ওপারের প্রান্তরের সুদূরবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা, মাঝখানে জলধারা, সমস্তকে দেবতার পরশমণি ছোঁয়ানো হ'লো। নদীর ঠিক মাঝখানে দেখি একটি ডিঙি নৌকা খরস্রোতে ছুটে চ'লেচে। আকাশের দিকে মুখ ক'রে মুমূর্ষু স্তব্ধ হ'য়ে শুয়ে আছে, তারি মাথার কাছে করতাল বাজিয়ে উচ্চস্বরে কীর্ত্তন চ'ল্‌চে। নিখিল বিশ্বের

বক্ষের মাঝে মৃত্যুর যে-পরম আহ্বান, আমার কাছে তারি সুগম্ভীর সুরে আকাশ পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো। যেখানে তা'র আসন সেখানে তা'র শান্তরূপ দেখ্‌তে গেলে মৃত্যু-যে কত সুন্দর তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। ঘরের মধ্যে সমস্তই তাকে উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করে; সেইজন্য সেখানকার খাটপালঙ্ সিন্দুক চৌকি দেওয়াল কড়ি বরগা, সেখানকার প্রাত্যহিক ক্ষুধাতৃষ্ণা কর্ম্ম ও বিশ্রামের ছোটো-খাটো সমস্ত দাবীতে মুখর চঞ্চল ঘরকর্‌নার ব্যস্ততার মাঝখানে সমস্ত ভিড় ঠেলে সমস্ত আপত্তি অতিক্রম ক'রে মৃত্যু যখন চিরন্তনের লিপি হাতে নিয়ে প্রবেশ করে, তখন তাকে দস্যু ব'লে ভ্রম হয়, তখন তা'র হাতে মানুষ আত্মসমর্পণ কর্‌বার আনন্দ পায় না। মৃত্যু বাঁধন ছিন্ন ক'রে দেবে, এইটেই কুৎসিত, আপনি বাঁধন আল্‌গা ক'রে দিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তা'র হাত ধ'র্‌বো, এইটেই সুন্দর।

হিন্দু কাশীকে পৃথিবীর বাহিরের স্থান ব'লেই বিশ্বাস করে। তা'র কাছে কাশীর ভৌগোলিক সীমানা একটা মায়া, পরমার্থত সেখানে নিখিল বিশ্বের পরিচয়, সেখানে বিশ্বেশ্বরের আসন। অতএব বিশেষ দেশবাসীর কাছে বিশেষ দেশের যে আকর্ষণ-বেগ তা'র প্রাণকে সেখানকার মাটি জল আকাশের সঙ্গে নানা বিশেষ সূত্রে বাঁধে, কাশীর মধ্যে যেন পৃথিবীর সেই বিশেষ দেশগত বন্ধনও নেই। অতএব যথার্থ হিন্দুর কানে মৃত্যুর মুক্তিবাণী কাশীতে বিশুদ্ধ সুরে প্রবেশ করে।

বর্ত্তমান যুগে ন্যাশনাল বৈষয়িকতা বিশ্বব্যাপী হ'য়ে স্বদেশগত অহমিকাকে সুতীব্রভাবে প্রবল ক'রে তুলেচে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সংঘ-আশ্রিত অতি প্রকাণ্ডকায় রিপুই বর্ত্তমান যুগের সমস্ত দুঃখ ও বন্ধনের কারণ। তাই সেদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার মনে হ'লো, আমিও যেন মুক্তির তীর্থক্ষেত্রে ম'র্‌তে পারি,—শেষ-মুহূর্ত্তে যেন ব'ল্‌তে পারি সকল দেশই আমার এক-দেশ, সর্ব্বত্রই এক-বিশ্বেশ্বরের মন্দির; সকল দেশের মধ্য দিয়েই এক মানব-প্রাণের পবিত্র জাহ্নবীধারা এক-মহাসমুদ্রের অভিমুখে নিত্য-কাল প্রবাহিত।

পরিশিষ্ট*

২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

মানুষ-যে মানুষের পক্ষে কত সুদূরের জীব তা য়ুরোপে আমেরিকায় গেলে বুঝ্‌তে পারা যায়। সেখানকার সমাজ হ'চ্চে দ্বীপ-শ্রেণী—ছোট এক-এক-দল জ্ঞাতির চারিদিকে বৃহৎ অজ্ঞাতির লবণ সমুদ্র; পরস্পর-সংলগ্ন মহাদেশের মতো নয়। জ্ঞাতি শব্দটা তা'র ধাতুগত বিশেষ-অর্থে আমি ব্যবহার ক'র্‌চি; অর্থাৎ যে-কয়জনের মধ্যে জানা-শোনা আছে, আনা-গোনা চলে। আমাদের দেশে পরস্পর আনা-গোনার জন্য জানা-শোনার দরকার হয় না। আমরা তো খোলা জায়গায় রাস্তার চৌমাথায় বাস করি। একে আমাদের আয়ু কম, তা'র উপরে অবাধ সামাজিকতায় পরস্পরের সময় নষ্ট ও কাজ নষ্ট ক'র্‌তে আমাদের সঙ্কোচ মাত্র নেই।

আবার অন্যপক্ষে, ভোগের আদর্শ যেখানে অত্যন্ত বেশি ব্যয়সাধ্য, সুতরাং যেখানে সময়-জিনিষটাকে মানুষ টাকার দরে যাচাই ক'র্‌তে বাধ্য, সেখানে মানুষে-মানুষে মিল কেবলি বাধাগ্রস্ত হবেই, আর সেই মিল যতই প্রতিহত ও অনভ্যস্ত হ'তে থাক্‌বে ততই মানুষের সর্ব্বনাশের দিন ঘনিয়ে

* এই ক'টি পৃষ্ঠা "পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারির" সহিত মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয় নাই, পাণ্ডুলিপির বর্জ্জিত অংশ হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

—প্রকাশক

আস্‌বেই। একদিন দেখা যাবে, মানুষ বিস্তর জিনিষ সংগ্রহ ক'রেচে, বিস্তর বই লিখেচে, বিস্তর দেয়াল গেঁথে তুলেচে, কেবল নিজে গেচে হারিয়ে। মানুষ আর মানুষের কীর্ত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ভেঙে গিয়েচে ব'লেই আজ মানুষ খুব সমারোহ ক'রে আপন গোরস্থান তৈরি ক'র্‌তে ব'সেচে।

২৬ সেপ্টেম্বর

একজন আধুনিক জাপানী রূপদক্ষের রচিত একটি ছবি আমার কাছে আছে। সেটি যতবার দেখি আমার গভীর বিস্ময় লাগে। দিগন্তে রক্তবর্ণ সূর্য্য—শীতের বরফ-চাপা শাসন সবে-মাত্র ভেঙে গেচে, প্লাম্‌-গাছের পত্রহীন শাখাগুলি জয়ধ্বনির বাহু-ভঙ্গীর মতো সূর্য্যের দিকে প্রসারিত, শাদা শাদা ফুলের মঞ্জরীতে গাছ ভরা। সেই প্লাম্‌-গাছের তলায় একটি অন্ধ দাঁড়িয়ে তা'র আলোক-পিপাসু দুই চক্ষু সূর্য্যের দিকে তুলে প্রার্থনা ক'র্‌চে।

আমাদের ঋষি প্রার্থনা ক'রেচেন, "তমসো মা জ্যোতির্গময়" অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও। চৈতন্যের পরিপূর্ণতাকে তাঁরা জ্যোতি ব'লেচেন। তাঁদের ধ্যানমন্ত্রে সূর্য্যকে তাঁরা ব'লেচেন—"ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ"—আমাদের চিত্তে তিনি ধীশক্তির ধারাগুলি প্রেরণ ক'র্‌চেন।

ঈষোপনিষদে ব'লেচেন, হে পূষণ, তোমার ঢাকা খুলে ফেলো, সত্যের মুখ দেখি—আমার মধ্যে যিনি সেই পুরুষ তোমার মধ্যে।

এই বাদ্‌লার অন্ধকারে আজ আমার মধ্যে যে-ছায়াচ্ছন্ন বিষাদ সে ঐ ব্যাকুলতারই একটি রূপ। সেও ব'লচে, হে পূষণ, তোমার ঐ ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার জ্যোতির মধ্যে আমার আত্মাকে উজ্জ্বল দেখি। অবসাদ দূর হোক্। আমার চিত্তের বাঁশিতে তোমার আলোকের নিঃশ্বাস পূর্ণ করো,—সমস্ত আকাশ আনন্দের গানে জাগ্রত হ'য়ে উঠুক্। আমার প্রাণ-যে তোমার আলোকেরই একটি প্রকাশ, আমার দেহও তাই। আমার চিত্তকে তোমার জ্যোতিরঙ্গুলি যখনই স্পর্শ করে, তখনি তো ভূর্ভুবস্বঃ দীপ্যমান হ'য়ে ওঠে। মেঘে মেঘে তোমার যেমন নানা রং, আমার ভাবনায় ভাবনায় তোমার তেজ তেম্‌নি সুখ-দুঃখের কত রং লাগিয়ে দিচ্চে। একই জ্যোতি বাইরের পুষ্পপল্লবের বর্ণে গন্ধে এবং অন্তরের রাগে অনুরাগে বিচিত্র হ'য়ে ঠিক্‌রে প'ড়্‌চে। প্রভাতে সন্ধ্যায় তোমার গান দিকে দিগন্তে বেজে ওঠে, তেম্‌নি তোমারি গান আমার কবির চিত্ত গলিয়ে দিয়ে ভাষার স্রোতে ছন্দের নাচে ব'য়ে চ'ল্‌লো। এক জ্যোতির এত রং, এত রূপ, এত ভাব, এত রস! অন্ধকারের সঙ্গে নিত্য ঘাতে প্রতিঘাতে তা'র এত নৃত্য, এত গান, তা'র এত ভাঙা, এত গড়া,—তা'রি সারথ্যে যুগযুগান্তরের এমন রথ-যাত্রা! তোমার তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনাই তো গাছ হ'য়ে, ঘাস হ'য়ে আকাশে উঠ্‌চে, ব'ল্‌চে অপাবৃণু—ঢাকা খুলে দাও। এই ঢাকা খোলাই তা'র প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলা থেকেই তা'র ফুল ফল। এই প্রার্থনাই

আদিম জীবাণুর মধ্যে দিয়ে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত। মানুষের প্রাণের ঘাট পেরিয়ে মানুষের চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চ'ল্‌লো। মানুষের ইতিহাস ব'ল্‌চে, অপাবৃণু, ঢাকা খোলো। জীব ব'ল্‌চে, আমার মধ্যে-যে সত্য আছে তা'র জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণ স্বরূপ দেখি। হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের মুখের আবরণ ঘুচুক্, তা'র অন্তরের রহস্য প্রকাশিত হোক্—সেই রহস্য আমার মধ্যে তোমার মধ্যে একই!

প্রাণ যখন ক্লান্ত হয় তখন বলি, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব দূর হ'য়ে যাক্, সৃষ্টির লীলাতরঙ্গে আর উঠ্‌তে নাম্‌তে পারিনে; পাত্রের ঢাকা কেবল খুলে যাক্ তা নয়, পাত্রটাই যাক্ ভেঙে, একের বক্ষে বিরাজ না ক'রে একের মধ্যে বিলুপ্ত হই। ভারতবর্ষে এই প্রার্থনা ক্ষণে ক্ষণে শুন্‌তে পাই।

কিন্তু আমি বলি, অপাবৃণু; সত্যের মুখ খুলে দাও,—এককে অন্তরে বাহিরে ভালো ক'রে দেখি, তাহ'লেই অনেককে ভালো ক'রে বুঝ্‌তে পা'রবো। গানের মধ্যে আগাগোড়া যে-একটি আনন্দময় এক আছে তাকে যতক্ষণ বুঝ্‌তে না পারি ততক্ষণ সুরের সঙ্গে সুরের দ্বন্দ্ব আমাকে সুখ দেয় না, আমাকে পীড়া দেয়। তাই ব'লে আমি ব'ল্‌বো না, গান যাক্ লুপ্ত হ'য়ে; আমি ব'ল্‌বো, পূর্ণ গানটাকে অন্তরে যেন জানি, তাহ'লেই খণ্ড সুরের দ্বন্দ্বটা বাহিরে আমাকে আর বাজ্‌বে না, সেটাকেও অখণ্ড আনন্দের মধ্যে বিধৃত ক'রে দেখ্‌বো।

২৭ সেপ্টেম্বর

বয়স যখন অল্প ছিলো তখন অনেক ঘটনা ঘ'টেচে যা মনকে খুব নাড়া দিয়েচে। এই ঘটনাগুলোর সত্যের গৌরব যদি যাচাই ক'র্‌তে চাই, তবে দেখ্‌তে পাবো দুই বড়ো বড়ো সাক্ষী দুই-রকমের বাটখারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে ওজনের মিল নেই। বৈজ্ঞানিক পুরাতাত্ত্বিক যে-প্রমাণকে সব-চেয়ে খাঁটি ব'লে মানে, সে হ'চ্চে, যাকে বলা যেতে পারে সাধারণ প্রমাণ, সে হ'চ্চে নির্ব্বিশেষ। কিন্তু মানুষ যেহেতু একান্ত বৈজ্ঞানিক নয়, সেইজন্যে মানুষের জগতে যে-সকল ঘটনা ঘটে সেগুলি যদি নিতান্ত তুচ্ছ না হয় তাহ'লে তাদের ওজন সাধারণ বাটখারার ওজন মানে না। তাদের বেলায় বিজ্ঞানকে ছুট ক'রে দিয়ে কোথা থেকে একটা অসাধারণ তুলাদণ্ড এসে খাড়া হয়। বৈজ্ঞানিক সেই ওজনটাকে সাধারণ ওজনের সঙ্গে মিল ক'র্‌তে গিয়ে ভারি গোলমাল ক'র্‌তে থাকে। একটা খুব বড়ো দৃষ্টান্ত দেখা যাক্‌, বুদ্ধদেব। যদি তাঁর সময়ে সিনেমাওয়ালা এবং খবরের কাগজের রিপোর্টারের চলন থাক্‌তো তাহ'লে তাঁর খুব একটা সাধারণ ছবি পাওয়া যেতো। তাঁর চেহারা, চালচলন, তাঁর মেজাজ, তাঁর ছোটো-খাটো ব্যক্তিগত অভ্যাস, তাঁর রোগ তাপ ক্লান্তি-ভ্রান্তি সব নিয়ে আমাদের অনেকের সঙ্গে মিল দেখ্‌তুম। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এই সাধারণ

প্রমাণটাকেই যদি প্রামাণিক ব'লে গণ্য করা যায় তাহ'লে একটা মস্ত ভুল করি। সে ভুল হ'চ্চে, পরিপ্রেক্ষিতের—ইংরেজিতে যা'কে বলে perspective। যে-জনতাকে আমরা সর্ব্বসাধারণ বলি সে কেবল ক্ষণকালের জন্য মানুষের মনে ছায়া ফেলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মিলিয়ে যায়। অথচ এমন সব মানুষ আছেন যাঁরা শত শত শতাব্দী ধ'রে মানুষের চিত্তকে অধিকার ক'রে থাকেন। যে-গুণে অধিকার করেন সেই গুণটাকে ক্ষণকালের জাল দিয়ে ধরাই যায় না। ক্ষণকালের জাল দিয়ে যেটা ধরা পড়ে সেই হ'লো সাধারণ মানুষ। তাকে ডাঙায় তুলে মাছকোটার মতো কুটে বৈজ্ঞানিক যখন তা'র সাধারণত্ব প্রমাণ ক'রে আনন্দ ক'র্‌তে থাকেন তখন দামী জিনিষের বিশেষ দামটা থেকেই তাঁরা মানুষকে বঞ্চিত ক'র্‌তে চান। সুদীর্ঘকাল ধ'রে মানুষ অসামান্য মানুষকে এই বিশেষ দামটা দিয়ে এসেচে। সাধারণ সত্য মত্ত হস্তীর মতো এসে এই বিশেষ সত্যের পদ্মবনটাকে দলন ক'র্‌লে সেটা কি সহ্য করা যাবে? সিনেমা-ছবিতে, গ্রামোফোনের ধ্বনিতে যে-বুদ্ধকে পাওয়া যেতে পারে সে তো ক্ষণকালের বুদ্ধ, সুদীর্ঘকাল মানুষের সজীব চিত্তের সিংহাসনে ব'সে যিনি অসংখ্য নরনারীর ভক্তিপ্রেমের অর্ঘ্যে অলঙ্কৃত হ'য়েচেন, তিনি চিরকালের বুদ্ধ। তাঁর ছবি সুদীর্ঘ যুগযুগান্তরের পটে আঁকা হ'য়েই চ'লেচে। তাঁর সত্য কেবলমাত্র তাঁকে নিয়ে নয়, তাঁর সত্য বহু দেশকালপাত্রের বিপুলতাকে নিয়ে,—সেই বৃহৎ পরি-

মণ্ডলের মধ্যে তাঁর দৈনিক ঘটনা, তাঁর সাময়িক মানসিক অবস্থার চঞ্চল ছায়ালোকপাত চোখে দেখ্‌তেই পাওয়া যাবে না। যদি কোনো অণুবীক্ষণ নিয়ে সেইগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি তাহ'লে তাঁর বৃহৎ রূপটাকে দেখা অসম্ভব হবে। যে-মানুষ আপন সাধারণ-ব্যক্তিগত পরিধির মধ্যে বিশেষ দিনে জন্মলাভ ক'রে বিশেষ দিনে ম'রে গেচেন তিনি বুদ্ধই নন। মানুষের ইতিহাস সেই আপন বিস্মরণশক্তির গুণেই সেই ছোটো বুদ্ধের প্রতিদিনের ছোটো ছোটো ব্যাপার ভুলে যেতে পেরেচে, তবেই একটি বড়ো বুদ্ধকে পেয়েচে। মানুষের স্মরণশক্তি যদি ফোটোগ্রাফের প্লেটের মতো সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার হ'তো তাহ'লে সে আপন ইতিহাস থেকে উঞ্ছবৃত্তি ক'রে ম'র্‌তো, বড়ো জিনিষ থেকে বঞ্চিত হ'তো।

বড়ো জিনিষ যেহেতু দীর্ঘকাল থাকে এইজন্যে তাকে নিয়ে মানুষ অকর্ম্মকভাবে থাক্‌তেই পারে না। তাকে নিজের সৃষ্টিশক্তি, নিজের কল্পনাশক্তি দিয়ে নিতেই প্রাণ জুগিয়ে চ'ল্‌তে হয়। কেননা, বড়ো জিনিষের সঙ্গে তা'র-যে প্রাণের যোগ, কেবলমাত্র জ্ঞানের যোগ নয়। এই যোগের পথ দিয়ে মানুষ আপন প্রাণের মানুষদের কাছ থেকে যেমন প্রাণ পায় তেম্‌নি তা'দের প্রাণ দেয়।

এই প্রসঙ্গে একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো দৃষ্টান্ত আমার মনে প'ড়্‌চে। ম্যাক্সিম গোর্কি টল্‌স্‌টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেচেন। বর্ত্তমান-কালের প্রখরবুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা

দিয়ে ব'ল্‌চেন, এ-লেখাটা আর্টিষ্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ টল্‌স্‌টয় দোষেগুণে ঠিক যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণ রেখায় তেমনটি আঁকা হ'য়েচে, এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তি-শ্রদ্ধার কোনো কুয়াশা নেই। প'ড়্‌লে মনে হয় টল্‌স্‌টয় যে সর্ব্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড়ো তা নয়, এমন-কি, অনেক বিষয়ে হেয়। এখানে আবার সেই কথাটাই আস্‌চে। টল্‌স্‌টয়ের কিছুই মন্দ ছিলো না একথা বলাই চলে না, খুঁটি-নাটি বিচার ক'র্‌লে তিনি-যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতোই, এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্ব্বল একথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু যে-সত্যের গুণে টল্‌স্‌টয় বহুলোকের এবং বহুকালের, তাঁর ক্ষণিকমূর্ত্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে তাহ'লে এই আর্টিষ্টের আশ্চর্য্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী? প্রথম যখন আমি দার্জ্জিলিং দেখ্‌তে গিয়েছিলুম দিনের পর দিন কেবলই দেখেছিলুম মেঘ আর কুয়াশা। কিন্তু জানা ছিলো এগুলো সাময়িক এবং যদিও হিমালয়কে আচ্ছন্ন কর্‌বার এদের শক্তি আছে তবুও এরা কালো বাষ্পমাত্র, কাঞ্চনজঙ্ঘার ধ্রুব শুভ্র মহত্ত্বকে এরা অতিক্রম ক'র্‌তে পারে না। আর যাই হোক্, হিমালয়কে এই কুয়াশার দ্বারা তিরস্কৃত দেখে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে মূঢ়তা হ'তো। ক্ষণকালের মায়ার দ্বারা চিরকালের স্বরূপকে প্রচ্ছন্ন ক'রে দেখাই আর্টিষ্টের দেখা একথা মান্‌তে পারিনে। তা ছাড়া গোর্কির আর্টিষ্ট-চিত্ত তো বৈজ্ঞানিক হিসাবে নির্ব্বিকার নয়।

তাঁর চিত্তে টল্‌স্‌টয়ের যে-ছায়া প'ড়েচে সেটা একটা ছবি হ'তে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা-যে সত্য তা কেমন ক'রে ব'ল্‌বো? গোর্কির টল্‌স্‌টয়ই কি টল্‌স্‌টয়? বহুকালের ও বহুলোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংহত ক'র্‌তে পার্‌তেন তাহ'লেই তাঁর দ্বারা বহু-কালের ও বহুলোকের টল্‌সটয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হ'তো। তা'র মধ্যে অনেক ভোল্‌বার সামগ্রী ভুলে যাওয়া হ'তো, আর তবেই যা না-ভোল্‌বার তা বড়ো হ'য়ে সম্পূর্ণ হ'য়ে দেখা দিতো।

৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫

জাহাজ ক্রাকোভিয়া

মানুষের মধ্যে মন প্রাণ দেহ এই তিনে মিলে কাজ চালায়, এই তিনের আপোষে আমাদের কর্ম্মবেগের একটা ছন্দ তৈরি করে। শীতের দেশে দেহ সহজেই ছুটে চ'ল্‌তে চায়, তা'রই সঙ্গে তাল রাখ্‌বার জন্যে মনেরও তাড়াতাড়ি ভাবা দরকার। গরম দেশে আমরা ধীরে সুস্থে চলি, ধীরে সুস্থে ভাবি, কোনো বিষয়ে মন স্থির ক'র্‌তে বিলম্ব ঘটে। শীতের দেশে যে-তেজকে দেহের মধ্যেই জাগিয়ে তুল্‌তে হয়, গরম দেশে সেই তেজ দেহের বাইরে; সেই আকাশব্যাপী তেজ শরীরের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি; সেইজন্যে আভ্যন্তরিক উত্তেজনা যাতে বেড়ে না ওঠে আমাদের

শরীরের সেই অভিপ্রায়। চলাফেরার দম সর্ব্বদাই তাকে কমিয়ে রাখ্‌তে হয়; তাই আমাদের মনের মধ্যে কর্ম্মচিন্তার ছন্দ মন্দাক্রান্তা।

মনের ভাবনা ও হুকুমের অপেক্ষায় যখন দেহকে কাজ-চালাবার জন্যে পথ চেয়ে থাকৃতে হয় না তখন তাকেই বলে অভ্যাস, সেই অভ্যাসেই নৈপুণ্য। কর্ম্মের তাল যতই দ্রুত হয়, দেহের পক্ষে ততই দ্বিধাবিহীন হওয়া দরকার। ভাবতে মনের যে-সময় লাগে তা'র জন্যে সবুর ক'র্‌তে গেলেই দ্বিধা ঘটে। বাহিরে কর্ম্মের ফল সেই সবুরের জন্যে যদি অপেক্ষা ক'র্‌তে না পারে তাহ'লেই বিভ্রাট। মোটরগাড়ির একটা বিশেষ বেগ আছে, কখন্ তা'র হাল বাঁয়ে ফেরাবো, কখন্ ডাইনে, তা ঠিক ক'র্‌তে হ'লে সেই কলের বেগের দ্রুত ছন্দেই ঠিক ক'র্‌তে হয়, নইলে বিপদ ঘটে। সেই দ্রুততা বারবার অভ্যাসের জোরেই সহজ হয়। অভ্যাসের বাহিরে কোনো নূতন অবস্থা এসে প'ড়্‌লে অপঘাত ঘটায়, অর্থাৎ যেখানে মনের দর্‌কার সেখানে মনকে প্রস্তুত না পেলেই মুস্কিল।

দম দিয়ে কলের তাল দূন চৌদূন করা শক্ত নয়, সেই সঙ্গে অভ্যাসের বেগও অনেক পরিমাণে বাড়ানো চলে। কিন্তু এই দ্রুত অভ্যাসের নৈপুণ্যে সেইসব কাজই সম্ভবপর হয় যা 'বস্তুগত'। অর্থাৎ এক-বস্তা বাঁধ্‌বার জায়গায় দুই বস্তা বাঁধা যায়। কিন্তু যা-কিছু প্রাণগত, ভাবগত তা কলের ছন্দের অনুবর্ত্তী হ'তে চায় না।

যারা পালোয়ান প্রকৃতির লোক সঙ্গীতে তা'রা দূন চৌদূনের বেগ দেখে পুলকিত হ'য়ে ওঠে, কিন্তু পদ্মবনের তরঙ্গ-দোলায় যারা বীণাপাণির মাধুর্য্যে মুগ্ধ, ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে তাঁর মোটররথযাত্রার প্রস্তাবে তাদের মন হায় হায় ক'র্‌তে থাকে।

পশ্চিম মহাদেশে মানুষের জীবনযাত্রার তাল কেবলি দূন থেকে চৌদূনের অভিমুখে চ'লেচে। কেননা জীবনের সার্থকতার চেয়ে বস্তুর প্রয়োজন অত্যন্ত বেড়ে উঠেচে। ঘর ভেঙে হাট তৈরি হ'লো, রব উঠ্‌লো Time is money। এই বেগের পরিমাপ সহজ। সেইজন্যে সেখানে একটা জিনিষ সর্ব্বত্রই দেখা যাচ্চে, যেটা সকলেরই কাছে সুস্পষ্ট, যেটা বুঝ্‌তে কারো মুহূর্ত্তকাল দেরি হয় না,—সে হ'চ্চে পাখোয়াজির হাত দুটোর দুড়্‌দাড়্‌ তাণ্ডব নৃত্য। গান বুঝ্‌তে-যে সবুর করা অত্যাবশ্যক, সেটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে, ভিড়ের লোকে বলে—"সাবাস, এ একটা কাণ্ড বটে।"

এবার জাহাজে সিনেমা অভিনয় দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেছিলো। দেখ্‌লুম, তা'র প্রধান জিনিষটাই হ'চ্চে, দ্রুত লয়। ঘটনার দ্রুততা বারেবারে চমক লাগিয়ে দিচ্চে। এই সিনেমা আজকালকার দিনে সর্ব্বসাধারণের একটা প্রকাণ্ড নেশা। ছেলে-বুড়ো সকলকেই প্রতিদিন এতে মাতিয়ে রেখেচে। তা'র মানে হ'চ্চে, সকল বিভাগেই বর্ত্তমান যুগে কলার চেয়ে কার্‌দানি বড়ো হ'য়ে উঠেচে। প্রয়োজন-সাধনের মুগ্ধ-দৃষ্টি কার্‌দানিকেই পছন্দ করে। সিদ্ধি,

ইংরেজিতে যাকে Success বলে, তার প্রধান বাহন হ'চ্চে দ্রুত নৈপুণ্য। পাপ-কর্ম্মের মধ্য দিয়েও সেই নৈপুণ্যের লীলাদৃশ্য আজ সকলের কাছে উপাদেয়। সুষমাকে কল্যাণকে উপলব্ধি কর্‌বার মতো শান্তি ও অবকাশ প্রতিদিন প্রতিহত হ'তে চ'ল্‌লো—সিদ্ধির ঘোড়-দৌড়ে খুয়োখেলার উত্তেজনা পশ্চিম দিগন্তে কেবলি ঘূর্ণি হাওয়া বইয়ে দিচ্চে।

পশ্চিম মহাদেশের অন্ধকার পটের উপর আবর্ত্তমান পলিটিক্সের দৃশ্যটাকে একটা সিনেমার বিপুলাকার চলচ্ছবির মতো দেখ্‌তে হ'য়েচে। ব্যাপারটা হ'চ্চে, দ্রুত-লয়ের প্রতিযোগিতা। জলে-স্থলে-আকাশে কে একটুমাত্র এগিয়ে যেতে পারে তা'রই উপর হারজিৎ নির্ভর ক'র্‌চে। গতি কেবলি বাড়্‌চে, তা'র সঙ্গে শান্তির কোনো সমন্বয় নেই। ধর্ম্মের পথে ধৈর্য্য চাই, আত্মসম্বরণ চাই, সিদ্ধির পথে চাতুরীর ধৈর্য্য নেই, সংযম নেই; তা'র হস্ত-পদ-চালনা যতই দ্রুত হবে ততই তা'র ভেল্কী বিস্ময়কর হ'য়ে উঠ্‌বে—তাই যাদুকরের সভ্যতায় বেগের পরিমাণ সকল দিকেই এত বেশি ত্বরান্বিত যে, মানুষের মন অসত্যে লজ্জিত ও অপঘাত-সম্ভাবনায় শঙ্কিত হবার সময় পাচ্চে না।

১২ই ফেব্রুয়ারী

ক্রাকোভিয়া (এডেন বন্দর)

ঘর বলে, পেয়েচি; পথ বলে, পাইনি। মানুষের কাছে "পেয়েচি" তা'রও একটা ডাক আছে আর "পাইনি" তা'রও

ডাক প্রবল। ঘর আর পথ নিয়েই মানুষ। শুধু ঘর আছে পথ নেই সেও যেমন মানুষের বন্ধন, শুধু পথ আছে ঘর নেই সেও তেম্‌নি মানুষের শাস্তি। শুধু "পেয়েচি" বদ্ধ গুহা, শুধু "পাইনি" অসীম মরুভূমি।

যাকে আমরা ভালোবাসি তা'রই মধ্যে সত্যকে আমরা নিবিড় ক'রে উপলব্ধি করি। কিন্তু সেই সত্য-উপলব্ধির লক্ষণ হ'চ্চে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়াকে অনুভব করা। সত্যের মধ্যে এই একান্ত বিরুদ্ধতার সমন্বয় আছে ব'লেই সত্য-উপলব্ধির জবানবন্দী এমন হয় যে, আদালতে তা গ্রাহ্যই হ'তে পারে না। সুন্দরকে দেখে আমাদের ভাষায় যখন বলি—"আ মরি", তখন বাহিরের দাঁড়িপাল্লার ওজনে তাকে অত্যুক্তি বলা চলে, কিন্তু অন্তর্য্যামী তাকে বিশ্বাস করেন। সুন্দরের মধ্যে অনন্তের স্পর্শ যখন পাই তখন আমার মধ্যে যে-অন্ত আছে, সে বলে, "আমি নেই। কেবল ওই আছে।" অর্থাৎ যাকে আমি অত্যন্ত পেয়েচি সে নেই, আর যাকে আমি পেয়েও পাইনে সেই অত্যন্ত আছে।

ঘড়ি-ধরা অবিশ্বাসী, সময়কে আপেক্ষিক অর্থাৎ মায়া ব'লে মান্‌তে চায় না, সে জানে না নিমেষই বলো আর লক্ষ যুগই বলো দুয়ের মধ্যে অসীম সমানভাবেই আছেন, শুধু কেবল উপলব্ধির অপেক্ষা। এইজন্যই কবি প্রেমের ভাষায় অর্থাৎ নিবিড় সত্য-উপলব্ধির ভাষায় ব'লেচেন, "নিমিষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।" যারা আয়তনকে ঐকান্তিক সত্য ব'লে মনে করে তা'রাই অসীমের সীমা শুন্‌লে কানে

হাত দেয়। কিন্তু দেশই বলো, আর কালই বলো, যাতে ক'রে সৃষ্টির সীমা নির্দ্দেশ ক'রে দেয়, দুইই আপেক্ষিক, দুইই মায়া। সিনেমাতে কালের পরিমাণ বদল ক'রে দিয়ে যে-ব্যায়ামক্রীড়া দেখানো হয় তাতে দেখি যে ঘড়ি-ধরা কালে যা একভাবে প্রত্যক্ষ, কালকে বিলম্বিত ক'রে দিলে তাকেই অন্যভাবে দেখা যায়, অর্থাৎ স্বল্পকালের সংহতিতে যা চঞ্চল, বৃহৎকালের ব্যাপ্তিতে তাই স্থির। শুধু কাল কেন, আকাশ সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। আমাদের দৃষ্টির আকাশে গোলাপ ফুলকে যে-আয়তনে দেখ্‌চি অণুবীক্ষণের আকাশে তাকে সে-আয়তনে দেখিনে। আকাশকে আরো অনেক বেশি আণুবীক্ষণিক ক'রে দেখ্‌তে পার্‌লে গোলাপের পরমাণু-পুঞ্জকে বৈদ্যুতিক যুগলমিলনের নৃত্যলীলারূপে দেখ্‌তে পারি,—সে-আকাশে গোলাপ একেবারে গোলাপই থাকে না। অথচ সে-আকাশ দূরস্থ নয়, স্বতন্ত্র নয়—এই আকাশেই। তাই পরম সত্যকে উপনিষৎ ব'লেচেন, তদেজতিতন্নৈজতি, একই কালে তিনি চলেনও তিনি চলেনও না।

সংস্কৃত ভাষায় ছন্দ শব্দের একটা অর্থ হ'চ্চে কাব্যের মাত্রা, আরেকটা অর্থ হ'চ্চে ইচ্ছা। মাত্রা আকারে কবির সৃষ্টি-ইচ্ছা কাব্যকে বিচিত্র রূপ দিতে থাকে। বিশ্বসৃষ্টির বৈচিত্র্যও দেশকালের মাত্রা অনুসারে। কালের বা দেশের মাত্রা বদল কর্‌বামাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হ'য়ে যায়। এই বিশ্বছন্দের মাত্রাকে আমরা আরো গভীর ক'রে

দেখ্‌তে পারি ; তাহ'লে চরম বিশ্বকবির ইচ্ছাশক্তির মধ্যে গিয়ে পৌঁছ'তে হবে। মাত্রা সেখানে মাত্রার অতীতের মধ্যে ;—সীমার বৈচিত্র্য সেখানে অসীমের লীলা অর্থে প্রকাশ পায়।

দেশকালের মধ্যেই দেশকালের অতীতকে উপলব্ধি ক'রে তবেই আমরা ব'ল্‌তে পারি, "মরি, মরি।" সেই আনন্দ না হ'লে মরা সহজ হবে কেমন ক'রে ? তাল আর সা-রে-গ-ম যখন কেবলমাত্র বাহিরের তথ্যরূপে কানের উপর মনের উপর পড়্‌তে থাকে তখন তা'র থেকে মুক্তি পাবার জন্যে চিত্ত ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে—কিন্তু যখন সেই তাল আর সা-রে-গ-মের ভিতর থেকেই সঙ্গীতকে দেখ্‌তে পাই তখন মাত্রায় অমাত্রকে, সীমায় অসীমকে, পাওয়ায় অপাওয়াকে জানি, তখন সেই আনন্দে মনে হয় এর জন্যে সব দিতে পারি। কা'র জন্যে ? ঐ সা-রে-গ-মের জন্যে ? ঐ ঝাঁপতাল চৌতালের জন্যে, দূন চৌদুনের কস্‌রতের জন্যে ? না ; এমন-কিছুর জন্যে যা অনির্ব্বচনীয়, যা পাওয়া না-পাওয়ায় এক হ'য়ে মেশা ; যা সুর নয়, তাল নয়, সুর-তালে ব্যাপ্ত হ'য়ে থেকে সুরতালের অতীত যা, সেই সঙ্গীত।

প্রয়োজনের জানা নিতান্তই জানার সীমানার মধ্যে বদ্ধ, তা'র চারদিকে না-জানার আকাশমণ্ডলটা চাপা, সেইজন্যে তাকে সত্যরূপে দেখা হয় না, সেইজন্যে তা'র মধ্যে যথার্থ আনন্দ নেই, বিস্ময় নেই, শ্রদ্ধা নেই। সেইজন্যে তা'র

উদ্দেশে যথার্থ ত্যাগ স্বীকার সম্ভব হ'তে পারে না। এই কারণেই ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজের ব্যক্তিগত বদান্যতার অদ্ভুত অভাব। অথচ এ সম্বন্ধে তা'র সঙ্গতির বোধ এতই অল্প যে, ভারতবর্ষের জন্যে তা'র ত্যাগের তালিকা হিসাব ক'র্বার বেলায় সর্ব্বদাই সে অহঙ্কার ক'রে বলে যে, তা'র সিভিল সার্ভিস, তা'র ফৌজের দল ভারতবর্ষের সেবায় গরমে দগ্ধ হ'য়ে, লিভার বিকৃত ক'রে, প্রবাসের দুঃখ মাথায় নিয়ে কী কষ্টই না পাচ্চে। বিষয়কর্ম্মের আনুষঙ্গিক দুঃখকে ত্যাগের দুঃখ নাম দেওয়া, রাষ্ট্রনীতির আইন ও ব্যবস্থা রক্ষার উপলক্ষ্যে যে-কৃচ্ছ্রসাধন, তাকে সত্যের তপস্যা, ধর্ম্মের সাধনা বলাটা, হয় গুপ্ত পরিহাস, নয়, মিথ্যা অহঙ্কার।

বাসনার চোখে বা বিদ্বেষের চোখে বা অন্ধকারের চোখে যাকে দেখি তাকে সীমায় বেঁধে দেখি, তা'র প্রতি পূর্ণ সত্যের ব্যবহার কোনোমতেই হ'তে পারে না ব'লে তা'র থেকে এত দুঃখের উৎপত্তি হয়। মুনফার লোভে, ক্ষমতার অত্যাকাঙ্ক্ষায়, মানুষের সত্য আজ সর্ব্বত্র যেমন আচ্ছন্ন হ'য়েচে এমন আর কখনোই হয়নি। মানুষের মধ্যে সত্যকে না দেখ্‌তে পাওয়ার নিরানন্দ এবং অন্যায়, বিশ্বের পূর্ণ অধিকার থেকে বিশ্বজিগীষু কুস্তিগিরদের আজ যেমন বঞ্চিত ক'রেচে এমন কোনো দিন করেনি। সেইজন্যেই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে মানুষ এ-কথা ব'ল্‌তে লজ্জাও ক'র্‌চে না, যে, মানুষকে শাসন কর্‌বার অধিকারই

শ্রেষ্ঠ অধিকার ; অর্থাৎ তাকে পৃথক ক'রে রাখ্‌বার নীতিই বড়ো নীতি। ... ...

বহু অল্পসংখ্যক য়ুরোপীয় বালকবালিকার শিক্ষার জন্য তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ গবর্ণমেণ্ট্ ব্যয় ক'র্‌তে সম্মত হ'য়েচেন ব'লে দেশী লোকেরা যে-নালিশ ক'রে থাকে, শুন্‌লুম, তা'র জবাবে আমাদের শাসনকর্ত্তা ব'লেচেন, যেহেতু অনেক মিশনারি বিদ্যালয় ভারতের জন্য আত্মসমর্পণ ক'রেচে সেই কারণে এই নালিশ অসঙ্গত। আমি নিজে নালিশ করিনে, যে-কোনো সমাজের লোকের জন্য যত অধিক পরিমাণ অর্থব্যয় করা হোক্ আমার তাতে আপত্তি নেই। য়ুরোপীয় বালকবালিকারা যদি অশিক্ষিত ভাবে মানুষ হয় তাতে আমাদেরও মন্দ ছাড়া ভালো হবার আশা নেই। কিন্তু মিশনারী বিদ্যালয়ের ওজর দিয়ে আত্মগ্লানি দূর কর্‌বার চেষ্টা ঠিক নয়। এ কথা স্বীকৃত যে, এই ৩৫ কোটি ভারত-বাসীর শত-করা দশ অংশও শিক্ষিত নয়, আজ প্রায় শতাব্দী-কাল ইংরেজ-শাসনে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়নি ব'লেই এটা ঘ'টেচে। সেটার প্রধান কারণ, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব। কিন্তু য়ুরোপীয় বালকবালিকার প্রতি সে-অভাব নেই। আমাদের পক্ষে শতকরা পাঁচভাগ শিক্ষাই যথেষ্ট, কিন্তু য়ুরোপীয় ছাত্রদের জন্য শতকরা ৯৯ ভাগ শিক্ষার ব্যবস্থা হ'লেও ঐ একভাগের জন্য খুঁৎ খুঁৎ থেকে যায়। জাপান তো জাপানী ছেলেদের জন্যে এমন কথা বলেনি, সেখানেও তো মিশনারি বিদ্যালয় আছে। যে-কারণে ভারতের অর্থে

পুষ্ট ইংরেজ-ধনীর মধ্যে প্রায়ই কেউ ভারতের দৈন্য-দুঃখ লাঘবের জন্য মুনফার সামান্য অংশও দিতে পারেনি, সেই কারণেই ভারত গবর্ণমেণ্ট্ ভারতের অজ্ঞতা-অপমান লাঘবের জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষার ব্যয় বহন ক'র্‌তে পারেনি, সহজ বদান্যতার অভাবে। ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের অস্বাভাবিক সম্বন্ধ—এই কারণেই ইংলণ্ডের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় রাজা মহারাজার দান দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু ইংলণ্ডের কোনো ধনী ভারতের কোনো অনুষ্ঠানে দানের মতো কোনো দান ক'রেচে শুন্‌তে পাইনি। অথচ ভারত নিঃস্ব, ইংরেজ ধনী।

মিশনারি বিদ্যালয়ে ইংরেজের অর্থ আছে এমন কথা উঠ্‌বে। কিন্তু সে কি ইংরেজের অর্থ? সে-যে খৃষ্টীয়ানের অর্থ। সে-যে ধর্ম্মফলকামী সমস্ত ইউরোপের অর্থ। ধার্ম্মিকের দান, আত্মীয়তার দান নয়, অধিকাংশ সময়েই তা পারলৌকিক বৈষয়িকতার দান। ভারতীয় খৃষ্টীয়ানের সঙ্গে ইংরেজ খৃষ্টীয়ানের যে কী সম্বন্ধ তা সকলেই জানে। ভারতের কোনো একটি পাহাড়ের সহরে চার্চ্চ অফ্ ইংলণ্ডের সম্প্রদায়গত একজন ভারতীয় ভক্ত খৃষ্টীয়ান ছিলেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টিসৎকারের অনুষ্ঠান নির্ব্বাহের জন্য তাঁর বিধবা স্ত্রী সেখানকার একমাত্র স্বসাম্প্রদায়িক পাদ্রিকে অনুরোধ করেন। পাদ্রি আপন মর্য্যাদা হানি ক'র্‌তে সম্মত হ'লেন না, বোধ করি এতে পোলিটিকাল্ প্রেষ্টিজেরও খর্ব্বতা সম্ভাবনা আছে। অগত্যা বিধবা প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ পাদ্রির শরণাপন্ন হ'লেন;

তিনি ভিন্ন-সম্প্রদায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেওয়া অকর্ত্তব্য বোধ ক'র্‌লেন। ভারতে কোনো যথার্থ ভক্ত ইংরেজ মিশনারি নেই, একথা আমি বলিনে। কিন্তু মিশনারি অনুষ্ঠানের যে-অংশে সাধারণ ইংরেজ ধার্ম্মিকের অর্থ আছে সেখানে শ্রদ্ধা আছে একথা মান্‌বো না? শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। আমরা তো এই জানি, ভারতীয় চরিত্র ও ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজনীতির প্রতি সত্য মিথ্যা নানা উপায়ে অশ্রদ্ধা জাগিয়ে দিয়ে এই অর্থ সংগ্রহ হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ ভারতের প্রতি ইংরেজের যে-অবজ্ঞা, ইংরেজ ধর্ম্মব্যবসায়ীরা সর্ব্বদাই তা'র ভূমিকা-পত্তন ও ভিত্তি দৃঢ় ক'রে এসেচে, সেখানকার শিশুদের মনে তা'রা খৃষ্টের নাম ক'রে ভারতীয়ের প্রতি অপ্রীতির বীজ বপন ক'রেচে। সেই বড়ো হ'য়ে যখন শাসনকর্ত্তা হয় তখন জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডকেও ন্যায়সঙ্গত ব'লে বিচারকের আসন থেকে ঘোষণা ক'র্‌তে লজ্জা বোধ করে না। যেমন অশ্রদ্ধা তেম্‌নি কার্পণ্য। ... ...

আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে প্রধান ও সাধারণ আবরণ হ'চ্চে অভ্যাসের মোহ। এই অভ্যাসে চেতনায় যে-জড়তা আসে তাতে সত্যের অনন্তরূপ আনন্দরূপ দেখ্‌তে দেয় না। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে এই তত্ত্বটাকে আমরা একেবারেই অগ্রাহ্য ক'রেচি। ছাত্রদের প্রতিদিন একই ক্লাসে একই সময়ে একই বিষয় শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করানোর চেয়ে মনের জড়ত্বের কারণ আর কিছুই হ'তে পারে না। শিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রধানত

যে-বিতৃষ্ণা জন্মে শিক্ষার বিষয় কঠিন ব'লেই যে তা ঘটে তা সম্পূর্ণ সত্য নয়, শিক্ষাবিধি অত্যন্ত একঘেয়ে ব'লেই এটা সম্ভব হ'য়েচে। মানুষের প্রাণ যন্ত্রকে ব্যবহার ক'র্‌তে পারে, কিন্তু যন্ত্রকে আত্মীয় ক'র্‌তে পারে না; শিক্ষাকে যন্ত্র ক'রে তুল্‌লে তা'র থেকে কোনো বাহ্য ফলই হয় না তা নয়, কিন্তু সে-শিক্ষা আত্মগত হ'তে গুরুতর বাধা পায়।

আকস্মিক হ'চ্চে সীমার বাহিরেকার দূত, অভাবনীয়ের বার্ত্তা নিয়ে সে আসে, তাতেই আমাদের চেতনা জড়তা থেকে মুক্তির আনন্দ পায়। অভাবনীয়কে অনুভব করাতেই তা'র মুক্তি। বিশ্বের সর্ব্বত্রই সেই অভাবনীয়। এই অভাবনীয়কে বোধের মধ্যে আন্‌তে গেলে চিত্তকে প্রাণবান্ ক'রে রাখা চাই অর্থাৎ তাকে উৎসুক ক'রে তুল্‌তে হয়। এই ঔৎসুক্যই তাকে বদ্ধতার সীমার দিক থেকে বৃদ্ধির অসীমতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। অথচ প্রাণের এই ঔৎসুক্য নষ্ট ক'রে দিয়ে পুনরাবৃত্তির অন্ধ প্রদক্ষিণের জোয়ালে জোর ক'রে চিত্তকে জুড়ে দেওয়াকেই অনেকে ডিসিপ্লিন্ ব'লে গৌরব করেন। অর্থাৎ বিধাতা যে-মানুষকে প্রাণী ক'রেচে সেই মানুষকেই তাঁরা যন্ত্র ক'র্‌তে চান। সেটা হয় সিদ্ধির লোভে। যন্ত্র হ'চ্চে সিদ্ধিদেবীর বাহন, প্রাণকে পিষে সে প্রবল হয়। বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কোনো একটা সঙ্কীর্ণ ফল দেওয়াই তা'র কাজ। বিশ্বসত্যে নির্দ্দিষ্টের চারিদিকে যে অসীম অনির্দ্দিষ্ট আছে তাকে সে দেখ্‌তে পারে না, কেননা প্রাণকে সে কেবলি গণ্ডীর বাহিরে আহ্বান করে। গণ্ডীর বাহিরে বিধাতার

বাঁশি বাজে, ফলকামী সেই ধ্বনী রুদ্ধ ক'রে প্রাচীর তোলে।

আমার মতে শিক্ষার প্রণালী হ'চ্চে বৈরাগীর রাস্তায়। ছাত্রদের নিয়ে বিবাগী হ'য়ে বেরিয়ে প'ড়্তে হয়। চ'ল্তে চ'ল্তে নিয়ত নব নব বিস্ময়ে অজানার ভিতর দিয়ে জেনে চলাই হ'চ্চে প্রাণবান্ শিক্ষা। প্রাণের ছন্দের সঙ্গে এই শিক্ষা-প্রবাহের তাল মেলে। বদ্ধ ক্লাস হ'চ্চে প্রাণধর্ম্মী চিত্তের সহজজ্ঞানের পথে কঠিন বাধা। খাঁচার মধ্যে পাখীকে বাঁধা খোরাক খাওয়ানো যায়, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ পাখী হ'তে শেখানো যায় না। বনের পাখী ওড়ার সঙ্গে খাওয়ার মিল ক'রে আনন্দিত হয়। প্রকৃতির অভিপ্রায় ছিলো চলার সঙ্গে পাওয়ার মিল ক'রে মানুষকে শেখানো। কিন্তু হতভাগ্য মানবসন্তানের পক্ষে চলা বন্ধ ক'রে দিয়ে শেখানোই শিক্ষা-প্রণালী ব'লে গণ্য হ'য়েচে। তাতে কত ব্যর্থতা, কত দুঃখ তা'র হিসেব কে রাখে? আমি তো পথ-চলা শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা অনেকবার প্রস্তাব করেচি, কিন্তু কারো মন পাইনে। কারণ, যারা ভদ্রশিক্ষা পেয়েচে তা'রা বাঁধনের শিক্ষাকেই বিশ্বাস ক'র্তে শিখেচে। আমার ভাগ্য আমাকে শিক্ষায় বিবাগী ক'রেচে ব'লেই খোলা পথের শিক্ষার ধারাকেই আমি সব-চেয়ে সম্মান দিই।

১৫ই ফেব্রুয়ারী
ক্রাকোভিয়া
ভারতসাগর

শিশু যে-জগতে সঞ্চরণ করে তা'র প্রায় সমস্তই সে প্রবল ক'রে দেখে। জীবনে নানা অবান্তর বিষয় জ'মে উঠে তা'র দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি। যখন আমি শিশু ছিলুম তখন আমাদের ছাদের উপর দিয়ে গয়লাপাড়ার দৃশ্য প্রতিদিনই দেখেচি, প্রতিদিনই তা সম্পূর্ণ চোখে প'ড়েচে, প্রতিদিনই তা ছবি ছিলো। আমার দৃষ্টি আর আমার দৃষ্টির বিষয়ের মাঝখানে কোনো ভাবনা, অভ্যাসের কোনো জীর্ণতা আড়াল করেনি। আজ সেই গোয়ালপাড়া কতকটা তেম্‌নি ক'রে দেখ্‌তে হ'লে সুইজর্‌ল্যাণ্ডে যেতে হয়। সেখানে মন ভালো ক'রে স্বীকার করে, হঁা আছে।

শিশুর কাছে বিশ্ব খুব ক'রে আছে, আমরা বয়স্কেরা সে-কথা ভুলে যাই। এইজন্যে, শিশুকে কোনো ডিসিপ্লিনের ছাঁচে ঢালবার জন্যে যখন তাকে জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের নিজের বানানো কলের মধ্যে বন্ধ করি তখন তাকে যে কতখানি বঞ্চিত করি তা নিজের অভ্যাস-দোষেই বুঝ্‌তে পারিনে। বিশ্বের প্রতি তা'র এই একান্ত স্বাভাবিক ঔৎসুক্যের ভিতর দিয়েই-যে তাকে শিক্ষা দিতে হবে নিতান্ত গোঁয়ারের মতো সে-কথা আমরা মানিনে। তা'র ঔৎসুক্যের

আলো নিবিয়ে তা'র মনটা অন্ধকার ক'রে দিয়ে শিক্ষার জন্যে তাকে এডুকেশন-জেলখানার দারোগার হাতে সমর্পণ ক'রে দেওয়াই আমরা পন্থা ব'লে জেনেচি। বিশ্বের সঙ্গে মানুষের মনের যে-স্বাভাবিক সম্বন্ধ, এই উপায়ে সেটাকে কঠোর শাসনে শিশুকাল থেকেই নষ্ট ও বিকৃত ক'রে দিই। ... ...

ছবি ব'ল্‌তে আমি কী বুঝি সেই কথাটাই আর্টিষ্টকে খোলসা ক'রে ব'ল্‌তে চাই।

মোহের কুয়াশায় অভ্যাসের আবরণে সমস্ত মন দিয়ে জগৎটাকে "আছে" ব'লে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার আমরা না পাই অবকাশ, না পাই শক্তি। সেইজন্য জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমরা নিখিলকে পাশ কাটিয়েই চ'লেচি। সত্তার বিশুদ্ধ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'য়েই মারা গেলুম।

ছবি, পাশ কাটিয়ে যেতে, আমাদের নিষেধ করে। যদি সে জোর গলায় ব'ল্‌তে পারে, "চেয়ে দেখো", তাহ'লেই মন স্বপ্ন থেকে সত্যের মধ্যে জেগে ওঠে। কেননা, যা আছে তাই সৎ, যেখানেই সমস্ত মন দিয়ে তাকে অনুভব করি সেখানেই সত্যের স্পর্শ পাই।

কেউ না ভেবে বসেন, যা চোখে ধরা পড়ে তাই সত্য। সত্যের বাহিরে ব্যাপ্তি অতীতে ভবিষ্যতে, দৃশ্যে অদৃশ্যে, বাহিরে অন্তরে। আর্টিষ্ট সত্যের সেই পূর্ণতা যে-পরিমাণে সাম্‌নে ধ'র্‌তে পারে, "আছে" ব'লে মনের সায় সেই পরিমাণে প্রবল, সেই পরিমাণে স্থায়ী হয়; তাতে আমাদের ঔৎসুক্য সেই পরিমাণে অক্লান্ত, আনন্দ সেই পরিমাণে গভীর হ'য়ে ওঠে।

আসল কথা, সত্যকে উপলব্ধির পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে একটা অনুভূতি আছে, সেই অনুভূতিকেই আমরা সুন্দরের অনুভূতি বলি। গোলাপ-ফুলকে সুন্দর বলি এইজন্যেই যে, গোলাপ-ফুলের দিকে আমার মন যেমন ক'রে চেয়ে দেখে ইঁটের ঢেলার দিকে তেমন ক'রে চায় না। গোলাপ-ফুল আমার কাছে তা'র ছন্দে রূপে সহজেই সত্তা-রহস্যের কী একটা নিবিড় পরিচয় দেয়। সে কোনো বাধা দেয় না। প্রতিদিন হাজার জিনিষকে যা না বলি, তাকে তাই বলি; বলি, তুমি আছ।

একদিন আমার মালী ফুলদানি থেকে বাসি ফুল ফেলে দেবার জন্যে যখন হাত বাড়ালো, বৈষ্ণবী তখন ব্যথিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো, "লিখ্‌তে পড়তেই তোমার সমস্ত মন লেগে আছে, তুমি তো দেখ্‌তে পাও না।" তখনি চম্‌কে উঠে আমার মনে প'ড়ে গেলো, হাঁ, তাইতো বটে। ঐ "বাসি" ব'লে একটা অভ্যস্ত কথার আড়ালে ফুলের সত্যকে আর আমি সম্পূর্ণ দেখ্‌তে পাইনে। যে আছে সেও আমার কাছে নেই,—নিতান্তই অকারণে, সত্য থেকে, সুতরাং আনন্দ থেকে, বঞ্চিত হলুম। বৈষ্ণবী সেই বাসী ফুলগুলিকে অঞ্চলের মধ্যে সংগ্রহ ক'রে তাদের চুম্বন ক'রে নিয়ে চ'লে গেলো।

আর্টিষ্ট তেম্‌নি ক'রে আমাদের চমক লাগিয়ে দিক্। তা'র ছবি বিশ্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে দিয়ে বলুক্, "ঐ দেখো, আছে।" সুন্দর ব'লেই আছে তা' নয়, আছে ব'লেই সুন্দর।

সত্তাকে সকলের চেয়ে অব্যবহিত ও সুস্পষ্ট ক'রে অনুভব করি আমার নিজের মধ্যে। "আছি" এই ধ্বনিটি নিয়তই আমার মধ্যে বাজ্‌চে। তেম্‌নি স্পষ্ট ক'রে যেখানেই আমরা ব'ল্‌তে পারি "আছে" সেখানেই তা'র সঙ্গে কেবল আমার ব্যবহারের অগভীর মিল নয় আত্মার গভীরতম মিল হয়। "আছি" অনুভূতিতে আমার যে-আনন্দ, তা'র মানে এ নয় যে, আমি মাসে হাজার টাকা রোজকার করি বা হাজার লোকে আমাকে বাহবা দেয়। তা'র মানে হ'চ্চে এই যে, আমি যে সত্য এটা আমার কাছে নিঃসংশয়, তর্ক-করা সিদ্ধান্তের দ্বারা নয়, নির্ব্বিচার একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। বিশ্বে যেখানে তেমনি একান্তভাবে "আছে" এই উপলব্ধি করি সেখানে আমার সত্তার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়। সত্যের ঐক্যকে সেখানে ব্যাপক ক'রে জানি।

কোনো ফরাসী দার্শনিক অসীমের তিনটি ভাব নির্ণয় ক'রেচেন—the True, the Good, the Beautiful। ব্রাহ্মসমাজে তা'রই একটি সংস্কৃত তর্জ্জমা খুব চল্‌তি হ'য়েচে—সত্য শিবং সুন্দরং। এমন-কি, অনেকে মনে করেন এটি উপনিষদের বাণী। উপনিষৎ সত্যের স্বরূপ যে ব্যাখ্যা ক'রেচেন, সে হ'চ্চে, শান্তং শিবং অদ্বৈতং। শান্তং হ'চ্চে সেই সামঞ্জস্য, যার যোগে সমস্ত গ্রহতারা নিয়ে বিশ্ব শান্তিতে বিধৃত, যার যোগে কালের গতি চিরন্তন ধৃতির মধ্যে নিয়মিত, "নিমেষা মুহূর্ত্তাণ্যর্দ্ধমাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি"।—শিবং হ'চ্চে মানব-সমাজের মধ্যে সেই সামঞ্জস্য

যা নিয়তই কল্যাণের মধ্যে বিকাশ লাভ ক'র্‌চে, যার অভিমুখে মানুষের চিত্তের এই প্রার্থনা যুগে যুগে সমস্ত বিরোধের মধ্য দিয়েও গূঢ়ভাবে ও প্রকাশ্যে ধাবিত হ'চ্চে; অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়; আর অদ্বৈতং হ'চ্চে আত্মার মধ্যে সেই ঐক্যের উপলব্ধি যা বিচ্ছেদের ও বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে আনন্দে প্রেমে নিয়ত আত্মীয়তাকে ব্যাপ্ত ক'র্‌চে।

যাঁদের মন খৃষ্টীয়ানতত্ত্বের আবহাওয়াতে অত্যন্ত অভ্যস্ত তাঁরা উপনিষদ্ সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে থাকেন, খৃষ্টীয়ান দার্শনিকদের নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে উপনিষদের বাণীকে কিছু-না-কিছু বদল ক'রে চালিয়ে দেওয়া তাঁদের ভিতরকার ইচ্ছা। কিন্তু "শান্তং শিবং অদ্বৈতং" এই মন্ত্রটিকে চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেই তাঁরা এই আশ্বাস পাবেন যে, অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের অভাবের কথা বলা হ'চ্চে না, অসীমের মধ্যে দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য এইটেই তাৎপর্য্য। কারণ, বিপ্লব না থাক্‌লে শান্তির কোনো মানেই নেই, মন্দ না থাক্‌লে ভালো একটা শব্দমাত্র, আর বিচ্ছেদ না থাক্‌লে অদ্বৈত নিরর্থক। তাঁরা যখন সত্যের ত্রিগুণাত্মক ধ্যানের মন্ত্র স্বরূপে সত্যং শিবং সুন্দরং বাক্যটি ব্যবহার করেন তখন তাঁদের বোঝা উচিত যে, সত্যকে সত্য বলাই বাহুল্য এবং সুন্দর সত্যের একটা তত্ত্ব নয়, আমাদের অনুভূতিগত বিশেষণ মাত্র, সত্যের তত্ত্ব হ'চ্চে অদ্বৈত। যে-সত্য বিশ্ব-প্রকৃতি লোক-সমাজ ও মানবাত্মা পূর্ণ ক'রে আছেন তাঁর স্বরূপকে ধ্যান কর্‌বার সহায়তাকল্পে শান্তং শিবং অদ্বৈতং মন্ত্রটি যেমন

সম্পূর্ণ উপযোগী এমন আমি তো আর কিছুই জানিনে। মানবসমাজে যখন শিবকে পাবার সাধনা করি তখন কল্যাণের উপলব্ধিকে শান্তং আর অদ্বৈতং এই দুইএর মাঝখানে রেখে দেখি; অর্থাৎ ইংরেজিতে ব'ল্‌তে গেলে law এবং loveএর পূর্ণতাই হ'চ্চে সমাজের welfare।

আমাদের চিত্তের মধ্যে তামসিকতা আছে, সেইজন্ম বিশ্বকে দেখার বাধা হ'চ্চে। কিন্তু মানুষের মন তো বাধাকে মেনে ব'সে থাক্‌বে না। এই বাধার ভিতর দিয়ে কেবলি দেখার পথ ক'র্‌তে হবে। মানুষ যতদিন আছে ততদিনই এই পথ-খোদা চ'লে আস্‌চে। মানুষ অন্ন বস্ত্র সংগ্রহ ক'র্‌চে; মানুষ বাসা বাঁধ্‌চে, তা'র সঙ্গে সঙ্গেই কেবলমাত্র সত্তার গভীর টানে আত্মা দিয়ে দেখার দ্বারা বিশ্বকে আপন ক'রে চ'ল্‌চে। তাকে জানার দ্বারা নয়, ব্যবহারের দ্বারা নয়; সম্পূর্ণ ক'রে দেখার দ্বারা, ভোগের দ্বারা নয়; যোগের দ্বারা।

আর্টিষ্ট্‌ আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেম, আর্টের সাধনা কী? আর্টের একটা বাইরের দিক আছে সেটা হ'চ্চে আঙ্গিক, টেক্‌নীক্‌, তা'র কথা ব'ল্‌তে পারিনে। কিন্তু ভিতরের কথা জানি। সেখানে জায়গা পেতে চাও যদি তাহ'লে সমস্ত চিত্ত দিয়ে দেখো, দেখো, দেখো।

অর্থাৎ বিশ্বের যেখানে প্রকাশের ধারা, প্রকাশের লীলা, সেখানে যদি মনটাকে সম্পূর্ণ ক'রে ধরা দিতে পারো তাহ'লেই অন্তরের মধ্যে প্রকাশের বেগ সঞ্চারিত হয়—আলো থেকেই আলো জ্বলে। দেখ্‌তে-পাওয়া মানে হ'চ্চে প্রকাশকে

পাওয়া। সংবাদ গ্রহণ করা এক জিনিষ আর প্রকাশকে গ্রহণ করা আর-এক জিনিষ। বিশ্বের প্রকাশকে মন দিয়ে গ্রহণ করাই হ'চ্চে আর্টিষ্টের সাধনা—তাতেই প্রকাশের শক্তি সচেষ্ট হ'য়ে ওঠে, প্রকাশের আঙ্গিক পদ্ধতি তা'র সঙ্গে-সঙ্গেই অনেকটা আপনি এসে পড়ে, কতকটা শিক্ষা ও চর্চ্চার দ্বারা নৈপুণ্যকে পাকিয়ে তোলা যায়। এইটুকু সাধনা ক'র্‌তে হবে, হাতিয়ারের বোঝা যেন হাতটার উপর দৌরাত্ম্য না করে, সহজ-স্রোতকে আটক ক'রে রেখে কষ্টকল্পিত পন্থাটাই যেন বাহবা নেবার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে না ওঠে। বিশ্বপ্রবাহের প্রবাহিনীর মধ্যে গলা ডুবিয়ে তা'রই কলধ্বনি থেকে প্রকাশের মন্ত্র অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করো, তা'রই ধারার ছন্দ তোমার রক্তের স্রোতে আপন তাল বেঁধে দেবে—এই হ'লো গোড়াকার কথা ; এই হ'লো বর্ষণ, তা'র পরে তোমার যদি আধার থাকে তো ভ'রে উঠ্‌বে—এই হ'লো আগুন, প্রদীপ বের ক'র্‌তে পারো যদি তো শিখা জ্বল্‌বার জন্যে ভাবনা থাক্‌বে না।

জাভা-যাত্রীর পত্র

জাভা-যাত্রীর পত্র

(১)

শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

কল্যাণীয়াসু

যাত্রা যখন আরম্ভ করা গেলো আকাশ থেকে বর্ষার পর্দ্দা তখন সরিয়ে দিয়েচে ; সূর্য্য আমাকে অভিনন্দন ক'রলেন। ক'লকাতা থেকে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যতদূর গেলুম, রেলগাড়ির জান্‌লা দিয়ে চেয়ে চেয়ে মনে হ'লো পৃথিবীতে সবুজের বান ডেকেচে। শ্যামলের বাঁশিতে তানের পর তান লাগ্‌চে তা'র আর বিরাম নেই। ক্ষেতে ক্ষেতে নতুন ধানের অঙ্কুরে কাঁচা রং, বনে বনে রস-পরিপুষ্ট প্রচুর পল্লবের ঘন সবুজ। ধরণীর বুকের থেকে অহল্যা জেগে উঠেচেন, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের পায়ের স্পর্শ লাগ্‌লো।

প্রকৃতির এই নব জীবনের উৎসবে রূপের উত্তরে রসের গান গাবার জন্যেই আমি এসেছিলুম এই কথাই কেবল মনে পড়ে। কাজের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, তা'র দরকার কী? বলে, ওটা সৌখীনতা। অর্থাৎ এই প্রয়োজনের সংসারে আমরা বাহুল্যের দলে। তাতে লজ্জা পাবো না। কেননা এই বাহুল্যের দ্বারাই আত্মপরিচয়।

হিসাবী লোকেরা একটা কথা বারবার ভুলে যায় যে, প্রচুরের সাধনাতেই প্রয়োজনের সিদ্ধি; এই আষাঢ়ের পৃথিবীতে সেই কথাটাই জানালো। আমি চাই ফসল, যেটুকুতে আমার পেট ভ'র্‌বে। সেই স্বল্প প্রত্যাশাকে মূর্ত্তিমান দেখি তখনি যখন বর্ষণে অভিষিক্ত মাটির ভাণ্ডারে শ্যামল ঐশ্বর্য্য আমার প্রয়োজনকে অনেক বেশি ছাপিয়ে পড়ে। মুষ্টি-ভিক্ষাও জোটেনা যখন ধনের সঙ্কীর্ণতা সেই মুষ্টিকে না ছাড়িয়ে যায়। প্রাণের কারবারে প্রাণের মুনফাটাই লক্ষ্য, এই মুনফাটাই বাহুল্য। আমাদের সন্ন্যাসী মানুষেরা এই বাহুল্যটাকে নিন্দা করে; এই বাহুল্যকেই নিয়ে কবিদের উৎসব। খরচপত্র বাদেও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত যদি থাকে তবেই সাহস ক'রে খরচপত্র চলে এই কথাটা মানি ব'লে আমরা মুনফা চাই। সেটা ভোগের বাহুল্যের জন্যে নয়, সেটা সাহসের আনন্দের জন্যে। মানুষের বুকের পাটা যাতে বাড়ে তাতেই মানুষকে কৃতার্থ করে।

বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপেই মানুষকে দেখি যার প্রাণের মুনফা নানা খাতায় কেবলি বেড়ে চ'লেচে। এই জন্যেই পৃথিবীতে এত ঘটা ক'রে সে আলো জ্বাল্‌লো। সেই আলোতে সে সকল দিকে প্রকাশমান। অল্প তেলে কেবল একটি মাত্র প্রদীপে ঘরের কাজ চ'লে যায়, কিন্তু পূরো মানুষটা তাতে অপ্রকাশিত থাকে। এই অপ্রকাশ অস্তিত্বের কার্পণ্য, কম ক'রে থাকা। এটা মানব-সত্যের' অবসাদ। জীবলোকে মানুষরা জ্যোতিষ্ক জাতীয়; জন্তুরা কেবলমাত্র বেঁচে থাকে,

তাদের অস্তিত্ব দীপ্ত হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু মানুষ কেবল-যে আত্মরক্ষা ক'র্‌বে তা নয়, সে আত্মপ্রকাশ ক'র্‌বে। এই প্রকাশের জন্যে আত্মার দীপ্তি চাই। অস্তিত্বের প্রাচুর্য্য থেকে, অস্তিত্বের ঐশ্বর্য্য থেকেই এই দীপ্তি। বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপই সকল দিকে আপনার রশ্মি বিকীর্ণ ক'রেচে, তাই মানুষ সেখানে কেবল-যে টিঁকে আছে তা নয়, টি কে থাকার চেয়ে আরো অনেক বেশি ক'রে আছে। পর্য্যাপ্তে চলে আত্মরক্ষা, অপর্য্যাপ্তে আত্মপ্রকাশ। য়ুরোপে জীবন অপর্য্যাপ্ত।

এটাতে আমি মনে দুঃখ করিনে। কারণ যে-দেশেই যে-কালেই মানুষ কৃতার্থ হোক্ না কেন সকল দেশের সকল কালের মানুষকেই সে কৃতার্থ করে। য়ুরোপ আজ প্রাণ-প্রাচুর্য্যে সমস্ত পৃথিবীকেই স্পর্শ ক'রেচে। সর্ব্বত্রই মানুষের সুপ্ত শক্তির দ্বারে তা'র আঘাত এসে প'ড়্‌লো। প্রভূতের দ্বারাই তা'র প্রভাব।

য়ুরোপ সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালকে-যে স্পর্শ ক'রেচে সে তা'র কোন্ সত্য দ্বারা? তা'র বিজ্ঞান সেই সত্য। তা'র যে-বিজ্ঞান মানুষের সমস্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রকে অধিকার ক'রে কর্ম্মের ক্ষেত্রে জয়ী হ'য়েচে সে একটা বিপুল শক্তি। এইখানে তা'র চাওয়ার অন্ত নেই, তা'র পাওয়াও সেই পরিমাণে। গত বছর য়ুরোপ থেকে আস্‌বার সময় একটি জর্ম্মন যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি তাঁর অল্প বয়সের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে আস্‌ছিলেন। মধ্য-

ভারতের আরণ্য প্রদেশে যে-সব জাতি প্রায় অজ্ঞাতভাবে আছে দুরৎসর তাদের মধ্যে বাস ক'রে তাদের রীতিনীতি তন্ন তন্ন ক'রে জান্‌তে চান্। এরই জন্যে তাঁরা দুর্জনে প্রাণ পণ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হন নি। মানুষ-সম্বন্ধে মানুষকে আরো জান্‌তে হবে, সেই আরো-জানা বর্ব্বর জাতির সীমার কাছে এসেও থামে না। সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়কে এই রকম সঙ্ঘ-বদ্ধ ক'রে জানা, ব্যূহ-বদ্ধ ক'রে সংগ্রহ করা, জান্‌বার সাধনায় মনকে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত করা, এতে ক'রে মানুষ-যে কত প্রকাণ্ড বড়ো হ'য়েচে য়ুরোপে গেলে তা বুঝ্‌তে পারা যায়। এই শক্তি দ্বারা পৃথিবীকে য়ুরোপ মানুষের পৃথিবী ক'রে সৃষ্টি ক'রে তুল্‌চে। যেখানে মানুষের পক্ষে যা-কিছু বাধা আছে তা' দূর করবার জন্যে সে যে-শক্তি প্রয়োগ ক'র্‌চে তাকে যদি আমরা সাম্‌নে মূর্ত্তিমান ক'রে দেখ্‌তে পেতুম তাহ'লে তা'র বিরাটরূপে অভিভূত হ'তে হ'তো।

এইখানে য়ুরোপের প্রকাশ যেমন বড়ো, যাকে নিয়ে সকল মানুষ গর্ব্ব ক'র্‌তে পারে, তেমনি তা'র এমন একটা দিক আছে যেখানে তা'র প্রকাশ আচ্ছন্ন। উপনিষদে আছে, যে-সাধকেরা সিদ্ধিলাভ ক'রেচেন, "তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি" তাঁরা সর্ব্বগামী সত্যকে সকল দিক থেকে লাভ ক'রে যুক্তাত্মভাবে সমস্তের মধ্যে প্রকাশ করেন। সত্য সর্ব্বগামী ব'লেই মানুষকে সকলের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেয়। বিজ্ঞান বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে মানুষের প্রবেশ-পথ খুলে দিচ্চে; কিন্তু আজ সেই য়ুরোপে

এমন একটি সত্যের অভাব ঘ'টেচে যাতে মানুষের মধ্যে মানুষের প্রবেশ অবরুদ্ধ করে। অন্তরের দিকে য়ুরোপ মানুষের পক্ষে একটা বিশ্বব্যাপী বিপদ হ'য়ে উঠ্‌লো। এইখানে বিপদ তা'র নিজেরও।

এই জাহাজেই একজন ফরাসী লেখকের সঙ্গে আমার আলাপ হ'লো। তিনি আমাকে ব'ল্‌ছিলেন যুদ্ধের পর থেকে য়ুরোপের নবীন যুবকদের মধ্যে বড়ো ক'রে একটা ভাবনা ঢুকেচে। এই কথা তা'রা বুঝেচে, তাদের আইডিয়ালে একটা ছিদ্র দেখা দিয়েছিলো যে-ছিদ্র দিয়ে বিনাশ ঢুক্‌তে পার্‌লে। অর্থাৎ কোথাও তা'রা সত্যভ্রষ্ট হ'লো এতদিনে সেটা ধরা প'ড়েচে।

মানুষের জগৎ অমরাবতী, তা'র যা সত্য-ঐশ্বর্য্য তা দেশে কালে পরিমিত নয়। নিজের জন্য নিয়ত মানুষ এই-যে অমর-লোক সৃষ্টি ক'র্‌চে তা'র মূলে আছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা কর্‌বার অসীম সাহস। কিন্তু বড়োকে গড়্‌বার উপকরণ মানুষের ছোটো যেই চুরি ক'র্‌তে সুরু করে অমনি বিপদ ঘটায়। মানুষের চাইবার অন্তহীন শক্তি যখন সঙ্কীর্ণ পথে আপন ধারাকে প্রবাহিত ক'র্‌তে থাকে তখনই কূল ভাঙে, তখনি বিনাশের বন্যা দুর্দ্দাম হ'য়ে ওঠে। অর্থাৎ মানুষের বিপুল চাওয়া ক্ষুদ্র-নিজের জন্যে হ'লে তাতেই যত অশান্তির সৃষ্টি। যেখানে তা'র সাধনা সকলের জন্যে সেইখানেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা কৃতার্থ হয়। এই সাধনাকেই গীতা যজ্ঞ ব'লেচেন; এই যজ্ঞের দ্বারাই লোকরক্ষা। এই যজ্ঞের পন্থা হ'চ্চে

নিষ্কাম কৰ্ম্ম। সে-কৰ্ম্ম তুৰ্ব্বল হবে না, সে-কৰ্ম্ম ছোটো হবে না, কিন্তু সে-কৰ্ম্মের ফল-কামনা যেন নিজের জন্যে না হয়।

বিজ্ঞান যে-বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্ত্তন ক'রেচে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের,—এই জন্যেই মানুষকে তাতে দেবতার শক্তি দিয়েচে, সকল রকম দুঃখ দৈন্য পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর কর্‌বার জন্যে সে অস্ত্র গ'ড়্‌চে ; মানুষের অমরাবতী নির্ম্মাণের বিশ্বকর্ম্মা এই বিজ্ঞান। কিন্তু এই বিজ্ঞানই কর্ম্মের রূপে যেখানে মানুষের ফল-কামনাকে অতিকায় ক'রে তুল্‌লে সেইখানেই সে হ'লো যমের বাহন। এই পৃথিবীতে মানুষ যদি একেবারে মরে তবে সে এই জন্যেই ম'র্‌বে,—সে সত্যকে জেনেছিলো কিন্তু সত্যের ব্যবহার জানে নি। সে দেবতার শক্তি পেয়েছিলো, দেবত্ব পায় নি। বর্ত্তমান যুগে মানুষের মধ্যে সেই দেবতার শক্তি দেখা দিয়েচে য়ুরোপে। কিন্তু সেই শক্তি কি মানুষকে মারবার জন্যেই দেখা দিলো? গত য়ুরোপের যুদ্ধে এই প্রশ্নটাই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে প্রকাশ পেয়েচে। য়ুরোপের বাইরে সর্ব্বত্রই য়ুরোপ বিভীষিকা হ'য়ে উঠেচে তা'র প্রমাণ আজ এসিয়া আফ্রিকা জুড়ে। য়ুরোপ আপন বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের মধ্যে আসে নি, এসেচে আপন কামনা নিয়ে। তাই এসিয়ার হৃদয়ের মধ্যে য়ুরোপের প্রকাশ অবরুদ্ধ। বিজ্ঞানের স্পর্দ্ধায় শক্তির গর্ব্বে, অর্থের লোভে পৃথিবী জুড়ে মানুষকে লাঞ্ছিত কর্‌বার এই-যে চর্চ্চা বহুকাল থেকে য়ুরোপ ক'র্‌চে, নিজের ঘরের মধ্যে এর ফল যখন ফল্‌লো তখন আজ সে উদ্বিগ্ন। তৃণে আগুন লাগাচ্ছিলো,

আজ তা'র নিজের বনস্পতিতে সেই আগুন লাগ্‌লো। সে ভাব্‌চে থাম্‌বো কোথায়? সে থামা কি যন্ত্রকে থামিয়ে দিয়ে? আমি তা বলিনে। থামাতে হবে লোভ। সে কি ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়ে হবে? তাও সম্পূর্ণ হবে না। তা'র সঙ্গে বিজ্ঞানেরও যোগ চাই। যে-সাধনায় লোভকে ভিতরের দিক থেকে দমন করে সে-সাধনা ধর্ম্মের, কিন্তু যে-সাধনায় লোভের কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে-সাধনা বিজ্ঞানের। দুইয়ের সম্মিলনে সাধনা সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে ধর্ম্ম-বুদ্ধির আজ মিলনের অপেক্ষা আছে।

জাভায় যাত্রাকালে এই সমস্ত তর্ক আমার মাথায় কেন এলো জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারো। এর কারণ হ'চ্চে এই যে,—ভারতবর্ষের বিদ্যা একদিন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিলো। কিন্তু সেই বাইরের লোক তাকে স্বীকার ক'রেচে। তিব্বত মঙ্গোলিয়া মালয়দ্বীপসকলে ভারতবর্ষ জ্ঞান-ধর্ম্ম বিস্তার করেছিলো মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সত্য-সম্বন্ধের পথ দিয়ে। ভারতবর্ষের সেই সর্ব্বত্র-প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখ্‌বার জন্যে আজ আমরা তীর্থযাত্রা ক'রেচি। সেই সঙ্গে এই কথাও দেখ্‌বার আছে সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করেনি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্য্যকে সকল দিকে উদ্বোধিত ক'রেছিলো, স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে চিত্রে সঙ্গীতে সাহিত্যে;—তারি চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে পর্ব্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে দুঃসাধ্য কল্পনায়। সন্ন্যাসীর যে-মন্ত্র মানুষকে রিক্ত ক'রে নগ্ন করে, মানুষের যৌবনকে পঙ্গু

করে, মানব-চিত্তবৃত্তিকে নানাদিকে খর্ব্ব করে এ সে-মন্ত্র নয়। এ জরাজীর্ণ কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয়, এর মধ্যে পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্য্যবান যৌবনের প্রভাব।

১ শ্রাবণ ১৩৩৪।

(২)

শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত—

কল্যাণীয়াসু

দেশ থেকে বেরোবার মুখে আমার উপর ফরমাস এলো কিছু-কিছু লেখা পাঠাতে হবে। কাকে পাঠাব লেখা, কে প'ড়্বে? সর্ব্বসাধারণ? সর্ব্বসাধারণকে বিশেষ ক'রে চিনিনে। এই জন্যে তা'র ফরমাসে যখন লিখি তখন শক্ত ক'রে বাঁধানো খুব একটা সাধারণ খাতা খুলে লিখ্তে হয়, সে-লেখার দাম খতিয়ে হিসেব কষা চলে।

কিন্তু মানুষের একটা বিশেষ খাতা আছে তা'র আল্‌গা পাতা,—সেটা যা-তা লেখবার জন্যে, সে-লেখার দামের কথা কেউ ভাবেও না। লেখাটাই তা'র লক্ষ্য, কথাটা উপলক্ষ্য। সে-রকম লেখা চিঠিতে ভালো চলে; আটপৌরে লেখা,—

তা'র না আছে মাথায় পাগ্‌ড়ি, না আছে পায়ে জুতো। পরের কাছে পরের বা নিজের কোনো দরকার নিয়ে সে যায় না; সে যায় যেখানে বিনা-দরকারে গেলেও জবাবদিহি নেই,— যেখানে কেবল ব'কে যাওয়ার জন্যেই যাওয়া-আসা।

স্রোতের জলের যে-ধ্বনি সেটা তা'র চলারই ধ্বনি, উড়ে-চলা মৌমাছির পাখার যেমন গুঞ্জন। আমরা যেটাকে বকুনি বলি সেটাও সেই মানসিক চ'লে যাওয়ারই শব্দ। চিঠি হ'চ্চে লেখার অক্ষরে ব'কে যাওয়া।

এই ব'কে যাওয়াটা মনের জীবনের লীলা। দেহটা কেবলমাত্র চল্‌বার জন্যেই বিনা-প্রয়োজনে মাঝে মাঝে এক-একবার ধাঁ ক'রে চ'লে ফিরে আসে। বাজার কর্‌বার জন্যেও নয়, সভা কর্‌বার জন্যেও নয়, নিজের চলাতেই সে নিজে আনন্দ পায় ব'লে। তেম্‌নি নিজের বকুনিতেই মন জীবন-ধর্ম্মের তৃপ্তি পায়। তাই বকবার অবকাশ চাই, লোক চাই। বক্তৃতার জন্যে লোক চাই অনেক, বকার জন্যে এক-আধজন।

দেশে অভ্যস্ত জায়গায় থাকি নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে, জানা অজানা লোকের ভিড়ে। নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ করবার সময় থাকেনা। সেখানে নানা লোকের সঙ্গে নানা কেজো কথা নিয়ে কারবার। সেটা কেমনতরো? যেন বাঁধা পুকুরের ঘাটে দশজনে জটলা ক'রে জল ব্যবহার। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা চাতকের ধর্ম্ম আছে; হাওয়ায় উড়ে-আসা মেঘের বর্ষণের জন্যে সে চেয়ে থাকে একা একা। মনের আকাশে উড়ো ভাবনাগুলো সেই মেঘ,—সেটা

খামখেয়ালের ঝাপটা লেগে; তা'র আবির্ভাব তিরোভাব সবই আকস্মিক। প্রয়োজনের তাগিদ-মতো তাকে বাঁধা-নিয়মে পাওয়া যায় না ব'লেই তা'র বিশেষ দাম। পৃথিবী আপনারই বাঁধা জলকে আকাশে উড়ো জল ক'রে দেয়—নিজের ফসল-ক্ষেত্রকে সরস কর্‌বার জন্যে সেই জলের দরকার। বিনা প্রয়োজনে নিজের মনকে কথা বলাবার সেই প্রয়োজন. সেটাতে মন আপন ধারাতেই আপনাকে অভিষিক্ত করে।

জীবনযাত্রার পরিচিত ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে মন আজ যা'-তা' ভাব্‌বার সময় পেলো। তাই ভেবেচি কোনো সম্পাদকী বৈঠক স্মরণ ক'রে প্রবন্ধ আওড়াবো না, চিঠি লিখ্‌বো তোমাকে। অর্থাৎ পাত পেড়ে ভোজ দেওয়া তাকে বলা চ'ল্‌বেনা, সে হবে গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাওয়ায় প'ড়ে-যাওয়া ফল আঁচলে ভ'রে দেওয়া। তা'র কিছু পাকা কিছু কাঁচা, তা'র কোনোটাতে রঙ ধ'রেচে, কোনোটাতে ধরেনি। তা'র কিছু রাখ্‌লেও চলে, কিছু ফেলে দিলেও নালিশ চ'ল্‌বে না।

সেই ভাবেই চিঠি লিখ্‌তে সুরু ক'রেছিলুম। কিন্তু আকাশের আলো দিলে মুখ-ঢাকা। বৈঠকখানার আসর বন্ধ হ'য়ে গেলে ফরাস বাতি নিবিয়ে দিয়ে যেমন ঝাড়লণ্ঠনে ময়লা রঙের ঘেরাটোপ পরিয়ে দেয়, দ্যুলোকের ফরাস সেই কাণ্ডটা ক'র্‌লে; একটা ফিকে ধোঁয়াটে রঙের আবরণ দিয়ে আকাশ-সভার তৈজসপত্র দিলে মুড়ে। এই অবস্থায় আমার মন তা'র হাল্‌কা কলমের খেলা আপনিই বন্ধ ক'রে দেয়। বকুনির কূলহারা ঝর্‌না বাক্যের নদী হ'য়ে কখন্ এক সময়

গভীর খাদে চ'ল্‌তে আরম্ভ করে, তখন তা'র চলাটা কেবলমাত্র সূর্য্যের আলোয় কলধ্বনির নূপুর বাজানোর জন্যে নয়, একটা কোনো লক্ষ্যে পৌঁছ'বার সাধনায়। আনমনা সাহিত্য তখন লোকালয়ের মাঝখানে এসে প'ড়ে সমনস্ক হ'য়ে ওঠে। তখন বাণীকে অনেক বেশি অতিক্রম ক'রে ভাবনাগুলো মাথা তুলে দাঁড়ায়।

উপনিষদে আছে, স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা,—তিনি ভালোবাসেন, তিনি সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই বিধান করেন। সৃষ্টি-করাটা সহজ আনন্দের খেয়ালে, বিধান-করায় চিন্তা আছে। যাকে খাষ সাহিত্য বলে সেটা হ'লো সেই সৃষ্টিকর্ত্তার এলেকায়, সেটা কেবল আপন-মনে। যদি কোনো হিসাবী লোক স্রষ্টাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, "কেন সৃষ্টি করা হ'লো" তিনি জবাব দেন, "আমার খুসি"! সেই খুসিটাই নানারঙে নানারসে আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত হ'য়ে ওঠে। পদ্মফুলকে যদি জিজ্ঞাসা করো, "তুমি কেন হ'লে?" সে বলে, "আমি হবার জন্যেই হ'লুম।" খাঁটি সাহিত্যেরও সেই একটি মাত্র জবাব।

অর্থাৎ সৃষ্টির একটা দিক আছে যেটা হ'চ্চে সৃষ্টিকর্ত্তার বিশুদ্ধ বকুনি। সেদিক থেকে এমনও বলা যেতে পারে, তিনি আমাকে চিঠি লিখ্‌চেন। আমার কোনো চিঠির জবাবে নয়, তাঁর আপনার ব'ল্‌তে ইচ্ছে হ'য়েচে ব'লে; কাউকে তো বলা চাই। অনেকেই মন দিয়ে শোনে না, অনেকে বলে এ তো সারবান নয়; এ তো বন্ধুর আলাপ, এ তো

সম্পত্তির দলিল নয়। সারবান থাকে মাটির গর্ভে, সোনার খনিতে, সে নেই ফুলের বাগানে, নেই সে উদয়-দিগন্তে মেঘের মেলায়। আমি একটা গর্ব্ব ক'রে থাকি, ঐ চিঠি-লিখিয়ের চিঠি প'ড়্‌তে পারৎপক্ষে কখনো ভুলিনে। বিশ্ব-বকুনী যখন-তখন আমি শুনে থাকি। তাতে বিষয়-কাজের ক্ষতি হ'য়েচে, আর যারা আমাকে দলে ভিড়িয়ে কাজে লাগাতে চায় তাদের কাছ থেকে নিন্দাও শুনেচি; কিন্তু আমার এই দশা।

অথচ মুস্কিল হ'য়েচে এই যে, বিধাতাও আমাকে ছাড়েন নি। সৃষ্টিকর্ত্তার লীলাঘর থেকে বিধাতার কারখানাঘর পর্য্যন্ত যে-রাস্তাটা গেচে সে-রাস্তায় দুই প্রান্তেই আমার আনাগোনার কামাই নেই।

এই দোটানায় প'ড়ে আমি একটা কথা শিখেচি। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা স এব বিধাতা, সেই জন্যেই তাঁর সৃষ্টি ও বিধান এক হ'য়ে মিশেচে, তাঁর লীলা ও কাজ এই দুয়ের মধ্যে একান্ত বিভাগ পাওয়া যায় না। তাঁর সকল কর্ম্মই কারুকর্ম্ম, ছুটিতে খাটুনিতে গড়া; কর্ম্মের রূঢ় রূপের উপর সৌন্দর্য্যের আব্রু টেনে দিতে তাঁর আলস্য নেই। কর্ম্মকে তিনি লজ্জা দেন্‌নি। দেহের মধ্যে যন্ত্রের ব্যবস্থা-কৌশল আছে কিন্তু তাকে আবৃত্ত ক'রে আছে তা'র সুষমা-সৌষ্ঠব, বস্তুত সেইটেই প্রকাশমান।

মানুষকেও তিনি সৃষ্টি করবার অধিকার দিয়েচেন; এইটেই তা'র সব চেয়ে বড়ো অধিকার। মানুষ যেখানেই

আপনার কর্ম্মের গৌরব বোধ ক'রেচে সেখানেই কর্ম্মকে সুন্দর করবার চেষ্টা ক'রেচে। তা'র ঘরকে বানাতে চায় সুন্দর ক'রে, তা'র পানপাত্র অন্নপাত্র সুন্দর, তা'র কাপড়ে থাকে শোভার চেষ্টা। তা'র জীবনের প্রয়োজনের চেয়ে সজ্জার অংশ কম থাকে না। যেখানে মানুষের মধ্যে স্বভাবের সামঞ্জস্য আছে সেখানে এই রকমই ঘটে।

এই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, যেখানে কোনো একটা রিপু—বিশেষত লোভ—অতি প্রবল হ'য়ে ওঠে। লোভ জিনিষটা মানুষের দৈন্য থেকে, তা'র লজ্জা নেই—সে আপন অসম্ভ্রমকে নিয়েই বড়াই করে। বড়ো বড়ো মুনফাওয়ালা পাটকল চটকল গঙ্গার ধারের লাবণ্যকে দলন ক'রে ফেলেচে দম্ভভরেই। মানুষের রুচিকে সে একেবারেই স্বীকার করেনি, একমাত্র স্বীকার ক'রেচে তা'র পাওনার ফুলে'-ওঠা থলিটাকে।

বর্ত্তমান যুগের বাহ্যরূপ তাই নির্লজ্জতায় ভরা। ঠিক যেন পাকযন্ত্রটা দেহের পর্দ্দা থেকে সর্ব্বসম্মুখে বেরিয়ে এসে আপন জটিল অন্ত্রতন্ত্র নিয়ে সর্ব্বদা দোলায়মান। তা'র ক্ষুধার দাবী ও সুনিপুণ পাকপ্রণালীর বড়াইটাই সর্ব্বাঙ্গীন দেহের সম্পূর্ণ সৌষ্ঠবের চেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠেচে। দেহ যখন আপন স্বরূপকে প্রকাশ ক'রতে চায় তখন সুসংযত সুষমার দ্বারাই করে,—যখন সে আপন ক্ষুধাকেই সব ছাড়িয়ে একান্ত ক'রে তোলে তখন বীভৎস হ'তে তা'র কিছুমাত্র লজ্জা নেই। লালায়িত রিপুর নির্লজ্জতাই বর্ব্বরতার প্রধান লক্ষণ, তা সে

সভ্যতার গিল্‌টি-করা তক্‌মাই পরুক কিম্বা অসভ্যতার পশু-চর্ম্মেই সেজে বেড়াক,—devil danceই নাচুক কিম্বা jazz dance।

বর্ত্তমান সভ্যতায় রুচির সঙ্গে কৌশলের যে-বিচ্ছেদ চারদিক থেকেই দেখ্‌তে পাই তা'র একমাত্র কারণ, লোভটাই তা'র অন্য সকল সাধনাকে ছাড়িয়ে লম্বোদর হ'য়ে উঠেচে। বস্তুর সংখ্যাধিক্য-বিস্তারের প্রচণ্ড উন্মত্ততায় সুন্দরকে সে জায়গা ছেড়ে দিতে চায় না। সৃষ্টিপ্রেমের সঙ্গে পণ্যলোভের এই বিরোধে মানব-ধর্ম্মের মধ্যে যে-আত্মবিপ্লব ঘটে তাতে দাসেরই যদি জয় হয়, পেটুকতারই যদি আধিপত্য বাড়ে তাহ'লে যম আপন সশস্ত্র দূত পাঠাতে দেরি ক'র্‌বে না, দলবল নিয়ে নেমে আস্‌বে দ্বেষ হিংসা মোহ মদ মাৎসর্য্য—লক্ষ্মীকে দেবে বিদায় ক'রে।

পূর্ব্বেই ব'লেচি, দীনতা থেকে লোভের জন্ম;—সেই লোভের একটি স্থূলতনু সহোদরা আছে তা'র নাম জড়তা। লোভের মধ্যে অসংযত উদ্যম; সেই উদ্যমেই তাকে অশোভন করে। জড়তায় তা'র উল্‌টো, সে ন'ড়ে ব'স্‌তে পারে না; সে না-পারে সজ্জাকে গ'ড়্‌তে, না-পারে আবর্জ্জনাকে দূর ক'র্‌তে,—তা'র অশোভনতা নিরুদ্যমের। সেই জড়তার অশোভনতায় আমাদের দেশের মানব সম্ভ্রম নষ্ট ক'রেচে। তাই আমাদের ব্যবহারে আমাদের জীবনের অনুষ্ঠানে সৌন্দর্য্য বিদায় নিতে ব'স্‌লো; আমাদের ঘরে দ্বারে বেশে ভূষায় ব্যবহার-সামগ্রীতে রুচির স্বাধীন প্রকাশ

রইলো না ;—তা'র জায়গায় এসে প'ড়েচে চিত্তহীন আড়ম্বর, —এতদূর পর্য্যন্ত শক্তির অসাড়তা এবং আপন রুচি সম্বন্ধেও নির্লজ্জ আত্ম-অবিশ্বাস যে, আমাদের সেই আড়ম্বরের সহায় হ'য়েচে চৌরঙ্গীর বিলিতি দোকানগুলো।

বারবার মনে করি লেখাগুলোকে ক'র্‌বো বঙ্কিমবাবু যাকে ব'লেচেন "সাধের তরণী"। কিন্তু কোথা থেকে বোঝা এসে জমে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাধের তরী হ'য়ে ওঠে বোঝাই-তরী। ভিতরে র'য়েচে নানাপ্রকারের ক্ষোভ, লেখনীর আওয়াজ শুনেই তা'রা স্থানে অস্থানে বেরিয়ে পড়ে; কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ যার মালেক নয় এমন একটা রচনা পেলেই সেটাকে অম্নিবাস্ গাড়ি ক'রে তোলে। কেউ-বা ভিতরেই ঢুকে বেঞ্চির উপর পা তুলে ব'সে যায়, কেউ-বা পায়দানে চ'ড়ে চ'ল্‌তে থাকে, তারপরে যেখানে-খুসি অকস্মাৎ লাফ দিয়ে নেমে পড়ে।

আজ শ্রাবণ মাসের পয়লা। কিন্তু ঝাঁকড়া ঝুঁটিওয়ালা শ্রাবণ এক ভবঘুরে বেদের মতো তা'র কালো মেঘের তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে কোথায় যে চ'লে গেচে তা'র ঠিকানা নেই। আজ যেন আকাশ-সরস্বতী নীলপদ্মের দোলায় দাঁড়িয়ে। আমার মন ঐ সঙ্গে সঙ্গে দুল্‌চে সমস্ত পৃথিবীটাকে ঘিরে। আমি যেন আলোতে তৈরি, বাণীতে গড়া, বিশ্বরাগিণীতে ঝঙ্কৃত, জলে স্থলে আকাশে ছড়িয়ে-যাওয়া। আমি শুন্‌তে পাচ্চি সমুদ্রটা কোন্ কাল থেকে কেবলি ভেরী বাজাচ্চে, আর পৃথিবীতে তা'রই উত্থান-পতনের ছন্দে জীবের ইতিহাস-

যাত্রা চ'লেচে আবির্ভাবের অস্পষ্টতা থেকে তিরোভাবের অদৃশ্যের মধ্যে। একদল বিপুলকায় বিকটাকার প্রাণী যেন সৃষ্টিকর্ত্তার দুঃস্বপ্নের মতো দলে দলে এলো, আবার মিলিয়ে গেলো। তারপরে মানুষের ইতিহাস কবে সুরু হ'লো প্রদোষের ক্ষীণ আলোতে, গুহা গহ্বর অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায়। দুই পায়ের উপর খাড়া-দাঁড়ানো ছোটো ছোটো চটুল জীব, লাফ দিয়ে চ'ড়ে চ'ড়ে ব'স্‌লো মহাকায় বিপদ-বিভীষিকার পিঠের উপর, বিষ্ণু যেমন চ'ড়েচেন গরুড়ের পিঠে। অসাধ্যের সাধনায় চ'ল্‌লো তা'রা জীর্ণ যুগান্তরের ভগ্নাংশবিকীর্ণ দুর্গম পথে। তারি সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে ঘিরে ঘিরে বরুণের মৃদঙ্গ বাজ্‌তে লাগ্‌লো দিনে রাত্রে, তরঙ্গে তরঙ্গে। আজ তাই শুন্‌চি, আর এমন-কোনো একটা কথা ছন্দে আবৃত্তি ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌চে যা অনাদিকালের। আজকের দিনের মতোই এই রকম আলো-ঝল্‌মলানো কলকল্লোলিত নীলজলের দিকে তাকিয়ে ইংরেজ কবি শেলি একটি কবিতা লিখেছেন :—

The sun is warm, the sky is clear,
The waves are dancing fast and bright.

কিন্তু এ তাঁর ক্লান্ত জীবনের অবসাদের বিলাপ। এর সঙ্গে আজ ভিতরে বাইরে মিল পাচ্চিনে। একটা জগৎ-জোড়া কলক্রন্দন শুন্‌তে পাচ্চি বটে, সেই ক্রন্দন ভরিয়ে তুল্‌চে অন্তরীক্ষকে, যে-অন্তরীক্ষের উপর বিশ্বরচনার ভূমিকা, —যে-অন্তরীক্ষকে বৈদিক ভারত নাম দিয়েচে ক্রন্দসী। এ কিন্তু শ্রান্তিভারাতুর পরাভবের ক্রন্দন নয়। এ নবজাত

শিশুর ক্রন্দন,—যে-শিশু উর্দ্ধস্বরে বিশ্ব-দ্বারে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা ক'রে তা'র প্রথম ক্রন্দিত নিশ্বাসেই জানায়, "অয়-ময়ং ভোঃ।" অসীম ভাবীকালের দ্বারে সে অতিথি। অস্তিত্বের ঘোষণায় একটা বিপুল কান্না আছে। কেননা বারে বারে তাকে ছিন্ন ক'র্‌তে হয় আবরণ, চূর্ণ ক'র্‌তে হয় বাধা। অস্তিত্বের অধিকার প'ড়ে-পাওয়া জিনিষ নয়, প্রতি মুহূর্ত্তেই সেটা লড়াই-ক'রে-নেওয়া জিনিষ। তাই তা'র কান্না এত তীব্র, আর জীবলোকে সকলের চেয়ে তীব্র মানব-সত্তার নব-জীবনের কান্না। সে যেন অন্ধকারের গর্ভ বিদারণ করা নবজাত আলোকের ক্রন্দনধ্বনি। তারি সঙ্গে সঙ্গে নব নব জন্মে নব নব যুগে দেবলোকে বাজে মঙ্গলশঙ্খ, উচ্চারিত হয় বিশ্বপিতামহের অভিনন্দন মন্ত্র।

আজকের দিনে এই আমার শেষ-উপলব্ধি নয়। সকালে দেখ্‌লুম, সমুদ্রের প্রান্তরেখায় আকাশ তা'র জ্যোতির্ম্ময়ী চিরন্তনী বাণীটি লিখে দিলে ; সেটি পরম শান্তির বাণী, তা মর্ত্ত্যলোকের বহু যুগের বহু দুঃখের আর্ত্তকোলাহলের আবর্ত্তকে ছাড়িয়ে ওঠে, যেন অশ্রুর ঢেউয়ের উপরে শ্বেত-পদ্মের মতো। তারপরে দিনশেষের দিকে দেখলুম একটি অখ্যাত ব্যক্তিকে, যার মধ্যে মনুষ্যত্ব অপমানিত—যদি সময় পাই তা'র কথা পরে ব'ল্‌বো। তখন মানব ইতিহাসের দিগন্তে দিগন্তে দেখ্‌তে পেলুম বিরোধের কালো মেঘ, অশান্তির প্রচ্ছন্ন বজ্রগর্জ্জন, আর লোকালয়ের উপর রুদ্রের ভ্রূকুটিচ্ছায়া। ইতি ২ শ্রাবণ, ১৩৩৪।

(৩)

বুনো হাতি মূর্ত্তিমান উৎপাত, বজ্রবৃংহিত ঝড়ের মেঘের মতো। এতটুকু মানুষ, হাতির একটা পায়ের সঙ্গেও যার তুলনা হয় না, সে ওকে দেখে খামখা ব'লে উঠ্‌লো আমি এর পিঠে চ'ড়ে বেড়াবো। এই প্রকাণ্ড দুর্দ্দাম প্রাণপিণ্ডটাকে গাঁগাঁ ক'রে শুঁড় তুলে আস্‌তে দেখেও এমন অসম্ভবপ্রায় কথা কোনো একজন ক্ষীণকায় মানুষ কোনো এককালে ভাবতেও পেরেচে এইটেই আশ্চর্য্য। তা'রপরে "পিঠে চ'ড়্‌বো" বলা থেকে আরম্ভ ক'রে পিঠে-চ'ড়ে-বসা পর্য্যন্ত যে-ইতিহাস সেটাও অতি অদ্ভুত। অনেকদিন পর্য্যন্তই সেই অসম্ভবের চেহারা সম্ভবের কাছ দিয়েও আসেনি—পরম্পরাক্রমে কত বিফলতা কত অপঘাত মানুষের সঙ্কল্পকে বিদ্রূপ ক'রেচে তা'র সংখ্যা নেই, সেটা গণনা ক'রে ক'রে মানুষ ব'ল্‌তে পা'র্‌তো এটা হবার নয়। কিন্তু তা বলেনি। অবশেষে একদিন সে হাতির মতো জন্তুরও পিঠে চ'ড়ে ফসল ক্ষেতের ধারে, লোকালয়ের রাস্তায়-ঘাটে ঘুরে বেড়ালো। এটা সাংঘাতিক অধ্যবসায়, সেই জন্যেই গণেশের হাতীর মুণ্ডে মানুষের সিদ্ধির মূর্ত্তি। এই সিদ্ধির দুই দিকে দুই জন্তুর চেহারা, একদিকে রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষ্ম-ঘ্রাণ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি খরদন্ত চঞ্চল-কৌতূহল, সেটা ইঁদুর, সেইটেই বাহন; আর-একদিকে বন্ধনে বশীভূত বন্যশক্তি, যা দুর্গমের উপর দিয়ে বাধা ডিঙিয়ে

চলে, সেই হ'লো যান,—সিদ্ধির যান-বাহনযোগে মানুষ কেবলি এগিয়ে চ'ল্‌চে। তা'র ল্যাবরেটরিতে ছিলো ইঁদুর, আর তা'র য়েরোপ্লেনের মোটরে আছে হাতী। ইঁদুরটা চুপিচুপি সন্ধান বাৎলিয়ে দেয়, কিন্তু ঐ হাতিটাকে কায়দা ক'রে নিতে মানুষের অনেক দুঃখ। তা হোক্, মানুষ দুঃখকে দেখে হার মানে না, তাই সে আজ দ্যুলোকের রাস্তায় যাত্রা আরম্ভ ক'র্‌লে। কালিদাস রাঘবদের কথায় ব'লেচেন, তাঁরা "আনাকরথবর্ত্মনাম্"—স্বর্গ পর্য্যন্ত তাঁদের রথের রাস্তা। যখন একথা কবি ব'লেচেন, তখন মাটির মানুষের মাথায় এই অদ্ভুত চিন্তা ছিলো যে, আকাশে না চ'ল্‌লে মানুষের সার্থকতা নেই। সেই চিন্তা ক্রমে আজ রূপ ধ'রে বাইরের আকাশে পাখা ছড়িয়ে দিলে। কিন্তু রূপ যে ধ'র্‌লো সে মৃত্যুজয়কারী ভীষণ তপস্যায়। মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি সন্ধান ক'র্‌তে জানে এই যথেষ্ট নয়; মানুষের কীর্ত্তিবুদ্ধি সাহস ক'র্‌তে জানে এইটে তা'র সঙ্গে যখন মিলেচে, তখনি সাধকদের তপঃসিদ্ধির পথে পথে ইন্দ্রদেব যে-সব বাধা রেখে দেন সেগুলো ধূলিসাৎ হয়।

তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ সামনে দেখ্‌লে সমুদ্র। এত বড়ো বাধা কল্পনা করাই যায় না। চোখে দেখ্‌তে পায় না এর পার, তলিয়ে পায় না এর তল। যমের মোষের মতো কালো—দিগন্তপ্রসারিত বিরাট একটা নিষেধ কেবলি তরঙ্গ-তর্জ্জনী তুল্‌চে। চিরবিদ্রোহী মানুষ ব'ল্‌লে, নিষেধ মান্‌বো না। বজ্রগর্জ্জনের জবাব এলো, না-মানো তো ম'র্‌বে।

মানুষ তা'র এতটুকুমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে ব'ল্‌লে, মরি তো ম'র্‌বো। এই হ'লো জাত-বিদ্রোহীদের উপযুক্ত কথা। জাত-বিদ্রোহীরাই চিরদিন জিতে এসেচে। একেবারে গোড়া থেকেই প্রকৃতির শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ নানা ভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে দিলে। আজ পর্য্যন্ত তাই চ'ল্‌চে। মানুষদের মধ্যে যারা যত খাঁটি বিদ্রোহী, যারা বাহ্য শাসনের সীমা-গণ্ডি যতই মান্‌তে চায় না, তাদের অধিকার ততই বেড়ে চ'ল্‌তে থাকে।

যেদিন সাড়ে তিন হাত মানুষ স্পর্দ্ধা ক'রে ব'ল্‌লে, এই সমুদ্রের পিঠে চ'ড়বো, সেদিন দেবতারা হাস্‌লেন না,—তাঁরা এই বিদ্রোহীর কানে জয়-মন্ত্র পড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা ক'রে রইলেন। সমুদ্রের পিঠ আজ আয়ত্ত হ'য়েচে, সমুদ্রের তলটাকেও কায়দা-করা সুরু হ'লো। সাধনার পথে ভয় বারবার ব্যঙ্গ ক'রে উঠ্‌চে, বিদ্রোহীর অন্তরের মধ্যে উত্তর-সাধক অবিচলিত ব'সে প্রহরে প্রহরে হাঁক দিচ্চে, "মা ভৈঃ"।

কালকের চিঠিতে ক্রন্দসীর কথা ব'লেচি, অন্তরীক্ষে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌চে সত্তার ক্রন্দন গ্রহে নক্ষত্রে। এই সত্তা বিদ্রোহী, অসীম অব্যক্তের সঙ্গে তা'র নিরন্তর লড়াই। বিরাট অপ্রকাশের তুলনায় সে অতি সামান্য, কিন্তু অন্ধকারের অন্তহীন পারাবারের উপর দিয়ে ছোটো ছোটো কোটি কোটি আলোর তরী সে ভাসিয়ে দিয়েচে—দেশ কালের বুক চিরে অতল স্পর্শের উপর দিয়ে তা'র অভিযান। কিছু ডুব্‌চে কিছু ভাস্‌চে, তবু যাত্রার শেষ নেই।

প্রাণ তা'র বিদ্রোহের ধ্বজা নিয়ে পৃথিবীতে অতি দুর্ব্বলরূপে একদিন দেখা দিয়েছিলো। অতি প্রকাণ্ড, অতি কঠিন, অতি গুরুভার অপ্রাণ চারিদিকে গদা উদ্যত ক'রে দাঁড়িয়ে আপন ধুলোর কয়েদ-খানায় তাকে দ্বার জানলা বন্ধ ক'রে প্রচণ্ড শাসনে রাখ্‌তে চায়। কিন্তু বিদ্রোহী প্রাণ কিছুতেই দমে না,—দেয়ালে দেয়ালে কত জায়গায় কত ফুটোই ক'রচে তা'র সংখ্যা নেই, কেবলি আলোর পথ নানাদিক দিয়েই খুলে দিচ্চে।

সত্তার এই বিদ্রোহ-মন্ত্রের সাধনায় মানুষ যতদূর এগিয়েচে এমন আর-কোনো জীব না। মানুষের মধ্যে যার বিদ্রোহ-শক্তি যত প্রবল যত দুর্দ্দমনীয় ইতিহাসকে ততই সে যুগ হ'তে যুগান্তরে অধিকার ক'র্‌চে, শুধু সত্তার ব্যাপ্তি দ্বারা নয়, সত্তার ঐশ্বর্য্য দ্বারা।

এই বিদ্রোহের সাধনা দুঃখের সাধনা—দুঃখই হ'চ্চে হাতী, দুঃখই হ'চ্চে সমুদ্র। বীর্য্যের দর্পে এর পিঠে যারা চ'ড়্‌লো তা'রাই বাঁচ্‌লো, ভয়ে অভিভূত হ'য়ে এর তলায় যারা প'ড়েচে তা'রা ম'রেচে। আর যারা এ'কে এড়িয়ে শস্তায় ফল লাভ ক'র্‌তে চায় তা'রা নকল ফলের ছদ্মবেশে ফাঁকির বোঝার ভারে মাথা হেঁট ক'রে বেড়ায়। আমাদের ঘরের কাছে সেই জাতের মানুষ অনেক দেখা যায়। বীরত্বের হাঁক-ডাক ক'র্‌তে তা'রা শিখেচে কিন্তু সেটা যথাসম্ভব নিরাপদে ক'র্‌তে চায়। যখন মার আসে তখন নালিশ ক'রে বলে, বড়ো লাগ্‌চে। এরা পৌরুষের পরীক্ষাশালায়

ব'সে বিলিতি বই থেকে তা'র বুলি চুরি করে, কিন্তু কাগজের পরীক্ষা থেকে যখন হাতের পরীক্ষার সময় আসে তখন প্রতিপক্ষের অনৌদার্য্য নিয়ে মামলা তুলে বলে,—ওদের স্বভাব ভালো নয়, ওরা বাধা দেয়।

মানুষকে নারায়ণ সখা ব'লে তখনি সম্মান ক'রেচেন যখন তা'কে দেখিয়েচেন তাঁর উগ্ররূপ, তাকে দিয়ে যখন বলিয়েচেন, দৃষ্ট্বাদ্ভুতংরূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্,—যখন মানুষ প্রাণ-মন দিয়ে এই স্তব ক'র্‌তে পেরেচে ঃ—

অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽষি সর্ব্বঃ—

তুমিই অনন্তবীর্য্য, তুমিই অমিতবিক্রম, তুমিই সমস্তকে গ্রহণ করো, তুমিই সমস্ত। ইতি ৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৪।

(৪)

কাল সকালেই পৌঁছ'বো সিঙাপুরে। তা'র পর থেকে আমার ডাঙার পালা। এই-যে চ'ল্‌চে আমার মনে মনে বকুনি, এটাতে খুবই বাধা হবে। অবকাশের অভাব হবে ব'লে নয়, মন এই ক'দিন যে-কক্ষে চ'ল্‌ছিলো সে-কক্ষ থেকে ভ্রষ্ট হবে ব'লে। কিসের জন্যে? সর্ব্বসাধারণ ব'লে যে একটি মনুষ্য-সমষ্টি আছে তা'রই আকর্ষণে।

লেখবার সময় তা'র কোনো আকর্ষণ-বেগ একটুও মনের

মধ্যে থাক্‌বে না তা হ'তেই পারে না। কিন্তু তা'র নিকটের আকর্ষণটা লেখার পক্ষে বড়ো ব্যাঘাত। কাছে যখন সে থাকে তখন সে কেবলি ঠেলা দিয়ে দিয়ে দাবী ক'র্‌তে থাকে। দাবী করে তা'রই নিজের মনের কথাটাকে। প্রকাণ্ড একটা বাইরের ফরমাস কলমটাকে ভিতরে ভিতরে টান মারে। ব'ল্‌তে চাই বটে তোমাকে গ্রাহ্য করিনে, কিন্তু হেঁকে উঠে বলার মধ্যেই গ্রাহ্য করাটা প্রমাণ হয়।

আসল কথা, সাহিত্যের শ্রোতৃ-সভায় আজ সর্ব্বসাধারণই রাজাসনে। এ সত্যটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে লিখ্‌তে বসা অসম্ভব। প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে উড়িয়ে দেবেই বা কেন? এমন সময় কবে ছিলো যখন সাহিত্য সমস্ত মানব-সাধারণের জন্যেই ছিলো না?

কথাটা একটু ভেবে-দেখ্‌বার। কালিদাসের মেঘদূত মানব-সাধারণের জন্যেই লেখা আজ তা'র প্রমাণ হ'য়ে গেচে। যদি কোনো বিশিষ্ট দলের জন্যে লেখা হ'তো তাহ'লে সে দলও থাক্‌ত না আর মেঘদূতও যেতো তারি সঙ্গে অনুমরণে। কিন্তু এখন যাকে পাব্লিক ব'ল্‌চি কালিদাসের সময় সেই পাব্লিক অত্যন্ত গা-ঘেঁসা হ'য়ে শ্রোতারূপে ছিলো না। যদি থাক্‌তো তাহ'লে যে-মানব-সাধারণ শত শত বৎসরের মহাক্ষেত্রে সমাগত তাদের পথ তা'রা অনেকটা পরিমাণে আট্‌কে দিতো।

এখনকার পাব্লিক একটা বিশেষ কালের দাঁনাবাঁধা সর্ব্বসাধারণ। তা'র মধ্যে খুব নিরেট হ'য়ে তাল-পাকিয়ে আছে এখনকার কালের রাষ্ট্র-নীতি, সমাজ-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি,

এখনকার কালের বিশেষ রুচি প্রবৃত্তি এবং আরো কত কী। এই সর্ব্বসাধারণ যে, মানব-সাধারণের প্রতিরূপ তা বলা চ'ল্‌বে না। এর ফরমাস যে একশো বছর পরের ফরমাসের সঙ্গে মিলবে না সে-কথা জোর ক'রেই বল্‌তে পারি। কিন্তু এই উপস্থিত-কালের সর্ব্বসাধারণ কানের খুব কাছে এসে জোর গলায় তুও দিচ্চে বাহবা দিচ্চে।

উপস্থিত-কালের সঙ্কীর্ণ পরিধির তুলনাতেও এই তুও বাহবার স্থায়িত্ব অকিঞ্চিৎকর। পাব্লিক-মহারাজ আজ দুই চোখ লাল ক'রে যে-কথাটাকে প্রত্যাখ্যান ক'রেচে আস্‌চে-কাল সেইটেকেই এমনি চড়া গলায় ব্যবহার করে যেন সেটা তা'র নিজেরই চিরকালের চিন্তিত কথা। আজ যে-কথা শুনে তা'র দুই গাল বেয়ে চোখের জল ব'য়ে গেলো, আস্‌চে-কাল সেটাকে নিয়ে হাসাহসি কর্‌বার সময় নিজের গদগদচিত্তের পূর্ব্ব ইতিহাসটি সম্পূর্ণ বে-কবুল যায়।

ইংরেজ বেণের আপিসঘর গুদামঘরের আশে-পাশে হঠাৎ যখন ক'লকাতা সহরটা মাথাঝাড়া দিয়ে উঠ্‌লো তখন সেখানে এই নূতন-গড়া দোকান-পাড়ার এক পাব্লিক দেখা দিলে। অন্তত তা'র এক ভাগের চেহারা হুতুম পেঁচার নক্‌সায় উঠেচে। তারি ফরমাসের ছাপ প'ড়েচে দাশুরায়ের পাঁচালিতে। ঘন ঘন অনুপ্রাস তপ্ত-খোলার উপরকার খইয়ের মতো পট্‌পট্‌ শব্দে ফুটে ফুটে ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো—

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে
নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে।

চারিদিকে হায় হায় শব্দে সভা তোলপাড়। দুই কানে হাত-চাপা তারস্বরে দ্রুত লয়ে গান উঠ্‌লো—

ওরে রে লক্ষ্মণ, একী অলক্ষণ
বিপদ ঘ'টেচে বিলক্ষণ।
অতি অগণ্য কাজে, অতি জঘন্য সাজে
ঘোর অরণ্য মাঝে কত কাঁদিলাম—ইত্যাদি।

দোকান-পাড়ার জনসাধারণ খুসি হ'য়ে নগদ বিদায় ক'র্‌লে। অবকাশের সম্পদকে অবকাশের শিক্ষাযোগে ভোগ কর্‌বার শক্তি যার ছিলো না সেই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাটের পাব্লিককে মাথা-গুন্‌তির জোরে মানব-সাধারণের প্রতিনিধি ব'লে মেনে নিতে হবে নাকি? বস্তুত এই জন-সাধারণই দাশুরায়ের প্রতিভাকে বিশ্ব-সাধারণের মহাসভায় উত্তীর্ণ হ'তে বাধা দিয়েছিলো।

অথচ মৈমনসিং থেকে যে-সব গাথা সংগ্রহ করা হ'য়েচে তাতে সহজেই বেজে উঠ্‌চে বিশ্ব-সাহিত্যের সুর। কোনো সহুরে পাব্লিকের দ্রুত ফরমাসের ছাঁচে-ঢালা সাহিত্য তো সে নয়। মানুষের চিরকালের সুখ-দুঃখের প্রেরণায় লেখা সেই গাথা। যদি-বা ভিড়ের মধ্যে গাওয়া হ'য়েও থাকে তবু এ-ভিড় বিশেষ কালের বিশেষ ভিড় নয়। তাই এ-সাহিত্য সেই ফসলের মতো যা গ্রামের লোক আপন মাটির বাসনে ভোগ ক'রে থাকে বটে তবুও তা বিশ্বেরই ফসল,—তা ধানের মঞ্জরী।

যে-কবিকে আমরা কবি ব'লে সম্মান ক'রে থাকি তা'র প্রতি সম্মানের মধ্যে এই সাধুবাদটুকু থাকে যে, তা'র

একলার কথাই আমাদের সকলের কথা। এই জন্যেই কবিকে একলা ব'ল্‌তে দিলেই সে সকলের কথা সহজে ব'ল্‌তে পারে। হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেইদিনকার হাটের লোকের মনের কথা যেমন-তেমন ক'রে মিলিয়ে দিয়ে তাদের সেইদিনকার বহু-মুণ্ডের মাথা-নাড়া-গুন্‌তির জোরে আমরা যেন আপন রচনাকে কৃতার্থ মনে না করি, যেন আমাদের এই কথা মনে কর্‌বার সাহস থাকে যে, সাহিত্যের গণনা-তত্ত্বে এক অনেক সময়েই হাজারের চেয়ে সংখ্যায় বেশি হ'য়ে থাকে।

এইবার আমার জাহাজের চিঠি তা'র অন্তিম পংক্তির দিকে হেলে প'ড়্‌লো। বিদায় নেবার পূর্ব্বে তোমার কাছে মাপ চাওয়া দরকার মনে ক'র্‌চি। তা'র কারণ চিঠি লিখ্‌বো ব'লে ব'সলুম কিন্তু কোনোমতেই চিঠি লেখা হ'য়ে উঠ্‌লো না। এর থেকে আশঙ্কা হ'চ্চে আমার চিঠি লেখ্‌বার বয়স পেরিয়ে গেচে। প্রতিদিনের স্রোতের থেকে প্রতি দিনের ভেসে-আসা কথা ছেঁকে-তোলবার শক্তি এখন আমার নেই। চ'ল্‌তে-চ'ল্‌তে চারদিকের পরিচয় দিয়ে যাওয়া এখন আমার দ্বারা আর সহজ হয় না। অথচ এক সময়ে এ শক্তি আমার ছিলো। তখন অনেককে অনেক চিঠিই লিখেচি। সেই চিঠিগুলি ছিলো চ'ল্‌তি কালের সীনেমা ছবি। তখন ছিলো মনের পটটা বাইরের সমস্ত আলো ছায়ার দিকে মেলে-দেওয়া। সেই সব ছাপের ধারায় চ'ল্‌তো চিঠি। এখন বুঝিবা বাইরের ছবির ফোটোগ্রাফটা বন্ধ

হ'য়ে গিয়ে মনের ধ্বনির ফোনোগ্রাফটাই সজাগ হ'য়ে উঠেচে। এখন হয়তো দেখি কম, শুনি বেশি।

মনুষ তো কোনো একটা জায়গায় খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে নেই। এই জন্যেই চলচ্চিত্র ছাড়া তা'র যথার্থ চিত্র হ'তেই পারে না। প্রবহমান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলমান আপনার পরিচয় মানুষ দিতে থাকে। যারা আপন লোক, নিয়ত তা'রা সেই পরিচয়টা পেতে ইচ্ছে করে। বিদেশে নূতন নূতন ধাবমান অবস্থা ও ঘটনার চঞ্চল ভূমিকার উপরে প্রকাশিত আত্মীয়-লোকের ধারাবাহিক পরিচয়ের ইচ্ছা স্বাভাবিক। চিঠি সেই ইচ্ছা পূরণ কর্‌বার জন্যেই।

কিন্তু সকল প্রকার রচনাই স্বাভাবিক শক্তির অপেক্ষা করে। চিঠি-রচনাও তাই। আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত ব'লেই জানতুম্। অর্থাৎ আস্ত জিনিষকে টুক্‌রো করা ও টুক্‌রো জিনিষকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েচেন ব'লে আমার বিশ্বাস ছিলো। কিন্তু এবার দেখ্‌লুম বিশ্ব ব'ল্‌তে যে-ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় ক'রে ছোটে এবং এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকেনা তাকে তিনি তালভঙ্গ না ক'রে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধ'র্‌তে পারেন আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ ব'লে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা

করা যায় না। সাধারণত এ-কথা বলা চলে যে শব্দ-তত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেচে শব্দ-চিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারেনি এই বড়ো অপূর্ব্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথা-সময়ে প'ড়্‌তে পাবে—দেখ্‌বে এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজম্‌: বর্ণনা-সাম্রাজ্য সর্ব্বগ্রাহী, ছোটো বড়ো কিছুই তা'র থেকে বাদ পড়েনি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত, লিপি-বাচস্পতি কিম্বা লিপি-সার্ব্বভৌম, কিম্বা লিপি-চক্রবর্ত্তী। ইতি ৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৪। নাগপঞ্চমী।

(৫)

সাম্‌নে সমুদ্রের অর্দ্ধচন্দ্রাকার তটসীমা। অনেক দূর পর্য্যন্ত জল অগভীর, জলের রঙে মাটির আভাস সে যেন ধরণীর গেরুয়া আঁচল, এলিয়ে প'ড়েচে। ঢেউ নেই, সমস্ত-দিন জলরাশি এগোয় আর পিছোয় অতি ধীর গমনে। অপ্সরী আস্‌চে চুপি চুপি পিছন থেকে পৃথিবীর চোখটিপে ধ'র্‌বে ব'লে,—সোনার রেখায় রেখায় কৌতুকের মুচ্‌কে-হাসি।

সাম্‌নে বাঁ-দিকে একদল নারকেল গাছ,—সুদীর্ঘ গুঁড়ির উপর সিধে হ'য়ে দাঁড়াতে পারেনি,—পরস্পরের দিকে তাদের হেলাহেলি। নিত্য-দোলায়িত শাখায় শাখায়

সূর্য্যের আলো ওরা ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্চে,—চঞ্চল ছেলেরা যেমন নদীর ঘাটে জল-ছোঁড়াছুঁড়ি করে। সকালের আকাশে ওদের এই অবগাহন স্নান।

এটা একজন চিনীয় ধনীর বাড়ি। আমরা তাঁর অতিথি। প্রশস্ত বারান্দায় বেতের কেদারায় ব'সে আছি। সমুদ্রের দিক থেকে বুক ভ'রে বইচে পশ্চিমে হাওয়া। চেয়ে দেখ্‌চি আকাশের কোণে কোণে দলভাঙা মেঘগুলি শ্রাবণের কালো উর্দ্দি ছেড়ে ফেলেচে, এখন কিছুদিনের জন্যে সূর্য্যের আলোর সঙ্গে ওদের সন্ধি। আমার অস্পষ্ট ভাবনা-গুলোর উপর ঝ'রে প'ড়্‌চে কম্পমান নারকেল পাতার ঝর ঝর শব্দের বৃষ্টি, বালির উপর দিয়ে ভাঁটার সমুদ্রের পিছু-হটার শব্দ ওরই সঙ্গে একই মৃদুস্বরে মেলানো। ওদিকে পাশের ঘরে ধীরেন এসরাজ নিয়ে আপন মনে বাজিয়ে চ'লেচে,—ভৈরোঁ থেকে রামকেলী, রামকেলী থেকে ভৈরবী ;—আস্তে আস্তে অকেজো মেঘের মতো খেয়ালের হাওয়ায় বদল হ'চ্চে রাগিণীর আকৃতি।

আজ সকালে মনটা যেন ভাঁটার সমুদ্র,—তীরের দিকে টান্‌চে তাকে কোন্ দিকে তা'র ঠিকানা নেই। আপনাকে আপন সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বান্তঃকরণে ভরপূর মেলে দিয়ে ব'সে আছি, নিবিড় তরুপল্লবের শ্যামলতায় আবিষ্ট রোদ-পোয়ানো ঐ ছোটো দ্বীপটির মতো।

আমার মধ্যে এই ঘনীভূত অনুভবটিকে বলা যেতে পারে হওয়ার আনন্দ। রূপে রঙে আলোয় ধ্বনিতে

আকাশে অবকাশে ভ'রে-ওঠা একটি মূর্ত্তিমান সমগ্রতা আমার চিত্তের উপরে ঘা দিয়ে ব'ল্‌চে, "আছি"; তারি জগতে আমার চৈতন্য উছ্‌লে উঠ্‌চে,—সমুদ্র কল্লোলেরই মতো একতান শব্দ জাগ্‌চে, ওম্‌, অর্থাৎ এই-যে আমি। বিরাট একটা "না", হাঁ-করা তা'র মুখগহ্বর, প্রকাণ্ড তা'র শূন্য,— তারি সাম্‌নে ঐ নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে, পাতা নেড়ে নেড়ে ব'ল্‌চে, এই-যে আমি। দুঃসাহসিক সত্তার এই স্পর্দ্ধা গভীর বিস্ময়ে বাজ্‌চে আমার মনে, আর ধীরেন ঐ-যে ভৈরবীতে মীড় লাগিয়েচে সেও যেন বিশ্ব-সত্তার আত্মঘোষণা, আপন কম্পমান সুরের ধ্বজাটিকে অসীম শূন্যের মাঝখানে তুলে ধ'রেচে।

এই তো হ'লো "হওয়া"। এইখানেই শেষ নেই। এর সঙ্গে আছে করা। সমুদ্র আছে অন্তরে অন্তরে নিস্তব্ধ, কিন্তু তা'র উপরে উপরে উঠ্‌চে ঢেউ, চ'ল্‌চে জোয়ার ভাঁটা। জীবনে করার বিরাম নেই। এই করার দিকে কত প্রয়াস, কত উপকরণ, কত আবর্জ্জনা। এরা সব জ'মে জ'মে কেবলি গণ্ডী হ'য়ে ওঠে, দেয়াল হ'য়ে দাঁড়ায়। এরা বাহিরে সমগ্রতার ক্ষেত্রকে, অন্তরে পরিপূর্ণতার উপলব্ধিকে, টুক্‌রো টুক্‌রো ক'র্‌তে থাকে। অহমিকার উত্তেজনায় কর্ম্ম উদ্ধত হ'য়ে একান্ত হ'য়ে আপনাকে সকলের আগে ঠেলে তোলে, হওয়ার চেয়ে করা বড়ো হ'য়ে উঠ্‌তে চায়। এতে ক্লান্তি, এতে অশান্তি, এতে মিথ্যা। বিশ্বকর্ম্মার বাঁশিতে নিয়তই যে ছুটির সুর বাজে এই কারণেই সেটা শুন্‌তে পাইনে; সেই ছুটির সুরেই বিশ্বকাজের ছন্দ বাঁধা।

সেই সুরটি আজ সকালের আলোতে ঐ নারকেল গাছের তানপুরায় বাজ্‌চে। ওখানে দেখ্‌তে পাচ্চি শক্তির রূপ আর মুক্তির রূপ অনবচ্ছিন্ন এক। এতেই শান্তি, এতেই সৌন্দর্য্য। জীবনের মধ্যে এই মিলনটিই তো খুঁজি—করার চিরবহমান নদীধারায় আর হওয়ার চির-গম্ভীর মহাসমুদ্রে মিলন। এই আত্মপরিতৃপ্ত মিলনটিকে লক্ষ্য ক'রেই গীতা ব'লেচেন, কর্ম্ম করো, ফল চেয়ো না। এই চাওয়ার রাহুটাই কর্ম্মের পাত্র থেকে তা'র অমৃত ঢেলে নেবার জন্যে লালায়িত। ভিতরকার সহজ-হওয়াটি সার্থক হয় বাইরেকার সহজ কর্ম্মে। অন্তরের সেই সার্থকতার চেয়ে বাইরের স্বার্থ প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লেই কর্ম্ম হয় বন্ধন; সেই বন্ধনেই জড়িত যত হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা, নিজেকে ও অন্যকে প্রবঞ্চনা। এই কর্ম্মের দুঃখ, কর্ম্মের অগৌরব যখন অসহ্য হ'য়ে ওঠে তখন মানুষ ব'লে বসে, দূর হোক্ গে, কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাই। তখন আবার আহ্বান আসে, কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে কর্ম্ম থেকে নিষ্কৃতি নেই; করাতেই হওয়ার আত্মপ্রকাশ। বাহ্য ফলের দ্বারা নয়, আপন অন্তর্নিহিত সত্যের দ্বারাই কর্ম্ম সার্থক হোক্, তাতেই হোক্ মুক্তি।

ফল-চাওয়া কর্ম্মের নাম চাক্‌রি, সেই চাক্‌রির মনিব আমি নিজেই হই বা অন্যেই হোক্। চাক্‌রিতে মাইনের জন্যেই কাজ, কাজের জন্যে কাজ নয়। কাজ তা'র নিজের ভিতর থেকে নিজে যখন কিছুই রস জোগায় না, সম্পূর্ণ বাইরে থেকেই যখন আপন দাম নেয়, তখনই মানুষকে

সে অপমান করে। মর্ত্ত্যলোকে প্রয়োজন ব'লে জিনিষ-টাকে একেবারেই অস্বীকার ক'র্‌তে পারিনে। বেঁচে থাক্‌বার জন্যে আহার ক'র্‌তেই হবে। ব'ল্‌তে পা'র্‌বো না, সেই যা ক'র্‌লেম। সেই আবশ্যকের তাড়াতেই পরের দ্বারে মানুষ উমেদারী করে, আর সেই সঙ্গেই তত্ত্বজ্ঞানী ভাব্‌তে থাকে কী ক'র্‌লে এই কর্ম্মের জড় মারা যায়। বিদ্রোহী মানুষ ব'লে বসে, বৈরাগ্যমেবাভয়ং। অর্থাৎ এতই কম খাবো, কম প'র্‌বো, রৌদ্রবৃষ্টি এমন ক'রে সহ্য ক'র্‌তে শিখ্‌বো, দাসত্বে প্রবৃত্ত কর্‌বার জন্যে প্রকৃতি আমাদের জন্যে যত রকম কানমলার ব্যবস্থা ক'রেচে সেগুলোকে এতটা এড়িয়ে চ'ল্‌বো যে, কর্ম্মের দায় অত্যন্ত হাল্‌কা হ'য়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতির কাজে শুধু কানমলার তাড়া নেই, সেই সঙ্গে রসের জোগান আছে। একদিকে ক্ষুধায় দেয় দুঃখ, আর একদিকে রসনায় দেয় সুখ,—প্রকৃতি একই সঙ্গে ভয় দেখিয়ে আর লোভ দেখিয়ে আমাদের কাজ করায়। সেই লোভের দিক থেকে আমাদের মনে জন্মায় ভোগের ইচ্ছা। বিদ্রোহী মানুষ বলে, ঐ ভোগের ইচ্ছাটা প্রকৃতিব চাতুরী, ঐটেই মোহ, ওটাকে তাড়াও, বলো বৈরাগ্যমেবাভয়ং,—মান্‌বোনা দুঃখ, চাইবোনা সুখ।

দু'চার জন মানুষ এমনতরো স্পর্দ্ধা ক'রে ঘরবাড়ি ছেড়ে বনে জঙ্গলে ফলমূল খেয়ে কাটাতে পারে, কিন্তু সব মানুষই যদি এই পন্থা নেয় তাহ'লে বৈরাগ্য নিয়েই পরস্পর লড়াই বেধে যাবে,—তখন বল্কলে কুলোবে না, গিরি-গহ্বরে ঠেলা-

ঠেলি ভিড় হবে, ফলমূল যাবে উজাড় হ'য়ে। তখন কপ্‌নি-পরা ফৌজ্‌ মেশিন্‌ গান্‌ বের ক'র্‌বে।

সাধারণ মানুষের সমস্যা এই যে, কর্ম্ম ক'র্‌তেই হবে। জীবনধারণের গোড়াতেই প্রয়োজনের তাড়া আছেই। তবুও কী ক'র্‌লে কর্ম্ম থেকে প্রয়োজনের চাপ যথাসম্ভব হাল্‌কা করা যেতে পারে? অর্থাৎ কী ক'র্‌লে কর্ম্মে পরের দাসত্বের চেয়ে নিজের কর্ত্তৃত্বটা বড়ো হ'য়ে দেখা দেয়? কর্ম্ম থেকে কর্ত্তৃত্বকে যতই দূরে পাঠানো যাবে কর্ম্ম ততই মজুরীর বোঝা হ'য়ে মানুষকে চেপে মা'র্‌বে, এই শূদ্রত্ব থেকে মানুষকে উদ্ধার করা চাই।

একটা কথা মনে প'ড়ে গেলো। সেদিন যখন শিলঙে ছিলেম, নন্দলাল কার্সিয়ঙ্‌ থেকে পোষ্টকার্ডে একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন। স্যাকরা চারদিকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চোখে চশমা এঁটে গয়না গ'ড়্‌চে। ছবির মধ্যে এই কথাটি পরিস্ফুট যে, এই স্যাকরার কাজের বাইরের দিকে আছে তা'র দর, ভিতরের দিকে আছে তা'র আদর। এই কাজের দ্বারা স্যাকরা নিছক নিজের অভাব প্রকাশ ক'র্‌চে না, নিজের ভাবকে প্রকাশ ক'র্‌চে; আপন দক্ষতার গুণে আপন মনের ধ্যানকে মূর্ত্তি দিচ্চে। মুখ্যত এ-কাজটি তা'র আপনারই, গৌণত যে-মানুষ পয়সা দিয়ে কিনে নেবে তা'র। এতে ক'রে ফল-কামনাটা হ'য়ে গেলো লঘু, মূল্যের সঙ্গে অমূল্যতার সামঞ্জস্য হ'লো, কর্ম্মের শূদ্রত্ব গেলো ঘুচে। এক-কালে বণিককে সমাজ অবজ্ঞা ক'র্‌তো, কেন না বণিক কেবল

বিক্রি করে, দান করে না। কিন্তু এই স্যাকরা এই যে গয়নাটি গ'ড়্‌লে তা'র মধ্যে তা'র দান এবং বিক্রি একই কালে মিলে গেচে। সে ভিতর থেকে দিয়েচে, বাইরে থেকে জোগায়নি।

ভৃত্যকে রেখেচি তাকে দিয়ে ঘরের কাজ করাতে। মনিবের সঙ্গে তা'র মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ একান্ত হ'লে সেটা হয় ষোলো-আনা দাসত্ব। যে-সমাজ লোভে বা দাম্ভিকতায় মানুষের প্রতি দরদ হারায়নি সে-সমাজ ভৃত্য আর আত্মীয়ের সীমারেখাটাকে যতদূর সম্ভব ফিকে ক'রে দেয়। ভৃত্য সেখানে দাদা খুড়ো জ্যাঠার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছ'য়। তখন তা'র কাজটা পরের কাজ না হ'য়ে আপনারই কাজ হ'য়ে ওঠে। তখন তা'র কাজের ফল-কামনাটা যায় যথাসম্ভব ঘুচে। সে দাম পায় বটে তবুও আপনার কাজ সে দান করে, বিক্রি করে না।

গুজরাটে কাঠিয়াবাড়ে দেখেচি গোয়ালা গোরুকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। সেখানে তা'র দুধের ব্যবসায়ে ফল-কামনাকে তুচ্ছ ক'রে দিয়েচে তা'র ভালোবাসায়; কর্ম্ম ক'রেও কর্ম্ম থেকে তা'র নিত্য মুক্তি। এ-গোয়ালা শূদ্র নয়। যে-গোয়ালা দুধের দিকে দৃষ্টি রেখেই গোরু পোষে, কষাইকে গোরু বেচতে যার বাধে না, সেই হ'লো শূদ্র; কর্ম্মে তা'র অগৌরব, কর্ম্ম তা'র বন্ধন। যে-কর্ম্মের অন্তরে মুক্তি নেই, যেহেতু তাতে কেবল লোভ, তাতে প্রেমের অভাব, সেই কর্ম্মেই শূদ্রত্ব। জাত-শূদ্রেরা পৃথিবীতে অনেক উঁচু উঁচু

আসন অধিকার ক'রে ব'সে আছে। তা'রা কেউ-বা শিক্ষক, কেউ-বা বিচারক, কেউ-বা শাসনকর্ত্তা, কেউ-বা ধর্ম্মযাজক। কত ঝি, দাই, চাকর, মালী, কুমোর, চাষী আছে যারা ওদের মতো শূদ্র নয়—আজকের এই রৌদ্রে-উজ্জ্বল সমুদ্রতীরের নারকেল গাছের মর্ম্মরে তাদের জীবন-সঙ্গীতের মূল স্বরটি বাজ্‌চে।

মলক্কা
২৮শে জুলাই ১৯২৭

(৬)

শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত

কল্যাণীয়াসু,

এখনি দুশো মাইল দূরে এক জায়গায় যেতে হবে। সকলেই সাজ সজ্জা ক'রে জিনিষপত্র বেঁধে প্রস্তুত। কেবল আমিই তৈরি হ'য়ে নিতে পারিনি। এখনি রেলগাড়ির উদ্দেশে মোটর গাড়িতে চ'ড়্‌তে হবে। দ্বারের কাছে মোটর গাড়ি উদ্যত তারস্বরে মাঝে মাঝে শৃঙ্গধ্বনি ক'র্‌চে—আমাদের সঙ্গীদের কণ্ঠে তেমন জোর নেই কিন্তু তাদের উৎকণ্ঠা কম প্রবল নয়। অতএব এইখানেই উঠ্‌তে হ'লো।

দিনটি চমৎকার। নারকেল গাছের পাতা ঝিল্‌মিল্ ক'র্‌চে, ঝর্‌ঝর্ ক'র্‌চে, দুলে দুলে উঠ্‌চে, আর সাম্‌নেই সমুদ্র সমস্ত-উক্তিতে অবিশ্রাম কলধ্বনি-মুখরিত।

মলাক্কা
৩০ জুলাই ১৯২৭

(৭)

শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, এসেচি গিয়ানয়ার রাজবাড়িতে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্ব্বে সুনীতি রাজবাড়ির ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিয়ে খুব আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। খেতে ব'সে রাজা আমাকে ব'ল্‌লেন একটু সংস্কৃত আওড়াতে। দু'চার রকমের শ্লোক আওড়ানো গেলো। সুনীতি একটি শ্লোকের পরিচয় দিতে গিয়ে যেম্‌নি ব'ল্‌লেন "শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত" অমনি রাজা সেটা উচ্চারণ ক'রে জানালেন তিনিও জানেন। এখানকার রাজার মুখে অত বড়ো একটা কড়া সংস্কৃত শব্দ শুনে আমি তো আশ্চর্য্য। তার পরে রাজা ব'লে গেলেন শিখরিণী, স্রগ্ধরা, মালিনী, বসন্ততিলক; আরো কতকগুলো

নাম যা আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে কখনো পাইনি। ব'ল্লেন, তাঁদের ভাষায় এ-সব ছন্দ প্রচলিত। অথচ মন্দাক্রান্তা বা অনুষ্টুভ এঁরা জানেন না। এখানে ভারতীয় বিদ্যার এই সব ভাঙাচোরা মূর্ত্তি দেখে মনে হয় যেন ভূমিকম্প হ'য়ে একটা প্রাচীন মহানগরী ধ্ব'সে গিয়েচে, মাটির নীচে ব'সে গিয়েচে—সেই সব জায়গায় উঠেচে পরবর্ত্তী কালের ঘরবাড়ি চাষ-আবাদ; আবার অনেক জায়গায় সেই পুরোনো কীর্ত্তির অবশেষ উপরে জেগে, এই দুইয়ে মিলে জোড়াতাড়া দিয়ে এখানকার লোকালয়।

সেকালের ভারতবর্ষের যা-কিছু বাকি আছে তা'র থেকে ভারতের তখনকার কালের বিবরণ অনেকটা আন্দাজ করা যায়। এখানে হিন্দুধর্ম্ম প্রধানতই শৈব। দুর্গা আছেন কিন্তু কপালমালিনী লোলরসনা উলঙ্গিনী কালী নেই। কোনো দেবতার কাছে পশুবলি এরা জানে না। কিছুকাল আগে অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ উপলক্ষ্যে পশুবধ হ'তো, কিন্তু দেবীর কাছে জীবরক্ত নৈবেদ্য দেওয়া হ'তো না। এর থেকে বোঝা যায় তখনকার ভারতবর্ষে ব্যাধ শবরদের উপাস্য দেবতা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ ক'রে রক্তাভিষিক্ত দেবপূজা প্রচার করেন নি।

তারপরে রামায়ণ মহাভারতের যে-সকল পাঠ এদেশে প্রচলিত আমাদের দেশের সঙ্গে তা'র অনেক প্রভেদ। যে-যে স্থানে এদের পাঠান্তর তা'র সমস্তই যে অশুদ্ধ এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না। এখানকার রামায়ণে রাম

সীতা ভাই-বোন; সেই ভাই-বোনে বিবাহ হ'য়েছিলো। একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের সঙ্গে আমার কথা হ'চ্ছিলো; তিনি ব'ল্‌লেন, তাঁর মতে এই কাহিনীটাই প্রাচীন, পরবর্ত্তী-কাল এই কথাটাকে চাপা দিয়েচে।

এই মতটাকে যদি সত্য ব'লে মেনে নেওয়া যায় তা হ'লে রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে মস্ত কয়েকটি মিল দেখ্‌তে পাই। দুটি কাহিনীরই মূলে দুটি বিবাহ। দুটি বিবাহই আর্য্যরীতি অনুসারে অসঙ্গত। ভাই-বোনে বিবাহ বৌদ্ধ ইতিহাসে কোনো কোনো জায়গায় শোনা যায়, কিন্তু সেটা আমাদের সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অন্যদিকে এক স্ত্রীকে পাঁচ ভাইয়ে মিলে বিবাহও তেমনি অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয়। দ্বিতীয় মিল হ'চ্চে, দুই বিবাহেরই গোড়ায় অস্ত্রপরীক্ষা, অথচ সেই পরীক্ষা বিবাহযোগ্যতা প্রসঙ্গে নিরর্থক। তৃতীয় মিল হ'চ্চে, দুটি কন্যাই মানবী গর্ভজাত নয়। সীতা পৃথিবীর কন্যা, হল-রেখার মুখে কুড়িয়ে-পাওয়া; কৃষ্ণা, যজ্ঞসম্ভবা। চতুর্থ মিল হ'চ্চে, উভয়ত্রই প্রধান নায়কদের রাজ্যচ্যুতি ও স্ত্রীকে নিয়ে বনগমন। পঞ্চম মিল হ'চ্চে, দুই কাহিনীতেই শত্রুর হাতে স্ত্রীর অবমাননা ও সেই অবমাননার প্রতিশোধ।

সেই জন্যে আমি পূর্ব্বেই অন্যত্র এই মত প্রকাশ ক'রেচি যে, দুটি বিবাহই রূপকমূলক। রামায়ণের রূপকটি খুবই স্পষ্ট। কৃষির হলবিদারণ রেখাকে যদি কোনো রূপ দিতেই হয় তবে তাকে পৃথিবীর কন্যা বলা যেতে পারে। শস্যকে যদি নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম ব'লে কল্পনা করা যায় তবে সেই

শস্যও তো পৃথিবীর পুত্র। এই রূপক অনুসারে উভয়ে ভাইবোন, আর পরস্পর পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ।

হরধনু ভঙ্গের মধ্যেই রামায়ণের মূল অর্থ। বস্তুত সমস্তটাই হরধনু ভঙ্গের ব্যাপার—সীতাকে গ্রহণ, রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যে। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব অংশ থেকে ভারত-বর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত কৃষিকে বহন ক'রে ক্ষত্রিয়দের যে-অভিযান হ'য়েছিলো সে সহজ হয় নি,—তা'র পিছনে ঘরে-বাইরে মস্ত একটা দ্বন্দ্ব ছিলো। সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত, অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব।

মহাভারতে খাণ্ডববন-দাহনের মধ্যেও এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের আভাস পাই। সেও বনের গাছপালা পোড়ানো নয়, সেদিন বন যে-প্রতিকূল মানব-শক্তির আশ্রয় ছিলো তাকে ধ্বংস করা! এর বিরুদ্ধে কেবল-যে অনার্য্য তা নয়, ইন্দ্র যাঁদের দেবতা তাঁরাও ছিলেন। ইন্দ্র বৃষ্টি-বর্ষণে খাণ্ডবের আগুন নেবাবার চেষ্টা ক'রেছিলেন।

মহাভারতেরও অর্থ পাওয়া যায় লক্ষ্যবেধের মধ্যে। এই শূন্যস্থিত লক্ষ্যবেধের মধ্যে এমন একটি সাধনার সঙ্কেত আছে, যে-একাগ্রসাধনার দ্বারা কৃষ্ণাকে পাওয়া যায়; আর এই যজ্ঞসম্ভবা কৃষ্ণা এমন একটি তত্ত্ব, যাকে নিয়ে একদিন ভারতবর্ষে বিষম দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিলো। এ'কে একদল স্বীকার ক'রেছিলো, একদল স্বীকার করেনি। কৃষ্ণাকে পঞ্চ পাণ্ডব গ্রহণ ক'রেছিলেন, কিন্তু কৌরবেরা তাঁকে অপমান

ক'রতে ত্রুটি করেন নি। এই যুদ্ধে কুরুসেনাপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য, আর পাণ্ডববীর অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন কৃষ্ণ। রামের অস্ত্রদীক্ষা যেমন বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে, অর্জ্জুনের যুদ্ধদীক্ষা তেমনি কৃষ্ণের কাছ থেকে। বিশ্বামিত্র স্বয়ং লড়াই করেন নি, কিন্তু লড়াইয়ের প্রেরণা তাঁর কাছ থেকে; কৃষ্ণও স্বয়ং লড়াই করেন নি কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রবর্ত্তন ক'রেছিলেন তিনি,—ভগবদ্গীতাতেই এই যুদ্ধের সত্য এই যুদ্ধের ধর্ম্ম ঘোষিত হ'য়েচে, সেই ধর্ম্মের সঙ্গে কৃষ্ণ একাত্মক, যে-কৃষ্ণ কৃষ্ণার সখা, অপমান কালে কৃষ্ণা যাঁকে স্মরণ ক'রেছিলেন ব'লে তাঁর লজ্জা রক্ষা হ'য়েছিলো, যে-কৃষ্ণের সম্মাননার জন্যেই পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞ। রাম দীর্ঘকাল সীতাকে নিয়ে যে-বনে ভ্রমণ ক'রেছিলেন সে ছিলো অনার্য্যদের বন, আর কৃষ্ণাকে নিয়ে পাণ্ডবেরা ফিরেছিলেন যে-বনে সে হ'চ্চে ব্রাহ্মণ ঋষিদের বন। পাণ্ডবদের সাহচর্য্যে এই বনে কৃষ্ণার প্রবেশ ঘটেছিলো। সেখানে কৃষ্ণা তাঁর অক্ষয় অন্ন-পাত্র থেকে অতিথিদের অন্নদান ক'রেছিলেন। ভারতবর্ষে একটা দ্বন্দ্ব ছিলো অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের, আর একটা দ্বন্দ্ব বেদের ধর্ম্মের সঙ্গে কৃষ্ণের ধর্ম্মের। লঙ্কা ছিলো অনার্য্য শক্তির পুরী, সেইখানে আর্য্যের হ'লো জয়; কুরুক্ষেত্র ছিলো কৃষ্ণ-বিরোধী কৌরবের ক্ষেত্র সেইখানে কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডব জয়ী হ'লেন। সব ইতিহাসেই বাইরের দিকে অন্ন নিয়ে যুদ্ধ, আর ভিতরের দিকে তত্ত্ব নিয়ে যুদ্ধ। প্রজা বেড়ে যায়, তখন খাদ্য নিয়ে টানাটানি পড়ে, তখন নব নব ক্ষেত্রে

কৃষিকে প্রসারিত ক'র্‌তে হয়। চিত্তের প্রসার বেড়ে যায়, তখন যারা সঙ্কীর্ণ প্রথাকে আঁক্‌ড়ে থাকে তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধে যারা সত্যকে প্রশস্ত ও গভীর ভাবে গ্রহণ ক'র্‌তে চায়। এক সময়ে ভারতবর্ষে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ প্রবল হ'য়েছিলো ; এক-পক্ষ বেদমন্ত্রকেই ব্রহ্ম ব'ল্‌তেন, অন্য পক্ষ ব্রহ্মকে পরমাত্মা ব'লে জেনেছিলেন। বুদ্ধদেব যখন তাঁর ধর্ম্ম প্রচার সুরু করেন তা'র পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে মতের দ্বন্দ্ব তাঁর পথ অনেকটা পরিষ্কার ক'রে দিয়েচে।

রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে ভারতবর্ষের যে-মূল ইতিহাস নানা কাহিনীতে বিজড়িত, তাকে স্পষ্টতর ক'রে দেখ্‌তে পাবো যখন এখানকার পাঠগুলি মিলিয়ে দেখ্‌বার সুযোগ হবে। কথায়-কথায় এখানকার একজনের কাছে শোনা গেলো যে, দ্রোণাচার্য্য ভীমকে কৌশলে বধ কর্‌বার জন্যে কোনো-এক অসাধ্য কর্ম্মে পাঠিয়েছিলেন। দ্রুপদ-বিদ্বেষী দ্রোণ-যে পাণ্ডবদের অনুকূল ছিলেন না তা'র হয়তো প্রমাণ এখানকার মহাভারতে আছে।

রামায়ণের কাহিনী সম্বন্ধে আর-একটি কথা আমার মনে আস্‌চে সেটা এখানে ব'লে রাখি। কৃষির ক্ষেত্র দুরকম ক'রে নষ্ট হ'তে পারে,—এক বাইরের দৌরাত্ম্যে, আর-এক নিজের অযত্নে। যখন রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গেলো তখন রামের সঙ্গে সীতার আবার মিলন হ'তে পেরেছিলো। কিন্তু যখন অযত্নে অনাদরে রাম-সীতার বিচ্ছেদ ঘ'ট্‌লো তখন পৃথিবীর কন্যা সীতা পৃথিবীতেই

মিলিয়ে গেলেন। অযত্নে নির্ব্বাসিতা সীতার গর্ভে যে-যমজ সন্তান জন্মেছিলো তা'দের নাম লব কুশ। লবের মূল ধাতুগত অর্থ ছেদন, কুশের জানাই আছে। কুশ ঘাস একবার জন্মালে ফসলের ক্ষেতকে-যে কী রকম নষ্ট করে সেও জানা কথা। আমি যে-মানেটা আন্দাজ ক'র্‌চি সেটা যদি একেবারেই অগ্রাহ্য না হয় তা হ'লে লবের সঙ্গে কুশের একত্র জন্মানোর ঠিক তাৎপর্য্য কী হ'তে পারে এ-কথা আমি পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি।

অন্যদের চিঠি থেকে খবর পেয়ে থাক্‌বে-যে এখানে আমরা প্রকাণ্ড একটা অন্ত্যেষ্টিসৎকারের অনুষ্ঠান দেখ্‌তে এসেচি। মোটের উপরে এটা কতকটা চীনেদের মতো— তা'রাও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এই রকম ধূমধাম সাজসজ্জা বাজনাবাদ্য ক'রে থাকে। কেবল মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতির ভঙ্গিটা হিন্দুদের মতো। দাহক্রিয়াটা এরা হিন্দুদের কাছ থেকে নিয়েচে। কিন্তু কেমন মনে হয় ওটা যেন অন্তরের সঙ্গে নেয়নি। হিন্দুরা আত্মাকে দেহের অতীত ক'রে দেখ্‌তে চায়, তাই মৃত্যুর পরেই পুড়িয়ে ফেলে দেহের মমতা থেকে একেবারে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে। এখানে মৃত দেহকে অনেক সময়েই বহু বৎসর ধ'রে রেখে দেয়। এই রেখে-দেবার ইচ্ছেটা কবর দেবার ইচ্ছেরই সামিল। এদের রীতির মধ্যে এরা দেহটাকে রেখে দেওয়া আর দেহটাকে পোড়ানো এই দুই উল্টো প্রথার মধ্যে যেন রফা নিষ্পত্তি ক'রে নিয়েচে। মানুষের মনঃপ্রকৃতির বিভিন্নতা স্বীকার

ক'রে নিয়ে হিন্দুধর্ম্ম রফানিষ্পত্তি সূত্রে কত বিপরীত রকম রাজিনামা লিখে দিয়েচে তা'র ঠিকানা নেই। ভেদ নষ্ট ক'রে ফেলে হিন্দুধর্ম্ম ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেনি, ভেদ রক্ষা ক'রেও সে একটা ঐক্য আন্‌তে চেয়েচে।

কিন্তু এমন ঐক্য সহজ নয় ব'লেই এর মধ্যে দৃঢ় ঐক্যের শক্তি থাকে না। বিভিন্ন বহুকে এক ব'লে স্বীকার ক'রেও তা'র মাঝে মাঝে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল তুলে দিতে হয়। এ'কে অবিচ্ছিন্ন এক বলা যায় না, এ'কে ব'ল্‌তে হয় বিভক্ত এক। ঐক্য এ'তে ভারগ্রস্ত হয়, ঐক্য এ'তে শক্তিমান হয় না। আমাদের দেশের স্বধর্ম্মানুরাগী অনেকেই বালিদ্বীপের অধিবাসীদের আপন ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে উৎসুক হবেন—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই নিজের সমাজ থেকে ওদের দূরে ঠেকিয়ে রাখ্‌বেন। এইখানে প্রতিযোগিতায় মুসলমানের সঙ্গে আমাদের হারতেই হয়। মুসলমানে মুসলমানে এক মুহূর্ত্তেই সম্পূর্ণ জোড় লেগে যায়, হিন্দুতে হিন্দুতে তা লাগে না। এই জন্যেই হিন্দুর ঐক্য আপন বিপুল অংশ-প্রত্যংশ নিয়ে কেবলি নড়্‌নড়্‌ ক'র্‌চে। মুসলমান যেখানে আসে সেখানে সে-যে কেবলমাত্র আপন বল দেখিয়ে বা যুক্তি দেখিয়ে বা চরিত্র দেখিয়ে সেখানকার লোককে আপন সম্প্রদায়ভুক্ত করে তা নয়, সে আপন সন্ততিবিস্তার দ্বারা সজীব ও ধারাবাহিক ভাবে আপন ধর্ম্মের বিস্তার করে। জাতির, এমন কি, পরজাতির লোকের সঙ্গে বিবাহে তা'র কোনো বাধা নেই। এই অবাধ বিবাহের দ্বারা সে আপন সামাজিক অধিকার

সর্ব্বত্র প্রসারিত ক'র্‌তে পারে। কেবলমাত্র রক্তপাতের রাস্তা দিয়ে নয়, রক্তমিশ্রণের রাস্তা দিয়ে সে দূরে দূরান্তরে প্রবেশ ক'র্‌তে পেরেচে। হিন্দু যদি তা পার্‌তো তা হ'লে বালিদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম স্থায়ী, বিশুদ্ধ, ও পরিব্যাপ্ত হ'তে দেরি হ'তো না।

গিয়ানয়ার
১ আগষ্ট, ১৯২৭।

(৮)

গোলমাল ঘোরাফেরা দেখাশোনা বলা-কওয়া নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের ফাঁকে ফাঁকে যখন-তখন দুচার লাইন ক'রে লিখি, ভাবের স্রোত আট্‌কে আট্‌কে যায়, তা'র সহজ গতিটা থাকে না। এ'কে চিঠি বলা চলে না। কেননা এর ভিতরে ভিতরে কর্ত্তব্যপরায়ণতার ঠেলা চ'ল্‌চে—সেটাতে কাজকে এগিয়ে দেয়, ভাবকে হয়রান করে। পাখী-ওড়ায় আর ঘুড়ি-ওড়ায় তফাৎ আছে। আমি ওড়াচ্চি চিঠির ছলে লেখার ঘুড়ি—কর্ত্তব্যের লাঠাইয়ে বাঁধা—কেবলি হেঁচ্‌কে হেঁচ্‌কে ওড়াতে হয়।

ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েচি। দিনের মধ্যে দুতিন রকমের প্রোগ্রাম। নতুন নতুন জায়গায় বক্তৃতা, নিমন্ত্রণ ইত্যাদি,

গীতার উপদেশ যদি মান্‌তুম, ফল-লাভের প্রত্যাশা যদি না থাক্‌তো তা হ'লে পাল-তোলা নৌকার মতো জীবনতরণী তীর থেকে তীরান্তরে নেচে নেচে যেতে পার্‌তো। চ'লেচি উজান বেয়ে, গুণ টেনে, লগি ঠেলে, দাঁড় বেয়ে, পদে পদে জিব বেরিয়ে প'ড়্‌চে। আমৃত্যুকাল কোনোদিন কোথাও-যে সহজে ভ্রমণ ক'র্‌তে পারবো সে আশা বিড়ম্বনা। পথ সুদীর্ঘ, পাথেয় স্বল্প; অর্জ্জন ক'র্‌তে ক'র্‌তে গর্জ্জন ক'র্‌তে ক'র্‌তে, হোটেলে হোটেলে ডলার বর্জ্জন ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমার ভ্রমণ—গলা চালিয়ে আমার পা চালানো। পথে বিপথে যেখানে-সেখানে আচম্‌কা আমাকে বক্তৃতা ক'র্‌তে বলে, আমিও উঠে দাঁড়িয়ে ব'কে যাই—আমেরিকায় মুড়ি তৈরি কর্‌বার কলের মুখ থেকে যেমন মুড়ি বেরোতে থাকে সেই রকম। হাসিও পায় দুঃখও ধরে। পৃথিবীর পনেরো-আনা লোক কবিকে নিয়ে সর্ব্বসমক্ষে এই রকম অপদস্থ ক'র্‌তেই ভালোবাসে, "বলে মেসেজ্‌ দাও।" মেসেজ্‌ ব'ল্‌তে কী বুঝায় সেটা ভেবে দেখো। সর্ব্বসাধারণ নামক নির্ব্বিশেষ পদার্থের উদাসীন কানের কাছে অত্যন্ত নির্ব্বিশেষ ভাবের উপদেশ দেওয়া, যা কোনো বাস্তব মানুষের কোনো বাস্তব কাজেই লাগে না। পরলোকগত বহুসংখ্যক পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পাইকেড়ি প্রথায় পিণ্ডি দেওয়ার মতো,—যেহেতু সে-পিণ্ড কেউ খায় না, সেই জন্যে তাতে না আছে স্বাদ, না আছে শোভা। যেহেতু সেটা রসনাহীন ও ক্ষুধাহীন নাম-মাত্রের জন্যে উৎসর্গ-করা সেই জন্যে সেটাকে যথার্থ খাদ্য

ক'রে তোলার জন্যে কারো গরজ নেই। মেসেজ্‌-রচনা সেই রকম রচনা।

আজ বিকেলের গাড়িতে পিনাঙ যেতে হবে। তা'র আগে, যদি সুসাধ্য হয় তবে, নাওয়া আছে, খাওয়া আছে, যদি দুঃসাধ্য হয় তবু একটা মিটিঙে গিয়ে বক্তৃতা আছে, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, অবকাশ নেই; তা'রপরে সুদীর্ঘ রেলযাত্রা, তা'রপরে ষ্টেশনে মাল্যগ্রহণ, এড্রেস্‌ শ্রবণ, তদুত্তরে বিনতি প্রকাশ, তা'রপরে নতুন বাসায় নতুন জনতার মধ্যে জীবনযাত্রার নতুন ব্যবস্থা, তা'রপরে ১৬ই তারিখে জাহাজে চ'ড়ে জাভায় যাত্রা—তা'রপরে নতুন অধ্যায়। ইতি

১৩ অগস্ট্‌ ১৯২৭
টাইপিঙ

"শ্রীবিজয়"-লক্ষ্মী

তোমায় আমায় মিল হ'য়েচে কোন্‌ যুগে এইখানে,
ভাষায় ভাষায় গাঁঠ প'ড়েচে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।
ডাক পাঠালে আকাশপথে কোঁন্‌ সে পূবেন্‌ বায়ে
দূর সাগরের উপকূলে নারিকেলের ছাঁয়ে।

গঙ্গাতীরের মন্দিরেতে সেদিন শঙ্খ বাজে,
তোমার বাণী এপার হ'তে মিল্‌লো তারি মাঝে।
বিষ্ণু আমায় কইলো কানে, ব'ল্‌লে দশভুজা—
"অজানা ঐ সিন্ধুতীরে নেবো আমার পূজা।"
মন্দাকিনীর কলধারা সেদিন ছলোছলো
পূব-সাগরে হাত বাড়িয়ে ব'ল্‌লে, "চলো, চলো।"
রামায়ণের কবি আমায় কইলো আকাশ হ'তে—
"আমার বাণী পার ক'রে দাও দূর সাগরের স্রোতে।"
তোমার ডাকে উতল হ'লো বেদব্যাসের ভাষা—
ব'ল্‌লে, "আমি ঐ পারেতে বাঁধ্‌বো নতুন বাসা।"
আমার দেশের হৃদয় সেদিন কইলো আমার কানে—
"আমায় ব'য়ে যাও গো ল'য়ে সুদূর দেশের পানে।"—
সেদিন প্রাতে সুনীল জলে ভাস্‌লো আমার তরী,
শুভ্র পালে গর্ব্ব জাগায় শুভ হাওয়ায় ভরি'।
তোমার ঘাটে লাগ্‌লো এসে জাগ্‌লো সেথায় সাড়া,
কূলে কূলে কানন-লক্ষ্মী দিলো আঁচল নাড়া॥

প্রথম দেখা আব্‌ছায়াতে আঁধার তখন ধরা,
সেদিন সন্ধ্যা সপ্তঋষির আশীর্ব্বাদে ভরা।
প্রাতে মোদের মিলন-পথে উষা ছড়ায় সোনা,
সে-পথ বেয়ে লাগ্‌লো দোঁহার প্রাণের আনাগোনা।
দুইজনেতে বাঁধ্‌নু বাসা পাথর দিয়ে গেঁথে,
দুইজনেতে বস্‌নু সেথায় একটি আসন পেতে॥

বিরহরাত ঘনিয়ে এলো কোন্ বরষের থেকে,
কালের রথের ধূলা উড়ে দিলো আসন ঢেকে।
বিস্মরণের ভাঁটা বেয়ে কবে এলেম ফিরে
ক্লান্ত হাতে রিক্ত মনে একা আপন তীরে।
বঙ্গসাগর বহু বরষ বলেনি মোর কানে
সে-যে কভু সেই মিলনের গোপন কথা জানে।
জাহ্নবীও আমার কাছে গাইলো না সেই গান
সুদূর পারের কোথায় যে তা'র আছে নাড়ীর টান॥

এবার আবার ডাক শুনেছি, হৃদয় আমার নাচে,
হাজার বছর পার হ'য়ে আজ আসি তোমার কাছে।
মুখের পানে চেয়ে তোমায় আবার পড়ে মনে
আরেক দিনের প্রথম দেখা তোমার শ্যামল বনে।
হয়েছিলো রাখীবাঁধন সেদিন শুভপ্রাতে·
সেই রাখী-যে আজও দেখি তোমার দখিন হাতে।
এই যে-পথে হয়েছিলো মোদের যাওয়া-আসা
আজো সেথায় ছড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা।
সে-চিহ্ন আজ বেয়ে বেয়ে এলেম শুভক্ষণে—
সেই সে-দিনের প্রদীপ-জ্বালা প্রাণের নিকেতনে।
আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো,
নূতন-পাওয়া পুরানোকে আপন ব'লে জেনো॥

জাভা

২১ আগষ্ট, ১৯২৭

(৯)

শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত।

কল্যাণীয়াসু,—

বৌমা, মালয় উপদ্বীপের বিবরণ আমাদের দলের লোকের চিঠিপত্র থেকে নিশ্চয় পেয়েচো। ভালো ক'রে দেখ্‌বার মতো ভাব্‌বার মতো লেখ্‌বার মতো সময় পাইনি। কেবল ঘুরেচি আর ব'কেচি। পিনাঙ থেকে জাহাজে চ'ড়ে প্রথমে জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় এসে পৌঁছ'নো গেলো। আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বড়ো সহর মাত্রই দেশের সহর নয়, কালের সহর। সবাই আধুনিক। সবাই মুখের চেহারায় একই, কেবল বেশভূষায় কিছু তফাৎ। অর্থাৎ কারো-বা পাগড়িটা ঝক্‌ঝকে কিন্তু জামায় বোতাম নেই, ধুতিখানা হাঁটু পর্য্যন্ত, ছেঁড়া চাদরখানায় ধোপ পড়ে না, যেমন ক'লকাতা;—কারো-বা আগাগোড়াই ফিট্‌ফাট্‌ ধোয়া-মাজা উজ্জ্বল বসনভূষণ, যেমন বাটাভিয়া। সহর-গুলোর মুখের চেহারা একই ব'লেচি, কথাটা ঠিক নয়। মুখ দেখা যায় না, মুখোষ দেখি। সেই মুখোষগুলো এক কারখানায় একই ছাঁচে ঢালাই-করা। কেউ-বা সেই মুখোষ পরিষ্কার পালিশ ক'রে রাখে, কারো বা হেলায়-ফেলায়

মলিন। ক'লকাতা আর বাটাভিয়া উভয়েই এক আধুনিক কালের কন্যা, কেবল জামাতারা স্বতন্ত্র, তাই আদরযত্নে অনেক তফাৎ। শ্রীমতী বাটাভিয়ার সীঁথি থেকে চরণ-চক্র পর্য্যন্ত গয়নার অভাব নেই। তা'র উপরে সাবান দিয়ে গা মাজা-ঘষা ও অঙ্গলেপ দিয়ে ঔজ্জ্বল্য-সাধন চ'ল্‌চেই। ক'লকাতার হাতে নোয়া আছে কিন্তু বাজুবন্দ দেখিনে। তা'র পরে যে-জলে তা'র স্নান সে-জলও যেমন, আর যে-গামছায় গা-মোছা, তা'রও সেই দশা। আমরা চিৎপুর বিভাগের পুরবাসী, বাটাভিয়ায় এসে মনে হয় কৃষ্ণপক্ষ থেকে শুক্লপক্ষে এলুম।

হোটেলের খাঁচায় ছিলেম দিন তিনেক; অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় নি। সমস্ত বিবরণ বোধ হয় সুনীতি কোনো-এক সময়ে লিখ্‌বেন। কেননা সুনীতির যেমন দর্শনশক্তি তেমনি ধারণাশক্তি। যত বড়ো তাঁর আগ্রহ তত বড়োই তাঁর সংগ্রহ। যা-কিছু তাঁর চোখে পড়ে সমস্তই তাঁর মনে জমা হয়। কণামাত্র নষ্ট হয় না। নষ্ট-যে হয় না সে দুদিক থেকেই, রক্ষণে এবং দানে। তন্নষ্টং যন্নদীয়তে। বুঝ্‌তে পার্‌চি তাঁর হাতে আমাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লেশমাত্র ব্যর্থ হবে না, লুপ্ত হবে না।

বাটাভিয়া থেকে জাহাজে ক'রে বালী দ্বীপের দিকে রওনা হলুম। ঘণ্টা কয়েকের জন্যে সুরবায়া সহরে আমাদের নামিয়ে নিলে। এও একটা আধুনিক সহর; জাভার আঙ্গিক নয়, জাভার আনুষঙ্গিক। আলাদিনের প্রদীপের

মন্ত্রে সহরটাকে নিউজীলণ্ডে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেও খাপছাড়া হয় না।

পার হ'য়ে এলেম বালী দ্বীপে। দেখ্‌লেম ধরণীর চির-যৌবনা মূর্ত্তি। এখানে প্রাচীন শতাব্দী নবীন হ'য়ে আছে। এখানে মাটির উপর অন্নপূর্ণার পাদপীঠ শ্যামল আস্তরণে দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তীর্ণ; বনচ্ছায়ার অঙ্ক-লালিত লোকালয় গুলিতে স্বচ্ছল অবকাশ। সেই অবকাশ উৎসবে অনুষ্ঠানে নিত্যই পরিপূর্ণ।

এই দ্বীপটুকুতে রেলগাড়ি নেই। রেলগাড়ি আধুনিক কালের বাহন। আধুনিক কালটি অত্যন্ত কৃপণ কাল, কোনো দিকে একটুমাত্র বাহুল্যের বরাদ্দ রাখ্‌তে চায় না। এই কালের মানুষ বলে Time is money। তাই কালের বাজে খরচ বন্ধ কর্‌বার জন্যে রেলের এঞ্জিন হাঁফাতে হাঁফাতে, ধোঁয়া ওগ্‌রাতে ওগ্‌রাতে মেদিনী কম্পমান ক'রে দেশদেশান্তরে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চে। কিন্তু এই বালী দ্বীপে বর্ত্তমান কাল শত শত অতীত শতাব্দী জুড়ে এক হ'য়ে আছে। এখানে কাল সংক্ষেপ কর্‌বার কোনো দরকার নেই। এখানে যা-কিছু আছে তা চিরদিনের; যেমন একালের তেম্‌নি সেকালের। ঋতুগুলি যেমন চ'লেচে নানা রঙের ফুল ফোটাতে ফোটাতে, নানা রসের ফল ফলাতে ফলাতে, এখানকার মানুষ বংশপরম্পরায় তেম্‌নি চ'লেচে নানা রূপে বর্ণে গীতে নৃত্যে অনুষ্ঠানের ধারা বহন ক'রে।

রেলগাড়ি এখানে নেই কিন্তু আধুনিক কালের ভবঘুরে যারা এখানে আসে তাদের জন্যে আছে মোটর গাড়ি। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের দেখাশুনো ভোগ-করা শেষ-করা চাই। আ'রা আঁটকালের মানুষ এসে প'ড়েচে অপর্য্যাপ্ত কালের দেশে। এখানকার অরণ্য পর্ব্বত লোকালয়ের মাঝখান দিয়ে ধূলো উড়িয়ে চ'লেচি আর কেবলি মনে হ'চ্চে এখানে পায়ে-হেঁটে চলা উচিত। যেখানে পথের দুইধারে ইমারত সেখানে মোটরের সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষুকে দৌড় করালে খুব বেশি লোকসান হয় না; কিন্তু পথের দুধারে যেখানে রূপের মেলা সেখানকার নিমন্ত্রণ সার্‌তে গেলে গরজের মোটরটাকে গারাজেই রেখে আস্‌তে হয়। মনে নেই কি, শিকার ক'র্‌তে দুষ্মন্ত যখন রথ ছুটিয়েছিলেন তখন তা'র বেগ কত; এই হ'চ্চে যাকে বলে প্রোগ্রেস্, লক্ষ্য-ভেদ কর্‌বার জন্যে তাড়াহুড়ো। কিন্তু তপোবনের সাম্‌নে এসে তাঁকে রথ ফেলে নাম্‌তে হ'লো, লক্ষ্যসাধনের লোভে নয়, তৃপ্তি-সাধনের আশায়। সিদ্ধির পথে-চলা দৌড়ে, সুন্দরের পথে-চলা ধীরে। আধুনিক কালে সিদ্ধির লোভ প্রকাণ্ড প্রবল, তাই আধুনিক কালের বাহনের বেগ কেবলি বেড়ে যাচ্চে। যা-কিছু গভীরভাবে নেবার যোগ্য, দৃষ্টি তাকে গ্রহণ না ক'রে স্পর্শ ক'রেই চ'লে যায়। এখন হ্যামলেটের অভিনয় অসম্ভব হ'লো, হ্যামলেটের সিনেমার হ'লো জিৎ।

আমাদের মোটর যেখানে এসে থাম্‌লো সেখানে এক

বিপুল উৎসব। জায়গাটার নাম বাঙলি। কোনো-এক রাজবংশের কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এর মধ্যে শোকের চিহ্ন নেই। না থাক্‌বারই কথা,—রাজার মৃত্যু হ'য়েচে অনেক-দিন আগে, এতদিনে তাঁর আত্মা দেবসভায় উত্তীর্ণ, উৎসব তাই নিয়ে। বহুদূর থেকে গ্রামের পথে-পথে মেয়ে পুরুষেরা ভারে-ভারে বিচিত্র রকমের নৈবেদ্য নিয়ে আস্‌চে;—যেন কোন্ পুরাণে বর্ণিত যুগ হঠাৎ আমাদের চোখের সাম্‌নে বেঁচে উঠ্‌লো; যেন অজন্তার শিল্পকলা চিত্রলোক থেকে প্রাণলোকে সূর্য্যের আলো ভোগ ক'র্‌তে এসেচে। মেয়েদের বেশভূষা অজন্তার ছবিরই মতো। এখানে আবরণ-বিরলতার স্বাভাবিক আবরু সুন্দর হ'য়ে দেখা দিলো, সেটা চারিদিকের সঙ্গে সুসঙ্গত; এমন কি, যে-কয়েকজন আমেরিকান মিশনরি দর্শকরূপে এখানে এসেচে, আশা করি তা'রাও এই দৃশ্যের সুশোভন সুরুচি সহজ-মনে অনুভব ক'র্‌তে পেরেচে।

যজ্ঞক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। এই উপলক্ষ্যে সেখানে অনেকগুলি বাঁশের উঁচু মাচা-বাঁধা ঘরে এখানকার ব্রাহ্মণেরা সুসজ্জিত হ'য়ে শিখা বেঁধে ভূরি ভূরি খাদ্যবস্ত্র ফলপুষ্পপত্রের নৈবেদ্যের মধ্যে নানা রকম মুদ্রা সহযোগে মন্ত্র প'ড়্‌চে; তা'রা কেউ-বা কত রকম অর্ঘ্য উপকরণ তৈরি ক'র্‌চে। কোথাও-বা এখানকার বহুযন্ত্রমিলিত সঙ্গীত; এক জায়গায় তাঁবুর মধ্যে পৌরাণিক যাত্রার অভিনয়। উৎসবের এত অতি-বৃহৎ আনুষ্ঠানিক বৈচিত্র্য আর কোথাও দেখিনি অথচ কোথাও অসুন্দর বা বিশৃঙ্খল কিছু নেই,—বিপুল

সমারোহের দৃশ্যরূপটি বস্তু-রাশির অসংলগ্নতায় বা জনতার ঠেলাঠেলিতে খণ্ড-বিখণ্ড হ'য়ে যায় নি। এতগুলি মানুষের সমাবেশ, অথচ গোলমাল বা নোংরামি বা অব্যবস্থা নেই। উৎসবের অন্তর্নিহিত সুন্দর ঐক্যবন্ধনেই সমস্ত ভিড়ের লোককে আপনিই সংযত ক'রে বেঁধেচে। সমস্ত ব্যাপারটি এত বৃহৎ এত বিচিত্র আর আমাদের পক্ষে এত অপূর্ব্ব যে এর বিস্তারিত বর্ণনা করা অসম্ভব। হিন্দু অনুষ্ঠানবিধির সঙ্গে এদেশের লোকের চিত্তবৃত্তির মিল হ'য়ে এই যে সৃষ্টি, এর রূপের প্রাচুর্য্যটিই বিশেষ ক'রে দেখ্‌বার ও ভাব্‌বার জিনিষ। অপরিমিত উপকরণের দ্বারা নিজেকে অশেষভাবে প্রকাশ কর্‌বার চেষ্টা, সেই প্রকাশ কেবলমাত্র বস্তুকে পুঞ্জিত ক'রে নয়, তাকে নানা নিপুণ রীতিতে সজ্জিত ক'রে।

জাপানের সঙ্গে এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থার মিল আছে। জাপানের মতোই এখানে দ্বীপটি আয়তনে ছোটো, অথচ এখানে প্রকৃতির রূপটি বিচিত্র, এবং তা'র সৃষ্টিশক্তি প্রচুরভাবে উর্ব্বরা। পদে-পদেই পাহাড় ঝর্‌না নদী প্রান্তর অরণ্য অগ্নিগিরি সরোবর। অথচ দেশটি চলা-ফেরার পক্ষে সুগম, নদী-পর্ব্বতের পরিমাণ ছোটো, প্রজাসংখ্যা বেশি, ভূমির পরিমাণ কম, এই জন্যে কৃষির উৎকর্ষ দ্বারা চাষের-যোগ্য সমস্ত জমি সম্পূর্ণরূপে এরা চ'ষে ফেলেচে, ক্ষেতে ক্ষেতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল সেঁচ দেবার ব্যাপক ব্যবস্থা এদেশে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত। এখানে দারিদ্র্য নেই, রোগ নেই, জলবায়ু সুখকর। দেবদেবীবহুল, কাহিনীবহুল,

অনুষ্ঠানবহুল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গত,—সেই প্রকৃতি এখানকার শিল্পকলায়, সামাজিক অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্যের প্রবর্ত্তনা ক'রেচে।

জাপানের সঙ্গে এর মস্ত একটা তফাৎ। জাপান শীতের দেশ, জাভা বালী গরমের দেশ। জাপান অন্য শীতের দেশের লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে, জাভা বালী তা পারে নি। আত্মরক্ষার জন্যে যে-দৃঢ়নিষ্ঠ অধ্যবসায় দরকার এদের তা ছিলো না। গরম হাওয়া প্রাণের প্রকাশকে যেমন তাড়াতাড়ি পরিণত করে, তেম্‌নি তাড়াতাড়ি ক্ষয় ক'র্‌তে থাকে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শক্তিকে সে শিথিল করে, জীবনের অধ্যবসায়কে ক্লান্ত ক'রে দেয়। বাটাভিয়া সহরটি-যে এমন নিখুঁত ভাবে পরিপাটি পরিচ্ছন্ন তা'র কারণ, শীতের দেশের মানুষ এর ভার নিয়েচে; তাদের শীতের দেশের দেহে শক্তি অনেক-কাল থেকে বংশানুক্রমে অস্থিতে মজ্জাতে পেশীতে স্নায়ুতে পুঞ্জীভূত, তাই তাদের অক্লান্ত মন সর্ব্বত্র ও প্রতিমুহূর্ত্তে আপনাকে প্রয়োগ ক'র্‌তে পারে। আমরা কেবলি বলি, যথেষ্ট হ'য়েচে, তুমিও যেমন, চ'লে যাবে। যত্ন জিনিষটা কেবল হৃদয়ের জিনিষ নয়, শক্তির জিনিষ। অনুরাগের আগুনকে জ্বালিয়ে রাখ্‌তে শক্তির প্রাচুর্য্য চাই। শক্তি-সঞ্চয় যেখানে অল্প সেখানে আপনিই বৈরাগ্য এসে পড়ে। বৈরাগ্য নিজের উপর থেকে সমস্ত দাবী কমিয়ে দেয়। বাইরের অসুবিধা, অস্বাস্থ্য, অব্যবস্থা সমস্তই মেনে নেয়।

নিজেকে ভোলাবার জন্যে ব'লতে চেষ্টা করে যে, ও গুলো সহ্য করার মধ্যে যেন মহত্ত্ব আছে। যার শক্তি অজস্র সে সমস্ত দাবী মেনে নিতে আনন্দ পায়, এই জন্যেই সে জোরের সঙ্গে বেঁচে থাকে, ধ্বংসের কাছে সহজে ধরা দিতে চায় না। য়ুরোপে গেলে সব চেয়ে আমার চোখে পড়ে মানুষের এই সদা-জাগ্রত যত্ন। যাকে বলি বিজ্ঞান, সায়ান্স, তা'র প্রধান লক্ষণ হ'চ্চে জ্ঞানের জন্যে অপরাজিত যত্ন। কোথাও আন্দাজ খাটবে না, খেয়ালকে মানবে না, ব'লবে না ধ'রে নেওয়া যাক্, ব'লবে না সর্ব্বজ্ঞ ঋষি এই কথা ব'লে গেচেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নীতির ক্ষেত্রে যখন আত্মশক্তির ক্লান্তি আসে তখন বৈরাগ্য দেখা দেয়; সেই বৈরাগ্যের অযত্নের ক্ষেত্রেই ঋষিবাক্য, বেদবাক্য, গুরুবাক্য, মহাত্মাদের অনুশাসন আগাছার জঙ্গলের মতো জেগে ওঠে, নিত্যপ্রয়াসসাধ্য জ্ঞানসাধনার পথ রুদ্ধ ক'রে ফেলে। বৈরাগ্যের অযত্নে দিনে দিনে চারিদিকে যে-প্রভূত আবর্জ্জনায় অবরোধ জ'মে ওঠে তাতেই মানুষের পরাভব ঘটায়। বৈরাগ্যের দেশে শিল্পকলাতেও মানুষ অন্ধ পুনরাবৃত্তির প্রদক্ষিণ পথে চলে, এগোয় না, কেবলি ঘোরে। মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠী ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ করে, হাজার বছর আগে যে-মন্দির তৈরি হ'য়েচে ঠিক তারি নকল করবার জন্যে। তা'র বেশি তা'র সাহস নেই, ক্লান্ত মনের শক্তি নেই, পাখীর অসাড় ডানা খাঁচার বাইরে নিজেকে মেলে দিতে আনন্দ পায় না। খাঁচার কাছে হার মেনে যে-পাখী চিরকালের মতো

ধরা দিয়েচে সমস্ত বিশ্বের কাছে তাকে হার মান্‌তে হ'লো।

এদেশে এসে প্রথমে আনন্দ হয় এখানকার সব অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্য্যে। তা'রপরে ক্রমে মনে সন্দেহ হ'তে থাকে এ হয়তো খাঁচার সৌন্দর্য্য, নীড়ের সৌন্দর্য্য নয়,—এর মধ্যে হয়তো চিত্তের স্বাধীনতা নেই। অভ্যাসের যন্ত্রে নিখুঁৎ নকল শত শত বৎসর ধ'রে ধারাবাহিক ভাবে চ'লেচে। আমরা যারা এখানে বাহির থেকে এসেচি আমাদের একটা দুর্লভ সুবিধা ঘ'টেচে এই যে, আমরা অতীত কালকে বর্ত্তমানভাবে দেখ্‌তে পাচ্চি। সেই অতীত মহৎ, সেই অতীতের ছিলো প্রতিভা, যাকে বলে নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি; তা'র প্রাণশক্তির বিপুল উদ্যম আপন শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রচুরভাবে আপন পরিচয় দিয়েচে। কিন্তু তবুও সে অতীত, তা'র উচিত ছিলো বর্ত্তমানের পিছনে পড়া, সামনে এসে দাঁড়িয়ে বর্ত্তমানকে সে ঠেকিয়ে রাখলো কেন? বর্ত্তমান সেই অতীতের বাহন মাত্র হ'য়ে ব'ল্‌চে, আমি হা'র মান্‌লুম; সে দীনভাবে ব'ল্‌চে এই অতীতকে প্রকাশ ক'রে রাখাই আমার কাজ, নিজেকে লুপ্ত ক'রে দিয়ে। নিজের পরে বিশ্বাস কর্‌বার সাহস নেই। এই হ'চ্চে নিজের শক্তি-সম্বন্ধে বৈরাগ্য, নিজের 'পরে দাবী যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। দাবী স্বীকার করায় দুঃখ আছে, বিপদ আছে, অতএব বৈরাগ্য-মেবাভয়ং অর্থাৎ বৈনাশ্যমেবাভয়ং।

সেদিন বাঙ্‌লিতে আমরা যে-অনুষ্ঠান দেখেচি সেটা প্রেতাত্মার স্বর্গারোহণ পর্ব্ব। মৃত্যু হ'য়েচে বহু পূর্ব্বে; এতদিনে আত্মা দেব সভায় স্থান পেয়েচে ব'লে এই বিশেষ উৎসব। সুখবতী নামক জেলায় উবুদ্‌ নামক সহরে হবে দাহক্রিয়া, আগামী পাঁচই সেপ্টেম্বরে। ব্যাপারটার মধ্যে আরো অনেক বেশি সমারোহ থাক্‌বে—কিন্তু তবু সেই মাদ্রাজি চেটির ৩৫ লক্ষ টাকার মন্দির। এ বহু বহু শতাব্দীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াই চ'লেচে, এর আর অন্ত নেই। এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এত অসম্ভব রকম ব্যয় হয়-যে সুদীর্ঘকাল লাগে তা'র আয়োজনে—যম আপন কাজ সংক্ষেপে ও সস্তায় সারেন কিন্তু নিয়ম চলে অতি লম্বা ও দুর্ম্মূল্য চালে। এখানে অতীত কালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চ'লেচে বহুকাল ধ'রে, বর্ত্তমান-কালকে আপন সর্ব্বস্ব দিতে হ'চ্চে তা'র ব্যয় বহন কর্‌বার জন্যে।

এখানে এসে বারবার আমার এই কথা মনে হ'য়েচে যে, অতীতকাল যত বড়ো কালই হোক্‌ নিজের সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের একটা স্পর্দ্ধা থাকা উচিত, মনে থাকা উচিত তা'র মধ্যে জয় কর্‌বার শক্তি আছে। এই ভাবটাকে আমি একটি ছোটো কবিতায় লিখেচি, সেটা এইখানে তুলে দিয়ে এই দীর্ঘ পত্র শেষ করি।

নন্দ গোপাল বুক ফুলিয়ে এসে
ব'ল্‌লে আমায় হেসে

"আমার সঙ্গে লড়াই ক'রে কখ্‌খনো কি পারো ?
বারে বারেই হারো।"
আমি ব'ল্‌লেম, "তাই বই কি ! মিথ্যে তোমার বড়াই,
হোক্ দেখি তো লড়াই !"
"আচ্ছা, তবে দেখাই তোমায়," এই ব'লে সে যেম্‌নি টান্‌লে হাত
দাদামশায় তখ্‌খনি চিৎপাত।
সবাইকে সে আন্‌লে ডেকে, চেঁচিয়ে নন্দ ক'রলে বাড়ি মাৎ॥

বারে বারে শুধায় আমায়, "বলো তোমার হার হ'য়েচে না কি।"
আমি কইলেম, "ব'ল্‌তে হবে তা কি ?
ধূলোর যখন নিলেম শরণ প্রমাণ তখন রইল কি আর বাকি ?
এই কথা কি জানো
আমার কাছে নন্দগোপাল যখনি হার মানো
আমারি সেই হার,
লজ্জা সে আমার।
ধূলোয় যেদিন প'ড়বো, যেন এই জানি নিশ্চিত
তোমারি শেষ জিৎ॥

ইতি ৩০শে আগষ্ট, ১৯২৭।

কারেম আসন। বালি

(১০)

শ্রীমতী মীরা দেবীকে লিখিত

কল্যাণীয়াসু

মীরা, যেখানে ব'সে লিখচি এ একটা ডাকবাঙলা; পাহাড়ের উপরে সকাল বেলা, শীতের বাতাস দিচ্চে। আকাশে মেঘগুলো দল বেঁধে আনাগোনা ক'রচে, সূর্য্যকে একবার দিচ্চে ঢাকা, একবার দিচ্চে খুলে। পাহাড় ব'ল্‌লে যে-ছবি মনে জাগে এ একেবারেই সে রকম নয়। শৈল-শিখরশ্রেণী কোথাও দেখা যাচ্চে না,—বারান্দা থেকে অনতিদূরেই সাম্‌নে ঢালু উপত্যকা নেমে গিয়েচে, তলায় একটি ক্ষীণ জলের ধারা এঁকে বেঁকে চ'ল্‌চে,—সাম্‌নে অন্য পারের পাড়ি অর্দ্ধচন্দ্রের মতো, তা'র উপরে নারকেল বন আকাশের গায়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত থাকে-থাকে শস্যের ক্ষেত। পাহাড়ের বুক বেয়ে একটা ভাঙ্গা-চোরা পথ জল পর্য্যন্ত নেমে গেচে। জলধারার কাছেই একটা উৎস। এই উৎসকে এ দেশের লোকে পবিত্র ব'লে জানে;—সমস্ত দিন দেখি, মেয়েরা স্নান করে, জল তুলে নিয়ে যায়। এরা বলে এই জলে স্নান ক'রলে সর্ব্ব পাপ মোচন হয়। বিশেষ

বিশেষ পার্ব্বণ আছে যখন বিস্তর লোক এখানে পুণ্যস্নান ক'র্‌তে আসে। এই জায়গাটার নাম তীর্ত আম্পুল। তীর্ত অর্থাৎ তীর্থ, আম্পুল মানে উৎস,—উৎস তীর্থ।

এই উৎস সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। বহুকাল পূর্ব্বে এক রাজার এক সুন্দরী মেয়ে ছিলো। সেই মেয়েটি রাজার এক পারিষদকে ভালোবেসেছিলো। পারিষদের মনেও যে ভালোবাসা ছিলো না তা নয়, কিন্তু রাজকন্যাকে বিয়ে কর্‌বার যোগ্য তাঁর জাতি-মর্য্যাদা নয় জেনে রাজার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য ক'রে রাজকন্যার ভালোবাসা কর্ত্তব্যবোধে প্রত্যাখ্যান করে। রাজকন্যা রাগ ক'রে তা'র পানীয় দ্রব্যে বিষ মিশিয়ে দেয়। যুবক একটুখানি পান ক'রেই ব্যাপারখানা বুঝতে পারে, কিন্তু পাছে রাজকন্যার নামে অপবাদ আসে তাই পালিয়ে এই জায়গাকার বনে এসে গোপনে মরবার জন্যে প্রস্তুত হয়। দেবতারা দয়া ক'রে এই পুণ্য উৎসের জল খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে দেন।

হিন্দু ভাবের ও রীতির সঙ্গে এদের জীবন কী রকম জড়িয়ে গেচে ক্ষণে ক্ষণে তা'র পরিচয় পেয়ে বিস্ময় বোধ হয়। অথচ হিন্দুধর্ম্ম এখানে কোথাও অমিশ্র ভাবে নেই; এখানকার লোকের প্রকৃতির সঙ্গে মিলে গিয়ে সে একটা বিশেষ রূপ ধ'রেচে; তা'র ভঙ্গীটা হিন্দু, অঙ্গটা এদের। প্রথম দিন এসেই এক জায়গায় কোন্ এক রাজার অন্ত্যেষ্টি সৎকার দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। সাজসজ্জা আয়োজনের উপকরণ আমাদের সঙ্গে মেলে না,—উৎসবের ভাবটা ঠিক

আমাদের শ্রাদ্ধের ভাব নয়; সমারোহের বাহ্য দৃশ্যটা ভারতবর্ষের কোনো-কিছুর অনুরূপ নয়; তবুও এর রকমটা আমাদের মতোই,—মাচার উপরে এখানকার চূড়া-বাঁধা ব্রাহ্মণেরা ঘণ্টা নেড়ে ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে হাতের আঙুলে মুদ্রার ভঙ্গী ক'রে বিড় বিড় শব্দে মন্ত্র প'ড়ে যাচ্চে। আবৃত্তিতে ও অনুষ্ঠানে কিছুমাত্র স্খলন হ'লেই সমস্ত অশুদ্ধ ও ব্যর্থ হ'য়ে যায়। ব্রাহ্মণের গলায় পৈতে নেই। জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেলো এরা "গায়ত্রী" শব্দটা জানে কিন্তু মন্ত্রটা ঠিক জানে না। কেউ-বা কিছু কিছু টুক্‌রো জানে। মনে হয় এক সময়ে এরা সর্ব্বাঙ্গীণ হিন্দুধর্ম্ম পেয়েছিলো, তা'র দেব দেবী, রীতি নীতি, উৎসব অনুষ্ঠান, পুরাণ স্মৃতি সমস্তই ছিলো। তা'র পরে মূলের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলো, ভারতবর্ষ চ'লে গেলো দূরে,—হিন্দুর সমুদ্র-যাত্রা হ'লো নিষিদ্ধ, হিন্দু আপন গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে ক'ষে বাঁধলে, ঘরের বাইরে তা'র যে এক প্রশস্ত আঙিনা ছিলো এ-কথা সে ভুল্‌লে। কিন্তু সমুদ্র-পারের আত্মীয় বালীতে তা'র অনেক বাণী, অনেক মূর্ত্তি, অনেক চিহ্ন, অনেক উপকরণ প'ড়ে আছে ব'লে সেই আত্মীয় তাকে সম্পূর্ণ ভুল্‌তে পার্‌লে না। পথে ঘাটে পদে পদে মিলনের নানা অভিজ্ঞান চোখে পড়ে। কিন্তু সেগুলির সংস্কার হ'তে পায়নি ব'লে কালের হাতে সেই সব অভিজ্ঞান কিছু গেচে ক্ষ'য়ে, কিছু বেঁকেচুরে, কিছু গেচে লুপ্ত হ'য়ে।

সেই সব অভিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গতি আর পাওয়া যায়;

না। তা'র অর্থ কিছু গেচে ঝাপ্‌সা হ'য়ে, কিছু গেচে টুক্‌রো হ'য়ে। তা'র ফল হ'য়েচে এই, যেখানে-যেখানে ফাঁক প'ড়েচে সেই ফাঁকটা এখানকার মানুষের মন আপন সৃষ্টি দিয়ে ভ'রিয়েচে। হিন্দুধর্ম্মের ভাঙাচোরা কাঠামো নিয়ে এখানকার মানুষ আপনার একটা ধর্ম্ম একটা সমাজ গ'ড়ে তুল্‌চে। এখানকার এক সময়ের শিল্পকলায় দেখা যায় পুরোপুরি হিন্দুর প্রভাব,—তা'র পরে দেখা যায় সে-প্রভাব ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্ন। তবু যে-ক্ষেত্রকে হিন্দু উর্ব্বর ক'রে দিয়ে গেচে সেই ক্ষেত্রে এখানকার স্বস্থানীয় প্রতিভা প্রচুরভাবে আপনার ফসল ফ'লিয়েচে। এখানে একটা বহু ছিদ্র পুরোনো ইতিহাসের ভূমিকা দেখি; সেই আধ-ভোলা ইতিহাসের ছেদগুলো দিয়ে এদেশের স্বকীয় চিত্ত নিজেকে প্রকাশ ক'রেচে।

বালীতে সর্ব্ব-প্রথমে কারেম আসন ব'লে একজায়গার রাজবাড়িতে আমার থাক্‌বার কথা। সেখানকার রাজা ছিলেন বাঙ্‌লির শ্রাদ্ধ উৎসবে। পারিষদসহ বালীর ওলন্দাজ গবর্ণর সেখানে মধ্যাহ্নভোজন ক'র্‌লেন, সেই ভোজে আমরাও ছিলেম। ভোজ শেষ ক'রে যখন উঠ্‌লেম তখন বেলা তিনটে। সকালে সাড়ে ছটার সময় জাহাজ থেকে নেমেচি; ঘাটের থেকে মোটরে আড়াই ঘণ্টা ঝাঁকানি ও ধুলো খেয়ে যজ্ঞস্থলে আগমন। এখানে ঘোরাঘুরি দেখাশুনা সেরে বিনা স্নানেই অত্যন্ত ক্লান্ত ও ধূলিম্লান অবস্থায় নিতান্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেতে ব'সেচি; দীর্ঘকাল-প্রসারিত সেই

ভোজে আহার ও আলাপ-আপ্যায়ন সেরে' আমাদের নিমন্ত্রণকর্ত্তা রাজার সঙ্গে তাঁর মোটর-গাড়িতে চ'ড়ে আবার সুদীর্ঘপথ ভেঙে চ'ল্‌লুম তাঁর প্রাসাদে। প্রাসাদকে এরা পুরী বলে। রাজার ভাষা আমি জানিনে, আমার ভাষা রাজা বোঝেন না—বোঝাবার লোকও কেউ সঙ্গে নেই। চুপ ক'রে গাড়ির জান্‌লা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলুম।

মস্ত সুবিধে এই, এখানকার প্রকৃতি বালিনী ভাষায় কথা কয় না, সেই শ্যামার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি আর অরসিক মোটর গাড়িটাকে মনে মনে অভিশাপ দিই। মনে প'ড়্‌লো কখনো কখনো শুষ্কচিত্ত গাইয়ের মুখে গান শুনেচি; রাগিণীর যেটা বিশেষ দরদের জায়গা, যেখানে মন প্রত্যাশা ক'রেচে গাইয়ের কণ্ঠ অত্যুচ্চ আকাশের চিলের মতো পাখাটা ছড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ স্থির থাক্‌বে কিম্বা দুই একটা মাত্র মীড়ের ঝাপ্‌টা দেবে, গানের সেই মর্ম্মস্থানের উপর দিয়ে যখন সেই সঙ্গীতের পালোয়ান তা'র তানগুলোকে লোটন পায়রার মতো পাল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে উড়িয়ে চ'লেচে,—কী-রকম বিরক্ত হ'য়েচি। পথের দুই-ধারে গিরি অরণ্য সমুদ্র, আর সুন্দর সব ছায়াবেষ্টিত লোকালয়, কিন্তু মোটর গাড়িটা দুন চৌদুন মাত্রায় চালিয়ে ধূলো উড়িয়ে চ'লেচে, কোনো-কিছুর পরে তা'র কিছুমাত্র দরদ নেই,—মনটা ক্ষণে ক্ষণে ব'লে উঠ্‌চে, "আরে রোসো রোসো, দেখে নিই"। কিন্তু এই কাল-দৈত্য মনটাকে ছিনিয়ে নিয়ে চ'লে যায়,—তা'র একমাত্র ধুয়ো "সময় নেই, সময় নেই"।

এক জায়গায় যেখানে বনের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নীল সমুদ্র দেখা গেলো রাজা আমাদের ভাষাতেই ব'লে উঠ্‌লেন, "সমুদ্র"; আমাকে বিস্মিত ও আনন্দিত হ'তে দেখে আউড়ে গেলেন, "সমুদ্র, সাগর, অব্ধি, জলাঢ্য"। তা'র পরে ব'ল্‌লেন, "সপ্তসমুদ্র, সপ্তপর্ব্বত, সপ্তবন, সপ্ত-আকাশ"। তা'র পরে পর্ব্বতের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বল্‌লেন, "অদ্রি; তা'র পরে ব'লে গেলেন, "সুমেরু, হিমালয়, বিন্ধ্য, মলয়, ঋষ্যমূক।" এক জায়গায় পাহাড়ের তলায় ছোটো নদী ব'য়ে যাচ্ছিলো, রাজা আউড়িয়ে গেলেন, "গঙ্গা যমুনা নর্ম্মদা গোদাবরী কাবেরী সরস্বতী।" আমাদের ইতিহাসে একদিন ভারতবর্ষ আপন ভৌগোলিক সত্তাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি ক'রেছিলো; তখন সে আপনার নদী-পর্ব্বতের ধ্যানের দ্বারা আপন ভূমূর্ত্তিকে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছিলো। তা'র তীর্থগুলি এমন ক'রে বাঁধা হ'য়েচে,—দক্ষিণে কন্যাকুমারী, উত্তরে মানস সরোবর, পশ্চিম-সমুদ্রতীরে দ্বারকা, পূর্ব্ব-সমুদ্রে গঙ্গা-সঙ্গম,—যাতে ক'রে তীর্থ ভ্রমণের দ্বারা ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ রূপটিকে ভক্তির সঙ্গে মনের মধ্যে গভীরভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু ভারতবর্ষের ভূগোল জানা যেতো তা নয়, তা'র নানা জাতীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আপনিই হ'তো। সেদিন ভারতবর্ষের আত্মোপলব্ধি একটা সত্যসাধনা ছিলো ব'লেই তা'র আত্ম-পরিচয়ের পদ্ধতিও আপনিই এমন সত্য হ'য়ে উঠেছিলো। যথার্থ শ্রদ্ধা কখ্‌নো ফাঁকি দিয়ে কাজ সারতে চায় না

অর্থাৎ রাষ্ট্রসভার রঙ্গমঞ্চের উপর ক্ষণিক মিলনের অভিনয়কেই সে মিলন ব'লে নিজেকে ভোলাতে চায় না। সেদিন মিলনের সাধনা ছিলো অকৃত্রিম নিষ্ঠার সাধনা।

সেদিনকার ভারতবর্ষের সেই আত্মমূর্ত্তি-ধ্যান সমুদ্র পার হ'য়ে পূর্ব্ব মহাসাগরের এই সুদূর দ্বীপ-প্রান্তে এমন ক'রে স্থান পেয়েছিলো যে, আজ হাজার বছর পরেও সেই ধ্যানমন্ত্রের আবৃত্তি এই রাজার মুখে ভক্তির সুরে বেজে উঠ্‌লো এতে আমার মনে ভারি বিস্ময় লাগ্‌লো। এই সব ভৌগোলিক নাম-মালা এদের মনে আছে ব'লে নয়, কিন্তু যে-প্রাচীন যুগে এই নাম-মালা এখানে উচ্চারিত হ'য়েছিলো সেই যুগে এই উচ্চারণের কী গভীর অর্থ ছিলো সেই কথা মনে ক'রে। সেদিনকার ভারতবর্ষ আপনার ঐক্যটিকে কত বড়ো আগ্রহের সঙ্গে জান্‌ছিলো, আর সেই জানাটিকে স্থায়ী কর্‌বার জন্যে ব্যক্ত কর্‌বার জন্যে কী রকম সহজ উপায় উদ্ভাবন ক'রেছিলো 'তা স্পষ্ট বোঝা গেলো আজ এই দূর দ্বীপে এসে—যে-দ্বীপকে ভারতবর্ষ ভুলে গিয়েচে।

রাজা কী রকম উৎসাহের সঙ্গে হিমালয় বিন্ধ্যাচল গঙ্গা যমুনার নাম ক'র্‌লেন, তাতে কী রকম তাঁর গর্ব্ব বোধ হ'লো! অথচ এ-ভূগোল বস্তুত তাঁদের নয়,—রাজা য়ুরোপীয় ভাষা জানেন না, ইনি আধুনিক স্কুলে-পড়া মানুষ নন্, সুতরাং পৃথিবীতে ভারতবর্ষ জায়গাটি-যে কোথায় এবং কী রকম, সে সম্বন্ধে সম্ভবত তাঁর অস্পষ্ট ধারণা; অন্তত বাহ্যত এ ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁদের কোনো ব্যবহার নেই,

তবুও হাজার বছর আগে এই নামগুলির সঙ্গে যে সুর মনে বাঁধা হ'য়েছিলো সেই-সুর আজও এদেশের মনে বাজ্‌চে। সেই সুরটি কতো বড়ো খাঁটি সুর ছিলো তাই আমি ভাব্‌চি। আমি কয়েক বছর আগে ভারতবিধাতার যে-জয়গান রচনা ক'রেচি তাতে ভারতের প্রদেশগুলির নাম গেঁথেচি—বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গার নামও আছে। কিন্তু আজ আমার মনে হ'চ্চে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ও সমুদ্র পর্ব্বতের নামগুলি ছন্দে গেঁথে কেবলমাত্র একটি দেশ-পরিচয় গান আমাদের লোকের মনে গেঁথে দেওয়া ভালো। দেশাত্মবোধ ব'লে একটা শব্দ আজকাল আমরা কথায় কথায় ব্যবহার ক'রে থাকি, কিন্তু দেশাত্মজ্ঞান নেই যার তা'র দেশাত্মবোধ হবে কেমন ক'রে?

তা'র পরে রাজা আউড়ে গেলেন,—সপ্তপর্ব্বত, সপ্তবন, সপ্ত-আকাশ—অর্থাৎ তখনকার ভারতবর্ষ বিশ্ববৃত্তান্ত যে-রকম কল্পনা ক'রেছিলো তা'র স্মৃতি। আজ নূতন জ্ঞানের প্রভাবে সেই স্মৃতি নির্ব্বাসিত, কেবল তা পুরাণের জীর্ণ পাতায় আটকে র'য়েচে, কিন্তু এখানকার কণ্ঠে এখনো তা শ্রদ্ধার সঙ্গে ধ্বনিত। তা'রপরে রাজা চার বেদের নাম, যম বরুণ প্রভৃতি চার লোকপালের নাম, মহাদেবের নামাষ্টক ব'লে গেলেন,—ভেবে ভেবে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের নাম ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, সবগুলি মনে এলোনা।

রাজপুরীতে প্রবেশ ক'রেই দেখি, প্রাঙ্গণে একটি বেদীর উপর বিচিত্র উপকরণ সাজানো, এখানকার চারজন ব্রাহ্মণ

একজন বুদ্ধের, একজন শিবের, একজন ব্রহ্মার, একজন বিষ্ণুর পূজারি ; মাথায় মস্ত উঁচু কারু-খচিত টুপি, টুপির উপরিভাগে কাঁচের তৈরি এক একটা চূড়া। এঁরা চারজন পাশাপাশি ব'সে আপন-আপন দেবতার স্তবমন্ত্র প'ড়ে যাচ্চেন। একজন প্রাচীনা এবং একজন বালিকা অর্ঘ্যের থালি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে। সব সুদ্ধ সাজ-সজ্জা খুব বিচিত্র ও সমারোহ-বিশিষ্ট। পরে শোনা গেলো এই মাঙ্গল্য মন্ত্রপাঠ চ'ল্‌ছিলো রাজবাড়িতে আমারি আগমন উপলক্ষ্যে। রাজা ব'ল্‌লেন, আমার আগমনের পুণ্যে প্রজাদের মঙ্গল হবে, ভূমি সফলা হবে এই কামনায় স্তব মন্ত্রের আবৃত্তি। রাজা বিষ্ণু বংশীয় ব'লে নিজের পরিচয় দিলেন।

বেলা সাড়ে চারটের সময় স্নান ক'রে নিয়ে বারান্দায় এসে ব'স্‌লুম। কারো মুখে কথা নেই। ঘণ্টা দুয়েক এই ভাবে যখন গেলো তখন রাজা স্থানীয় বাজার থেকে বোম্বাই প্রদেশের এক খোজা মুসলমান দোকানদারকে তলব দিয়ে আনালেন। কী আমার প্রয়োজন, কী রকম আহারাদির ব্যবস্থা আমার জন্যে ক'র্‌তে হবে ইত্যাদি প্রশ্ন। আমি রাজাকে জানাতে ব'ল্‌লুম, তিনি যদি আমাকে ত্যাগ ক'রে বিশ্রাম ক'র্‌তে যান তাহ'লেই আমি সব চেয়ে খুসি হবো।

তা'র পর দিনে রাজবাড়ির কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত তালপাতার পুঁথি-পত্র নিয়ে উপস্থিত। একটি পুঁথি মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্ব। এইখানকার অক্ষরেই লেখ

উপরের পংক্তি সংস্কৃত ভাষায়, নীচের পংক্তিতে দেশী ভাষায় তা'রি অর্থ ব্যাখ্যা। কাগজের একটি পুঁথিতে সংস্কৃত শ্লোক লেখা। সেই শ্লোক রাজা প'ড়ে যেতে লাগ্‌লেন; উচ্চারণের বিকৃতি থেকে বহুকষ্টে তাদের উদ্ধার কর্‌বার চেষ্টা করা গেলো। সমস্তটা যোগতত্ত্বের উপদেশ। চিত্ত-বৃদ্ধি, ত্রি-অক্ষরাত্মক ওঁ, চন্দ্রবিন্দু এবং অন্য সমস্ত শব্দ ও ভাবনা বর্জ্জন ক'রে শুদ্ধ চৈতন্যযোগে, সুখমাপ্নুয়াৎ এই হ'চ্চে সাধনা। আমি রাজাকে আশ্বাস দিলেম যে, আমরা এখানে যে-সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পাঠিয়ে দেবো, তিনি এখানকার গ্রন্থগুলি থেকে বিকৃত ও বিস্মৃত পাঠ উদ্ধার ক'রে তা'র অর্থব্যাখ্যা ক'রে দিতে পার্‌বেন।

এদিকে আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হ'তে চ'ল্‌লো। প্রতি মুহূর্ত্তে বুঝতে পার্‌লুম আমার শক্তিতে কুলোবে না। সৌভাগ্যক্রমে সুনীতি আমাদের সঙ্গে আছেন, তাঁর অশ্রান্ত উদ্যম, অদম্য উৎসাহ। তিনি ধুতি প'রে কোমরে পট্টবস্ত্র জড়িয়ে 'পেদণ্ড', অর্থাৎ এখানকার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ব'সে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেশের পূজোপকরণ ছিলো— পূজাপদ্ধতি তাদের দেখিয়ে দিলেন। আলাপ-আলোচনায় সকলকেই তিনি আগ্রহান্বিত ক'রে তুলেচেন।

যখন দেখা গেলো আমার শরীর আর সইতে পার্‌চে না তখন আমি রাজপুরী থেকে পালিয়ে এই আম্পুল তীর্থা-শ্রমেষু নির্ব্বাসন গ্রহণ ক'র্‌লুম। এখানে লোকের ভিড় নেই, অভ্যর্থনা পরিচর্য্যার উপদ্রব নেই। চারদিকে সুন্দর

গিরিব্রজ, শস্যশ্যামলা উপত্যকা, জনপদবধূদের স্নানসেবায় চঞ্চল উৎস-জল-সঞ্চয়ের অবিরত কলপ্রবাহ, শৈলতটে নির্ম্মল নীলাকাশে নারিকেল শাখার নিত্য আন্দোলন; আমি ব'সে আছি বারান্দায়, কখনো লিখ্‌চি, কখনো সাম্‌নে চেয়ে দেখ্‌চি। এমন সময়ে হঠাৎ এসে থাম্‌লো এক মোটর গাড়ি। গিয়ানয়ারের রাজা ও এই প্রদেশের একজন ওলন্দাজ রাজপুরুষ নেমে এলেন। এঁর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ। অন্তত এক রাত্রি যাপন ক'র্‌তে হবে। প্রসঙ্গক্রমে আপনিই মহাভারতের কথা উঠ্‌লো। মহাভারতের যে-কয়টা পর্ব্ব এখনো এখানে পাওয়া যায় তাই তিনি অনেক ভেবে ভেবে আউড়িয়ে গেলেন। বাকি পর্ব্ব কী তাই তিনি জান্‌তে চান। এখানে কেবল আছে, আদি পর্ব্ব, বিরাট পর্ব্ব, উদ্যোগ পর্ব্ব, ভীষ্ম পর্ব্ব, আশ্রমবাস পর্ব্ব, মূষল পর্ব্ব, প্রস্থানিক পর্ব্ব, স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

মহাভারতের কাহিনীগুলির উপরে এদেশের লোকের চিত্ত বাসা বেঁধে আছে। তাদের আমোদে আহ্লাদে কাব্যে গানে অভিনয়ে জীবনযাত্রায় মহাভারতের সমস্ত চরিত্রগুলি বিচিত্রভাবে বর্ত্তমান। অর্জ্জুন এদের আদর্শ পুরুষ। এখানে মহাভারতের গল্পগুলি কী রকম বদ্‌লে গেচে তা'র একটা দৃষ্টান্ত দিই। সংস্কৃত মহাভারতের শিখণ্ডী এখানে শ্রীকান্তি নাম ধ'রেচে। শ্রীকান্তি অর্জ্জুনের স্ত্রী। তিনি যুদ্ধের রথে অর্জ্জুনের সাম্‌নে থেকে ভীষ্মবধের সহায়তা ক'রেছিলেন। এই শ্রীকান্তি এখানে সতী-স্ত্রীর আদর্শ।

গিয়ানয়ারের রাজা আমাকে অনুরোধ ক'রে গেলেন আজ রাত্রে মহাভারতের হারানো পর্ব্ব প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয় নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা ক'র্‌তে চান। আমি তাঁকে সুনীতির কথা ব'লেচি—সুনীতি তাঁকে শাস্ত্র বিষয়ে যথাজ্ঞান সংবাদ দিতে পারবেন।

ভারতের ভূগোলস্মৃতি সম্বন্ধে একটা কথা আমার মনে আন্দোলিত হ'চ্চে। নদীর নাম-মালার মধ্যে সিন্ধু ও শতদ্রু প্রভৃতির নাম নেই, ব্রহ্মপুত্রের নামও বাদ প'ড়েচে। অথচ দক্ষিণের প্রধান নদীগুলির নাম দেখ্‌চি। এর থেকে বোঝা যায় সেই যুগে পঞ্জাব প্রদেশ শক, হূন, যবন ও পারসিকদের দ্বারা বারবার বিধ্বস্ত ও অধিকৃত হ'য়ে ভারতবর্ষ থেকে যেন বিদ্যায় সভ্যতায় স্খলিত হ'য়ে প'ড়েছিলো, অপর পক্ষে ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বারা অভিষিক্ত ভারতের পূর্ব্বতম দেশ তখনো যথার্থরূপে হিন্দু ভারতের অঙ্গীভূত হয় নি।

এইতো গেলো এখানকার বিবরণ। আমার নিজের অবস্থাটা যে-রকম দেখ্‌চি তাতে এখানে আমার ভ্রমণ সংক্ষেপ ক'র্‌তে হবে।

৩১ আগষ্ট ১৯২৭।

কারেম আসন !

বালী

(১১)

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

কল্যাণীয়েষু

রথী, বালী দ্বীপটি ছোটো সেই জন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সুসজ্জিত সম্পূর্ণতা। গাছে পালায় পাহাড়ে ঝর্‌নায় মন্দিরে মূর্ত্তিতে কুটীরে ধানক্ষেতে হাটে বাজারে সমস্তটা মিলিয়ে যেন এক। বেখাপ কিছু চোখে ঠেকে না। ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট বাইরে থেকে কারখানা-ওয়ালাদের এই দ্বীপে আস্‌তে বাধা দিয়েচে, মিশনরিদেরও এখানে আনাগোনা নেই। এখানে বিদেশীদের জমি কেনা সহজ নয়, এমন কি, চাষবাসের জন্যেও কিন্‌তে পারে না। আরবী মুসলমান, গুজরাটের খোজা মুসলমান, চীনদেশের ব্যাপারীরা এখানে কেনা-বেচা করে—চারদিকের সঙ্গে সেটা বেমিল হয় না। গঙ্গার ধার জুড়ে দ্বাদশ দেউলগুলিকে লজ্জিত ক'রে বাংলা-দেশের বুকের উপর জুট্‌মিল্‌ যে-নিদারুণ অমিল ঘ'টিয়েচে এ সে রকম নয়। গ্রামের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গ্রামের লোকেরই হাতে। এখানে ক্ষেতে জলসেকের আর চাষবাসের যে

রীতি-পদ্ধতি সে খুব উৎকৃষ্ট। এরা ফসল যা ফলায়, পরিমাণে তা' অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি।

কাপড় বোনে নানা রং-চং ও কারুকৌশলে। অর্থাৎ এরা কোনো মতে ময়লা ট্যানা কোমরে জড়িয়ে শরীরটাকে অনাদৃত ক'রে রাখে না। তাই যেখানে কোনো কারণে ভিড় জমে, বর্ণচ্ছটার সমাবেশে সেখানটা মনোরম হ'য়ে ওঠে। মেয়েদের উত্তর অঙ্গ অনাবৃত। এসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠ্‌লে তা'রা বলে, আমরা কি নষ্ট মেয়ে যে, বুক ঢাক্‌বো? শোনা গেলো, বালীতে বেশ্যারাই বুকে কাপড় দেয়। মোটের উপর এখানকার মেয়ে-পুরুষের দেহ-সৌষ্ঠব ও মুখের চেহারা ভালোই। বেঢপ্ মোটা বা রোগা আমি তো এ পর্য্যন্ত দেখিনি। এখানকার পরিপুষ্ট শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে এখানকার পাটল রঙের নধরদেহ গোরু, এখানকার সুস্থ সবল পরিতৃপ্ত প্রসন্ন ভাবের মানুষগুলি মিলে গেচে। ছবির দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে এমন জায়গা পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

নন্দলাল এখানে এলেন না ব'লে আমার মনে অত্যন্ত আক্ষেপ বোধ হয়; এমন সুযোগ তিনি আর কোথাও কখনো পাবেন না। মনে আছে কয়েক বৎসর আগে একজন নামজাদা আমেরিকান আর্টিষ্ট্ আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন এমন দেশ তিনি আর কোথাও দেখেন নি। আর্টিষ্টের চোখে পড়বার মতো জিনিষ এখানে চারদিকেই। অন্নসচ্ছলতা আছে ব'লেই স্বভাবত গ্রামের লোকের পক্ষে ঘর দুয়ার

আচার অনুষ্ঠান আস্‌বাবপত্রকে শিল্প কলায় সজ্জিত কর্‌বার চেষ্টা সফল হ'তে পেরেচে। কোথাও হেলা-ফেলার দৃশ্য দেখা গেলো না। গ্রামে গ্রামে সর্ব্বত্র চ'ল্‌চে নাচ, গান, অভিনয়; অভিনয়ের বিষয় প্রায়ই মহাভারত থেকে। এর থেকে বোঝা যাবে গ্রামের লোকের পেটের খাদ্য ও মনের খাদ্যের বরাদ্দ অপর্য্যাপ্ত। পথে আশে-পাশে প্রায়ই নানা প্রকার মূর্ত্তি ও মন্দির। দারিদ্র্যের চিহ্ন নেই, ভিক্ষুক এ পর্য্যন্ত চোখে পড়্‌লো না। এখানকার গ্রামগুলি দেখে মনে হোলো এই তো যথার্থ শ্রীনিকেতন। গ্রামের সমগ্র প্রাণটি সকল দিকে পরিপূর্ণ।

এদেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারকেল-বন যেমন সমুদ্র-হাওয়ায় দু'ল্‌চে তেম্‌নি সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত। এক-একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক-একটি বিশেষ পথ থাকে। বাঙলা দেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হ'য়েছিলো সেদিন সহজেই কীর্ত্তনগানে সে আপন আবেগ-সঞ্চারের পথ পেয়েচে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেচি, তা'র প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত চলায় ফেরায়, যুদ্ধে বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে, এমন কি ভাঁড়ামিতে সমস্তটাই নাচ। সেই নাচের ভাষা যারা ঠিকমতো জানে তা'রা বোধ হয় গল্পের ধারাটা ঠিকমতো অনুসরণ ক'র্‌তে পারে। সেদিন

এখানকার এক রাজবাড়িতে আমরা নাচ দেখ্‌ছিলুম। খানিক বাদে শোনা গেলো এই নাচ-অভিনয়ে বিষয়টা হ'চ্চে শাল্ব-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গ'ড়ে তোলে। মানুষের সকল ঘটনারই বাহ্যরূপ চলা-ফেরায়। কোনো একটা অসামান্য ঘটনাকে পরিদৃশ্যমান ক'র্‌তে চাইলে তা'র চলাফেরাকে ছন্দের সুষমা-যোগে রূপের সম্পূর্ণতা দেওয়া সঙ্গত। বাণীর দিকটাকে বাদ দিয়ে কিম্বা খাটো ক'রে কেবলমাত্র গতিরূপটিকে ছন্দের উৎকর্ষ দেওয়া এখানকার নাচ। পৌরাণিক যে-আখ্যায়িকা কাব্যে কেবল-মাত্র কানে-শোনার বিষয়, এরা সেইটেকেই কেবলমাত্র চোখে দেখার বিষয় ক'রে নিয়েচে। কাব্যের বাহন বাক্য, সেই বাক্যের ছন্দ-অংশ সঙ্গীতের বিশ্বজনীন নিয়মে চালিত, কিন্তু তা'র অর্থ-অংশ কৃত্রিম, সেটা সমাজে পরস্পরের আপোষে তৈরি-করা সঙ্কেতমাত্র। এই দুইয়ের যোগে কাব্য। গাছ শব্দটা শুন্‌লে গাছ তা'রাই দেখে যাদের মধ্যে এ-সম্বন্ধে একটা আপোষে বোঝাপড়া আছে। তেম্‌নি এদের নাচের মধ্যে শুধু ছন্দ থাক্‌লে তাতে আখ্যান বর্ণনা চলে না, সঙ্কেতও আছে, এই দুইয়ের যোগে এদের নাচ। এই নাচে রসনা বন্ধ ক'রে এরা সমস্ত দেহ দিয়ে কথা কইচে ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গী-সঙ্গীতে। এদের নাচে যুদ্ধের যে-রূপ দেখি কোনো রণক্ষেত্রে সে-রকম যুদ্ধ দূরতঃও সম্ভব নয়। কিন্তু যদি কোনো স্বর্গে এমন বিধি থাকে যে, ছন্দে যুদ্ধ ক'র্‌তে

হবে এমন যুদ্ধ, যাতে ছন্দভঙ্গ হ'লে সেটা পরাভবেরই সামিল হয় তবে সেটা এই রকম যুদ্ধই হ'তো। বাস্তবের সঙ্গে এই অনৈক্য নিয়ে যাদের মনে অশ্রদ্ধা বা কৌতুক জন্মায় শেক্স্‌-পিয়রের নাটক প'ড়েও তাদের হাসা উচিত—কেননা তাতে ল'ড়্‌তে ল'ড়্‌তেও ছন্দ, ম'র্‌তে ম'র্‌তেও তাই। সিনেমাতে আছে রূপের সঙ্গে গতি, সেই সুযোগটিকে যথার্থ আর্টে পরিণত ক'র্‌তে গেলে আখ্যানকে নাচে দাঁড়-করানো চলে। বলা বাহুল্য, বাই-নাচ প্রভৃতি যে-সব পদার্থকে আমরা নাচ বলি তা'র আদর্শ এ-নাচের নয়। জাপানে কিয়োটোতে ঐতিহাসিক নাট্যের অভিনয় দেখেচি তাতে কথা আছে বটে, কিন্তু তা'র ভাবভঙ্গী চলাফেরা সমস্ত নাচের ধরণে, বড়ো আশ্চর্য্য তা'র শক্তি। নাটকে আমরা যখন ছন্দোময় বাক্য ব্যবহার করি, তখন সেই সঙ্গে চলাফেরা হাবভাব যদি সহজ রকমেরই রেখে দেওয়া হয় তাহ'লে সেটা অসঙ্গত হ'য়ে ওঠে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নামেতেই প্রকাশ পায় আমাদের দেশে একদিন নাট্য অভিনয়ের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গই ছিলো নাচ। নাটক দেখ্‌তে যারা আসে, পশ্চিম মহাদেশে তাদের বলে অডিয়েন্স', অর্থাৎ শ্রোতা। কিন্তু ভারতবর্ষে নাটককে ব'লেচে দৃশ্যকাব্য,—অর্থাৎ তাতে কাব্যকে আশ্রয় ক'রে চোখে দেখার রস দেবার জন্যেই অভিনয়।

এই তো গেলো নাচের দ্বারা অভিনয়। কিন্তু বিশুদ্ধ নাচও আছে। পর্শু রাত্রে সেটা গিয়ানয়ারের রাজবাড়িতে

দেখা গেলো। সুন্দর সাজকরা দুটি ছোটো মেয়ে,—মাথায় মুকুটের উপর ফুলের দণ্ডগুলি একটু নড়াতেই দুলে ওঠে। গামেলান বাদ্য-যন্ত্রের সঙ্গে দু'জনে মিলে নাচ্‌তে লাগ্‌লো। এই বাদ্যসঙ্গীত আমাদের সঙ্গে ঠিক মেলেনা। আমাদের দেশের জলতরঙ্গ বাজনা আমার কাছে সঙ্গীতের ছেলেখেলা ব'লে ঠেকে। কিন্তু সেই জিনিষটিকে গম্ভীর, প্রশস্ত, সুনিপুণ, বহুযন্ত্রমিশ্রিত বিচিত্র আকারে এদের বাদ্যসঙ্গীতে যেন পাওয়া যায়। রাগ-রাগিণীতে আমাদের সঙ্গে কিছুই মেলে না, যে-অংশে মেলে সে হ'চ্চে এদের মৃদঙ্গের ধ্বনি, সঙ্গে করতালও আছে। ছোটো বড়ো ঘণ্টা এদের এই সঙ্গীতের প্রধান অংশ। আমাদের দেশের নাট্যশালায় কন্সর্ট্ বাজনার যে-নূতন রীতি হ'য়েচে এ সে-রকম নয়—অথচ য়ুরোপীয় সঙ্গীতে বহুযন্ত্রের যে-হার্ম্মনি এ তাও নয়। ঘণ্টার মতো শব্দে একটা মূল স্বর-সমাবেশ কানে আস্‌চে তা'র সঙ্গে নানা প্রকার যন্ত্রের নানা রকম আওয়াজ যেন একটা কারুশিল্পে গাঁথা হ'য়ে উঠ্‌চে। সমস্তটাই যদিও আমাদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র তবু শুন্‌তে ভারি মিষ্টি লাগে। এই সঙ্গীত পছন্দ ক'র্‌তে য়ুরোপীয়দেরও বাধে না।

গামেলান বাজনার সঙ্গে ছোটো মেয়ে দুটি নাচ্‌লে, তা'র শ্রী অত্যন্ত মনোহর। অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে সমস্ত শরীরে ছন্দের যে-আলোড়ন তা'র কী চারুতা, কী বৈচিত্র্য, কী সৌকুমার্য্য, কী সহজ লীলা। অন্য নাচে দেখা যায় নটী তা'র দেহকে

চালনা ক'র্‌চে ; এদের দেখে মনে হ'তে লাগ্‌লো, দুটি দেহ যেন স্বত-উৎসারিত নাচের ফোয়ারা। বারো বছরের পরে এই মেয়েদের আর নাচ্‌তে দেওয়া হয় না, বারো বছরের পরে শরীরের এমন সহজ সুকুমার হিল্লোল থাকা সম্ভব নয়।

সেই সন্ধ্যা বেলাতেই রাজবাড়িতে আর-একটি ব্যাপার দেখ্‌লুম, মুখোষপরা নটেদের অভিনয়। আমরা জাপান থেকে যে-সব মুখোষ এনেছিলুম তা'র থেকে বেশ বোঝা যায় মুখোষ-তৈরি এক প্রকারের বিশেষ কলাবিদ্যা। এতে যথেষ্ট গুণপনা চাই। আমাদের সকলেরই মুখে যেমন ব্যক্তিগত তেম্‌নি শ্রেণীগত বিশেষত্ব আছে। বিশেষ ছাঁচ ও ভাব-প্রকাশ অনুসারে আমাদের মুখের ছাঁদ এক এক রকম শ্রেণী নির্দ্দেশ করে। মুখোষ-তৈরি যে-গুণী করে সে সেই শ্রেণী-প্রকৃতিকে মুখোষে বেঁধে দেয়। সেই বিশেষ-শ্রেণীর মুখের ভাব-বৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ ছাঁদে সে সংহত করে। নট সেই মুখোষ প'রে এলে আমরা তখনি দেখ্‌তে পাই একটা বিশেষ মানুষকে কেবল নয়, বিশেষ ভাবের এক শ্রেণীর মানুষকে। সাধারণত অভিনেতা ভাব অনুসারে অঙ্গভঙ্গী করে। কিন্তু মুখোষে মুখের ভঙ্গী স্থির ক'রে বেঁধে দিয়েচে। এইজন্যে অভিনেতার কাজ হ'চ্চে মুখোষেরই সামঞ্জস্য রেখে অঙ্গভঙ্গী করা। মূল ধুয়োটা তা'র বাঁধা, এমন ক'রে তাল দিতে হবে যাতে প্রত্যেক সুরে সেই ধুয়োটার ব্যাখ্যা হয়, কিচ্ছু অসঙ্গত না হয়। এই অভিনয়ে তাই দেখ্‌লুম।

অভিনয়ের সঙ্গে এদের কণ্ঠসঙ্গীত যা শুন্‌চি তাকে সঙ্গীত বলাই চলে না। আমাদের কানে অত্যন্ত বেসুরো এবং উৎকট ঠেকে। এখানে আমরা তো গ্রামের কাছেই আছি, এরা কেউ একলা কিম্বা দল বেঁধে গান গাচ্চে এ তো শুনিনি। আমাদের পাড়াগাঁয়ে চাঁদ উঠেচে অথচ কোথাও গান ওঠেনি এ সম্ভব হয় না। এখানে সন্ধ্যার আকাশে নারকেল গাছগুলির মাথার উপর শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখা দিচ্চে, গ্রামে কুঁক্‌ড়ো ডাক্‌চে, কুকুর ডাক্‌চে, কিন্তু কোথাও মানুষের গান নেই।

এখানকার একটা জিনিষ বার বার লক্ষ্য ক'রে দেখেচি, ভিড়ের লোকের আত্মসংযম। সেদিন গিয়ান্‌য়ারের রাজ-বাড়িতে যখন অভিনয় হ'চ্চিলো চারদিকে অবারিত লোকের সমাগম। সুনীতিকে ডেকে ব'ল্‌লুম, মেয়েদের কোলে শিশুদের আর্ত্তরব শুনিনে কেন? নারীকণ্ঠই বা এমন সম্পূর্ণ নীরব থাকে কোন্ আশ্চর্য্য শাসনে? মনে পড়ে ক'ল্‌কাতার থিয়েটারে মেয়েদের কলালাপ ও শিশুদের কান্না বন্যার মতো কমেডি ও ট্র্যাজেডি ছাপিয়ে দিয়ে কী রকম অসংযত অসভ্যতার হিল্লোল তোলে। সেদিন এখানে দুই একটি মেয়ের কোলে শিশুও দেখেচি কিন্তু তা'রা কাঁদ্‌লো না কেন?

একটা জিনিষ এখানে দেখা গেলো যা আর কোথাও দেখিনি। এখানকার মেয়েদের গায়ে গহনা নেই। কখনো কখনো কারো এক হাতে একটা চুড়ি দেখেচি সেও সোনার

নয়। কাছে ছিদ্র ক'রে শুক্‌নো তালপাতার একটি গুটি প'রেচে। বোধ হ'চ্চে যেন অজন্তার ছবিতেও এ রকম কর্ণভূষণ দেখেচি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই-যে এদের আর-সকল কাজেই অলঙ্কারের বাহুল্য ছাড়া বিরলতা নেই। যেখানে সেখানে পাথরে কাঠে কাপড়ে নানা ধাতু দ্রব্যে এরা বিচিত্র অলঙ্কার সমস্ত দেশে ছড়িয়ে রেখেচে, কেবল এদের মেয়েদের গায়েই অলঙ্কার নেই।

আমাদের দেশে সাধারণত দেখা যায় অলঙ্কৃত জিনিষের প্রধান রচনাস্থান পুরোনো সহরগুলি যেখানে মুসলমান বা হিন্দু প্রভাব সংহত ছিলো,—যেমন দিল্লি, আগ্রা, ঢাকা, কাশী, মাদুরা প্রভৃতি জায়গা। এখানে সে-রকম বোধ হ'লো না। এখানে শিল্পকাজ কম-বেশি সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে ছড়ানো। তা'র মানে এখানকার লোক ধনীর ফর্‌মাসে নয় নিজের আনন্দেই নিজের চারিদিককে সজ্জিত করে। কতকটা জাপানের মতো। তা'র কারণ, অল্প-পরিসর দ্বীপের মধ্যে আইডিয়া এবং বিদ্যা ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। তা ছাড়া এদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য। সেই সমজাতীয় মনোবৃত্তিতে শক্তির সাম্য দেখা যায়। দ্বীপ মাত্রের একটি স্বাভাবিক বিশেষত্ব এই-যে সেখানকার মানুষ সমুদ্র বেষ্টিত হ'য়ে বহুকাল নিজের বিশেষ নৈপুণ্যকে অব্যাঘাতে ঘনীভূত ক'র্‌তে ও তাকে রক্ষা ক'র্‌তে পারে। আমাদের অতিবিস্তৃত ভারতবর্ষে এককালে যা প্রচুর হ'য়ে উৎপন্ন হয় অন্যকালে তা ছড়িয়ে নষ্ট হ'য়ে যায়। তাই

আমাদের দেশে অজন্তা আছে অজন্তার কালকেই আঁকড়ে, কণারক আছে কণারকেরই যুগে,—তা'রা আর একাল পর্য্যন্ত এসে পৌঁছ'তে পার্‌লে না। শুধু তাই নয়, তত্ত্বজ্ঞান ভারতীয় মনের প্রধান সম্পদ কিন্তু বহু দূরে দূরে উপনিষদের বা শঙ্করাচার্য্যের কালে তা ভাগে ভাগে লগ্ন হ'য়ে রইলো। একালে আমরা শুধু তাই নিয়ে আবৃত্তি করি কিন্তু তা'র সৃষ্টিধারা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেচে। ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হ'য়েও এত শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষের এত জিনিষ যে এখানে এখনো এমন ক'রে আছে, তা'র কারণ, এটা দ্বীপ, এখানে সহজে কোনো জিনিষ ভ্রষ্ট হ'য়ে যেতে পারে না। অর্থ নষ্ট হ'তে পারে, একটার দ্বারা আরেকটা চাপা প'ড়্‌তে পারে, কিন্তু বস্তুটা তবু থেকে যায়। এই কারণেই প্রাচীন ভারতের অনেক জিনিষই এখানে আমরা বিশুদ্ধভাবে পাবো ব'লে আশা করি। হয়তো এখানকার নাচ এবং নৃত্যমূলক অভিনয়টা সেই জাতের হ'তেও পারে। এখানকার রাজাদের বলে আর্য্য। আমার বিশ্বাস তা'র অর্থ, রাজবংশ নিজেদের আর্য্যবংশীয় ব'লেই জানে, তা'রা স্থানীয় অধিবাসী-দের স্বজাতীয় ছিলো না। তাই এখানকার রাজাদের ঘরে যে-সকল কলা ও অনুষ্ঠান আজো চ'লে আস্‌চে সেগুলি সন্ধান ক'র্‌লে এমন অনেক জিনিষ পাওয়া যাবে যা আমাদের দেশে লুপ্ত ও বিস্মৃত।

এই ছোটো দ্বীপে এককালে অনেক রাজা ছিলো, তাদের কেউ-কেউ ওলন্দাজ আক্রমণে আসন্নপরাভবের আশঙ্কায়

দলে দলে হাজার হাজার লোক নিঃশেষে আত্মহত্যা ক'রে ম'রেচে। এখনো রাজোপাধিধারী যে-কয়েকজন আছে তা'রা পুরোনো দামী শামাদানের মতো, যাতে বাতি আর জ্বলে না। তাদের প্রাসাদ ও সাজসজ্জা আছে, তা ছাড়া তা'রা যেখানে আছে তাকে নগর বলা চলে। কিন্তু এই নগরে আর গ্রামে যে-পার্থক্য সে যেন ভাইবোনের পার্থক্যের মতো, তা'রা এক বাড়িতেই থাকে, তাদের মাঝে প্রাচীর নেই। আধুনিক ভারতে শিল্প-চর্চ্চা প্রভৃতি নানা বিষয়ে নগরে গ্রামে ছাড়াছাড়ি। সহরগুলি যে-দীপ জ্বালে তা'র আলো গ্রামে গিয়ে পড়েই না। দেশের সম্পত্তি যেন ভাগ হ'য়ে গেচে, গ্রামের অংশে যেটুকু প'ড়েচে তাতে আবার অনুষ্ঠান বজায় রাখা সম্ভব নয়। এই কারণে সমস্ত দেশ এক হ'য়ে কোনো শিল্প কোনো বিদ্যাকে রক্ষণ ও পোষণ ক'র্‌তে পারে না। তাই সহরের লোক যখন দেশের কথা ভাবে তখন সহরকেই দেশ ব'লে জানে, গ্রামের লোক দেশের কথা ভাব্‌তেই জানে না। এই বালীতে আমরা মোটরে মোটরে দূরে দূরান্তরে যতই ভ্রমণ করি,—নদী, গিরি, বন, শস্যক্ষেত্র ও পল্লীতে সহরে মিলে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা দেখ্‌তে পাই; এখানকার সকল মানুষের মধ্যেই যেন এদের সকল সম্পদ ছড়ানো।

গামেলান সঙ্গীতের কথা পূর্ব্বেই ব'লেচি। ইতিমধ্যে এ সম্বন্ধে আমাকে চিন্তা ক'র্‌তে হ'য়েচে। এরা-যে আপন মনে সহজ আনন্দে গান গায় না তা'র কারণ এদের কণ্ঠ-

সঙ্গীতের অভাব। এরা টিং টিং টুং টাং ক'রে যে বাজনা বাজায় বস্তুত তাতে গান নেই, আছে তাল। নানা যন্ত্রে এরা তালেরই বোল দিয়ে চলে। এই বোল দেবার কোনো কোনো যন্ত্র ঢাক ঢোলের মতোই, তাতে স্বর অল্প, শব্দই বেশি, কোনো কোনো যন্ত্র ধাতুতে তৈরি সেগুলি স্বরবান্। এই ধাতুযন্ত্রে টানা সুর থাকা সম্ভব নয়, থাক্‌বার দরকার নেই, কেননা টানা সুর গানেরই জন্যে; বিচ্ছিন্ন সুরগুলিতে তালেরই বোল দেয়। আসলে এরা গান গায় গলা দিয়ে নয়, সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে; এদের নাচই যেন পদে পদে টানা সুরের মিড় দেওয়া,—বিলাতী নাচের মতো ঝম্পবহুল নয়। এদের নাচ বর্ষার ঝমাঝম জল-বিন্দু-বৃষ্টির মতো নয়, ঝর্‌নার তরঙ্গিত ধারার মতো। তাল যে-ঐক্যকে দেখায় সে হ'চ্চে কালের অংশগুলিকে যোজনা ক'রে, গান যে-ঐক্যকে দেখায় সে হ'চ্চে রসের অখণ্ডতাকে সম্পূর্ণ ক'রে। তাই ব'ল্‌চি এদের সঙ্গীতই তাল, এদের নৃত্যই গান। আমাদের দেশে এবং য়ুরোপে গীতাভিনয় আছে, এদের দেশে নৃত্যাভিনয়।

ইতিমধ্যে এখানকার ওলন্দাজ রাজপুরুষ অনেকের সঙ্গে আলাপ হ'য়েচে। এদের একটা বিশেষত্ব আমার চোখে লাগ্‌লো। অধীনস্থ জাতের উপর এদের প্রভুত্ব যথেষ্ট নেই তা নয়, কিন্তু, এদের ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্ত্তৃত্বের ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করিনি। এখানকার লোকদের সঙ্গে এরা সহজে মেলা-মেশা ক'র্‌তে পারে। দুই জাতির পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সর্ব্বদাই

হয় এবং সেই বিবাহের সন্তানেরা পিতৃকুল থেকে ভ্রষ্ট হয় না। এখানে অনেক উচ্চপদের ওলন্দাজ আছে যারা সঙ্কর-বর্ণ, তা'রা অবজ্ঞাভাজন নয়। এখানকার মানুষকে মানুষ জ্ঞান ক'রে এমন সহজ ব্যবহার কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো এই প্রশ্ন করাতে একজন ওলন্দাজ আমাকে ব'লেছিলেন, যাদের অনেক সৈন্য, অনেক যুদ্ধজাহাজ, অনেক সম্পদ, অনেক সাম্রাজ্য, ভিতরে ভিতরে সর্ব্বদাই তাদের মনে থাকে যে তা'রা একটা মস্ত-কিছু, এই জন্য ছোটো দরজা দিয়ে ঢুক্‌তে তাদের অত্যন্ত বেশি সঙ্কুচিত হ'তে হয়। নিজেদের সর্ব্বদা তত প্রকাণ্ড বড়ো ব'লে জান্‌বার অবসর আমাদের হয়নি। এই জন্যে সহজে সর্ব্বত্র আমরা ঢুক্‌তে পারি, এই জন্যে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করা আমাদের পক্ষে সহজ।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।

(১২)

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লিখিত।

কল্যাণীয়েষু,

অমিয়, বালীদ্বীপে আমাদের শেষ দিন। মুণ্ডুক ব'লে একটি পাহাড়ের উপর ডাকবাঙ্‌লায় আশ্রয় নিয়েচি। এতদিন বালীর যে-অংশে ঘুরেচি—সমস্তই চাষ-করা বাস-করা জায়গা,—লোকালয়গুলি নারকেল, সুপারি,

আম, তেঁতুল, সজ্‌নে গাছের ঘনশ্যামলবেষ্টনে ছায়াবিষ্ট। এখানে এসে পাহাড়ের গা-জুড়ে প্রাচীন অরণ্য দেখা গেলো। কতকটা শিলঙ্‌ পাহাড়ের মতো। নীচে স্তরবিন্যস্ত ধানের ক্ষেত, পাহাড়ের একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে দূরে সমুদ্রের আভাস পাওয়া যায়। এখানে দূরের দৃশ্যগুলি প্রায়ই বাষ্পে অবগুণ্ঠিত। আকাশে অল্প একটু অস্পষ্টতার আবরণ, এখানকার পুরানো ইতিহাসের মতো। এখন শুক্লপক্ষের রাত্রি, কিন্তু এমন রাত্রে আমাদের দেশের চাঁদ দিগঙ্গনাদের কাছে যেমন সম্পূর্ণ ধরা দেয় এখানে তা নয়; যে-ভাষা খুব ভালো ক'রে জানিনে যেন সেই রকম তা'র জ্যোৎস্নাটি।

এতদিন এ-দেশটা একটি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। আহূত বরাহূত বহু লোকের ভিড়। কত ফোটোগ্রাফওয়ালা, সিনেমাওয়ালা, কত ক্ষণিক-পরিব্রাজকের দল। পান্থশালা নিঃশেষে পরিপূর্ণ। মোটরের ধূলোয় এবং ধমকে আকাশ ম্লান। খেয়া-জাহাজ কাল জাভা অভিমুখে ফিরবে, তাই প্রতিবর্ত্তী যাত্রীর দল আজ নানা পথবিপথ দিয়ে চঞ্চল হ'য়ে ধাবমান। এত সমারোহ কেন সে-কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারো।

বালীর লোকেরা যারা হিন্দু, যারা নিজের ধর্ম্মকে আগম বলে, শ্রাদ্ধক্রিয়া তাদের কাছে একটা খুব বড়ো উৎসব। কেননা যথানিয়মে মৃতের সৎকার হ'লে তা'র আত্মা কুয়াশা হ'য়ে পৃথিবীতে এসে পুর্নজন্ম নেয়, তারপর বারে বারে

সংস্কার পেতে পেতে শেষকালে শিবলোকে চরম মোক্ষে তা'র উদ্ধার।

এবারে আমরা যাঁদের শ্রাদ্ধে এসেচি তাঁরা দেবত্ব পেয়েচেন ব'লে আত্মীয়েরা স্থির ক'রেচে, তাই এত বেশি ঘটা। এত ঘটা অনেক বৎসর হয়নি, আর কখনো হবে কিনা সকলে সন্দেহ ক'র্‌চে। কেননা আধুনিক কাল তা'র কাটারি-হাতে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্চে অনুষ্ঠানের বাহুল্যকে খর্ব্ব কর্‌বার জন্যে, তা'র একমাত্র উৎসাহ উপকরণ-বাহুল্যের দিকে।

এখানকার লোকে ব'ল্‌চে সমারোহে খরচ হবে এখানকার টাকার প্রায় চল্লিশ হাজার, আমাদের টাকার পঞ্চাশ হাজার। ব্যয়ের এই পরিমাণটা সকলেরই কাছে অত্যন্ত বেশি ব'লেই ঠেক্‌চে। আমাদের দেশের বড়ো লোকের শ্রাদ্ধে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেশি কিছুই নয়। কিন্তু প্রভেদ হ'চ্চে আমাদের শ্রাদ্ধের খরচ ঘটা কর্‌বার জন্যে তেমন নয় যেমন পুণ্য কর্‌বার জন্যে। তা'র প্রধান অঙ্গই দান, পরলোকগত-আত্মার কল্যাণ কামনায়। এখানকার শ্রাদ্ধেও স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অর্ঘ্য ও আহার্য্য দান যে নেই তা নয় কিন্তু এর সব চেয়ে ব্যয়সাধ্য অংশ সাজসজ্জা। সে সমস্তই চিতায় পুড়ে ছাই হয়। এই দেহকে নষ্ট ক'রে ফেল্‌তে এদের আন্তরিক অনুমোদন নেই সেটা সেদিনকার অনুষ্ঠানের একটা ব্যাপারে বোঝা যায়। কালো গোরুর মূর্ত্তি, তা'র পেটের মধ্যে মৃতদেহ, রাস্তা দিয়ে এটাকে যখন

বহন ক'রে নিয়ে যায়, তখন শোভাযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে ঠেলাঠেলি প'ড়ে যায়। যেন ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা, যেন অনিচ্ছা। বাহকেরা তাড়া খায়, ঘুরপাক দেয়। এইখানেই আগম, অর্থাৎ যে-ধর্ম্ম বাইরে থেকে এসেচে তা'র সঙ্গে এদের নিজের হৃদয়বৃত্তির বিরোধ। আগমেরই হ'লো জিৎ, দেহ হ'লো ছাই।

উবুদ ব'লে জায়গার রাজার ঘরে এই অনুষ্ঠান। তিনি যখন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব'লে সুনীতির পরিচয় পেলেন সুনীতিকে জানালেন, শ্রাদ্ধক্রিয়া এমন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে এ-দেশে পুনর্ব্বার হবার সম্ভাবনা খুব বিরল অতএব এই অনুষ্ঠানে সুনীতি যদি যথারীতি শ্রাদ্ধের বেদমন্ত্র পাঠ করেন তবে তিনি তৃপ্ত হবেন। সুনীতি ব্রাহ্মণসজ্জায় ধূপধুনো জ্বালিয়ে "মধুবাতা ঋতায়ন্তে" এবং কঠোপনিষদের শ্লোক প্রভৃতি উচ্চারণ ক'রে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করেন। বহুশতবৎসর পূর্ব্বে একদিন বেদমন্ত্রগানের সঙ্গে এই দ্বীপে শ্রাদ্ধক্রিয়া আরম্ভ হ'য়েছিলো, বহুশতবৎসর পরে এখানকার শ্রাদ্ধে সেই মন্ত্র হয়তো বা শেষবার ধ্বনিত হ'লো। মাঝখানে কত বিস্মৃতি কত বিকৃতি। রাজা সুনীতিকে পৌরোহিত্যের সম্মানের জন্যে কী দিতে হবে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন। সুনীতি ব'লেছিলেন এই কাজের জন্যে অর্থ গ্রহণ তাঁর ব্রাহ্মণবংশের রীতিবিরুদ্ধ। রাজা তাঁকে কর্ম্ম-অন্তে বালীর তৈরি মহার্ঘ্য বস্ত্র ও আসন দান ক'রেছিলেন।

এখানে একটা নিয়ম আছে যে, গৃহস্থের ঘরে এমন

কারো যদি মৃত্যু হয় যার জ্যেষ্ঠরা বর্ত্তমান তাহ'লে সেই গুরুজনদের মৃত্যু না হ'লে এর আর সৎকার হবার জো নেই। এই জন্য বড়োদের মৃত্যু হওয়া পর্য্যন্ত মৃতদেহকে রেখে দিতে হয়। তাই অনেকগুলি দেহের দাহক্রিয়া এখানে একসঙ্গে ঘটে। মৃতকে বহুকাল অপেক্ষা ক'রে থাকৃতে হয়।

সৎকারের দীর্ঘকাল অপেক্ষার আরো একটা কারণ, সৎকারের উপকরণ ও ব্যয়বাহুল্য। তা'র জন্যে প্রস্তুত হ'তে দেরি হ'য়ে যায়। তাই শুনেচি এখানে কয়েক বৎসর অন্তর বিশেষ বৎসর আসে তখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়।

শবাধার বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে রথের মতো যে একটা মস্ত উঁচু যান তৈরি হয়, অনেক সংখ্যক বাহকে মিলে সেটাকে চিতার কাছে নিয়ে যায়। এই বাহনকে বলে ওয়াদা। আমাদের দেশে ময়ূরপংখী যেমন ময়ূরের মূর্ত্তি দিয়ে সজ্জিত, তেমনি এদের এই ওয়াদার গায়ে প্রকাণ্ড বড়ো একটি গরুড়ের মুখ; তা'র দুইধারে বিস্তীর্ণ মস্ত দুই পাখা, সুন্দর ক'রে তৈরি। শিল্পনৈপুণ্যে বিস্মিত হ'তে হয়। শ্রাদ্ধের এই নানাবিধ উপকরণের আয়োজন মনের ভিতরে সবটা গ্রহণ করা বড়ো কঠিন। যেটা সব চেয়ে দৃষ্টি ও মনকে আকর্ষণ করে সে হ'চ্চে জনতার অবিশ্রাম ধারা। বহুদূর ও নানাদিক্ থেকে মেয়েরা মাথায় কত রকমের অর্ঘ্য বহন ক'রে সার বেঁধে রাস্তা দিয়ে চ'লেচে। দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে, যেখানে অর্ঘ্য-মাথায় বাহকেরা যাত্রা ক'রতে প্রস্তুত, সেখানে গ্রামের তরুচ্ছায়ায় গামেলান্

বাজিয়ে এক একটি স্বতন্ত্র উৎসব চ'ল্‌চে। সর্ব্বসাধারণে মিলে দলে দলে এই অনুষ্ঠানের জন্যে আপন আপন উপহার নিয়ে এসে যজ্ঞক্ষেত্রে জমা ক'রে দিচ্চে। অর্ঘ্যগুলি যেমন-তেমন ক'রে আনা নয়, সমস্ত বহুযত্নে সুসজ্জিত। সেদিন দেখলুম ইয়াং-ইয়াং ব'লে এক সহরের রাজা বহু বাহনের মাথায় তাঁর উপহার পাঠালেন। সকলের পিছনে এলেন তাঁর প্রাসাদের পুরনারীরা। কী শোভা, কী সজ্জা, কী আভিজাত্যের বিনয়-সৌন্দর্য্য! এমনি ক'রে নানা পথ বেয়ে বেয়ে বহুবর্ণ-বিচিত্র তরঙ্গিত উৎসবের অবিরাম প্রবাহ। দেখে দেখে চোখের তৃপ্তি শেষ হয় না।

সব চেয়ে এই কথাটি মনে হয় এই রকম বহুদূরব্যাপী উৎসবের টানে বহু মানুষের আনন্দমিলনটি কেবলমাত্র একটা মেলা বসিয়ে বহু লোক জড়ো হওয়া নয়। এই মিলনটির বিচিত্র সুন্দর অবয়ব। নানা গ্রামে নানা ঘরে এই উৎসবমূর্ত্তিকে অনেকদিন থেকে নানা মানুষে ব'সে ব'সে নিজের হাতে সুসম্পূর্ণ ক'রে তুলেচে। এ হ'চ্চে বহুজনের তেমনি সম্মিলিত সৃষ্টি, যেমন ক'রে এরা নানা লোক ব'সে নানা যন্ত্রে তাল মিলিয়ে সুর মিলিয়ে একটা সচল ধ্বনি-মূর্ত্তি তৈরি ক'রে তুল্‌তে থাকে। কোথাও অনাদর নেই, কুশ্রীতা নেই। এত নিবিড় লোকের ভিড়, কোথাও একটুও কলহের আভাস মাত্র দেখা গেলো না। জনতার মধ্যে মেয়েদের সমাবেশ খুবই বেশি, তাতে একটুও আপদের সৃষ্টি হয়নি। বহুলোকের মিলন যেখানে গ্লানিহীন সৌন্দর্য্যে

বিকশিত, যথার্থ সভ্যতার লক্ষ্মীকে সেইখানেই তো আসীন দেখি; যেখানে বিরোধ ঠেকাবার জন্য পুলিস-বিভাগের লাল পাগড়ি সেখানে নয়; যেখানে অন্তরের আনন্দে মানুষের মিলন কেবল-যে নিরাময় নিরাপদ্ তা নয়, আপনা-আপনি ভিতরের থেকে সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, সেই-খানেই সভ্যতার উৎকর্ষ। এই জিনিষটিকে এমনিই সুসম্পূর্ণভাবে ইচ্ছে করি নিজের দেশে। কিন্তু এই ছোটো দ্বীপের রাস্তার ধারে যে-ব্যাপারটিকে দেখা গেলো সে কি সহজ কথা! কতকালের সাধনায়, ভিতরের কত গ্রন্থি মোচন ক'রে তবে এইটুকু জিনিষ সহজ হয়! জড়ো হওয়া শক্ত নয়, এক হওয়াই শক্ত। সেই ঐক্যকে সকলের সৃষ্টিশক্তি দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা সুন্দর ক'রে তোলা কতই শক্তিসাধ্য! আমাদের মিলিত কাজকে সকলে এক হ'য়ে উৎসবের রূপ দেওয়া আবশ্যক। আনন্দকে সুন্দরকে নানামূর্ত্তিতে নানা উপলক্ষ্যে প্রকাশ করা চাই। সেই প্রকাশে সকলেই আপন-আপন ইচ্ছার আপন-আপন শক্তির যোগদান ক'র্‌তে থাক্‌লে তবেই আমাদের ভিতরকার খোঁচাগুলো ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হ'য়ে যায়, ঝর্‌নার জল ক্রমাগত বইতে থাক্‌লে তলার নুড়িগুলি যেমন সুডোল হ'য়ে আসে। আমাদের অনেক তপস্বী মনে করেন সাধনায় জ্ঞান ও কর্ম্মই যথেষ্ট। কিন্তু বিধাতার রচনায় তিনি দেখিয়েচেন শুধু স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া নয়, রসেই সৃষ্টির চরম সম্পূর্ণতা। মরুর মধ্যে যা-কিছু শক্তি সমস্তই বিরোধের শক্তি, বিনাশের শক্তি।

রস যখন সেখানে আসে তখনি প্রাণ আসে, তখন সব শক্তি সেই রসের টানে ফুল ফোটায়, ফল ধরায়, সৌন্দর্য্যে কল্যাণে সে উৎসবের রূপ ধারণ করে।

বেলা আট্‌টা বাজ্‌লো। বারান্দার সাম্‌নে গোটা-দুইতিন মোটর গাড়ি জমা হ'য়েচে। সুরেন সুনীতিতে মিলে নানা আয়তনের বাক্সে ব্যাগে ঝুলিতে থলিতে গাড়ি বোঝাই ক'রেচেন। তাঁরা একদল আগে থাক্‌তেই খেয়াঘাটের দিকে রওনা হবার অভিমুখী। নিকটের পাহাড়ের ঘন সবুজ অরণ্যের 'পরে রৌদ্র প'ড়েচে, দূরের পাহাড় নীলাভ বাষ্পে আবৃত। দক্ষিণ শৈলতটের সমুদ্রখণ্ডটি নিঃশ্বাসের ভাপ-লাগা আয়নার মতো ম্লান। ঐ কাছেই গিরিবক্ষঃসংলগ্ন পল্লীটির বন-বেষ্টনের মধ্যে সুপুরি গাছের শাখাগুলি শীতের বাতাসে দুল্‌চে। ঝর্‌না থেকে মেয়েরা জলপাত্রে জল ব'য়ে আন্‌চে। নীচে উপত্যকায় শস্যক্ষেত্রের ওপারে সাম্‌নের পাহাড়ের গায়ে ঘন গাছের অবকাশে লোকালয়ের আভাস দেখা যায়। নারকেল গাছগুলি মেঘমুক্ত আকাশের দিকে পাতার অঞ্জলি তুলে ধ'রে সূর্য্যালোক পান ক'র্‌চে।

এখান থেকে বিদায় নেবার মুহূর্ত্তে মনে মনে ভাব্‌চি দ্বীপটি সুন্দর, এখানকার লোকগুলিও ভালো তবুও মন এখানে বাসা বাঁধ্‌তে চায় না। সাগর পার হ'য়ে ভারত-বর্ষের আহ্বান মনে এসে পৌঁছ'চ্চে। শিশুকাল থেকে ভারতবর্ষের ভিতর দিয়েই বিশ্বের পরিচয় পেয়েচি ব'লেই যে এমন হয় তা নয়; ভারতবর্ষের আকাশে, বাতাসে,

আলোতে, নদীতে প্রান্তরে প্রকৃতির একটা উদারতা দেখেচি, চিরদিনের মতো আমার মন তাতে ভুলেচে। সেখানে বেদনা অনেক পাই, লোকালয়ে দুর্গতির মূর্ত্তি চারিদিকে— তবু সমস্তকে অতিক্রম ক'রে সেখানকার আকাশে অনাদি-কালের যে-কণ্ঠধ্বনি শুন্‌তে পাই তাতে একটি বৃহৎ মুক্তির আস্বাদ আছে। ভারতবর্ষের নীচের দিকে ক্ষুদ্রতার বন্ধন, তুচ্ছতার কোলাহল, হীনতার বিড়ম্বনা যত বেশি এমন আর কোথাও দেখিনি, তেমনি উপরের দিকে সেখানে বিরাটের আসন-বেদী, অপরিসীমের অবারিত আমন্ত্রণ। তাই আমার মনের কাছে আজকের এই প্রশান্ত প্রভাত সেই দিকেই তা'র আলোকের ইঙ্গিত প্রসারিত ক'রে র'য়েচে।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।

পুনশ্চ:—দ্রুত চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে উপরে উপরে যে-ছবি চোখে জাগ্‌লো, যে-ভাব মনের উপর দিয়ে ভেসে গেলো তাই লিখে দিয়েচি, কিন্তু তাই ব'লে এটাকে বালীর প্রকৃত বিবরণ ব'লে গণ্য করা চ'ল্‌বে না। এই ছবিটিকে হয়তো উপরকার আবরণের জরি বলাও চলে। কিন্তু উপরের আবরণে ভিতরের ভাবের ছাপ নিত্যই পড়ে তো। অতএব আবরণটিকে মানুষের পরিচয় নয় ব'লে উপেক্ষা করা যায় না। যে-আবরণ কৃত্রিম ছদ্মবেশের মতো সত্যকে উপর থেকে চাপা দেয় সেইটেতেই প্রতারণা করে, কিন্তু যে-আবরণ চঞ্চল জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের ওঠায়-পড়ায়, বাঁকায়-চোরায়,

দোলায় কাঁপনে আপনা-আপনি একটা চেহারা পায় মোটের উপর তাকে বিশ্বাস করা চলে। এখানকার ঘরে মন্দিরে, বেশে ভূষায়, উৎসবে অনুষ্ঠানে সব-প্রথমেই যেটা খুব ক'রে মনে আসে সেটা হ'চ্চে সমস্ত জাতটার মনে শিল্প-রচনার স্বাভাবিক উদ্যম। একজন পাশ্চাত্য আর্টিষ্ট্ এখানে তিন বৎসর আছেন ; তিনি বলেন—এদের শিল্পকলা থেমে নেই, সে আপন বেগে আপন পথ ক'রে নিয়ে এগিয়ে চ'লেচে, কিন্তু শিল্পী স্বয়ং সে-সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। তিনি বলেন,—কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এখানে চীনেদের প্রভাব ছিলো, দেখ্‌তে-দেখ্‌তে সেটা আপনি ক্ষ'য়ে আস্‌চে, বালীর চিত্ত আপন ভাষাতেই আত্মপ্রকাশ ক'র্‌তে ব'সেচে। তা'র কাজে এমন অনায়াস প্রতিভা আছে-যে আধুনিক যে দুই-একটি মূর্ত্তি তিনি দেখেচেন সেগুলি য়ুরোপের শিল্প-প্রদর্শনীতে পাঠালে সেখানকার লোক চ'ম্‌কে উঠ্‌বে এই তাঁর বিশ্বাস। এই তো গেলো রূপ-উদ্ভাবন করবার এদের স্বাভাবিক শক্তি। তা'র পরে, এই শক্তিটিই এদের সমাজকে মূর্ত্তি দিচ্চে। এরা উৎসবে অনুষ্ঠানে নানা প্রণালীতে সেই রূপ সৃষ্টি কর্‌বার ইচ্ছাকেই সুন্দর ক'রে প্রকাশ ক'র্‌তে প্রবৃত্ত। যেখানে এই সৃষ্টির উদ্যম নিয়ত সচেষ্ট সেখানে সমস্ত দেশের মুখে একটি শ্রী ও আনন্দ ব্যক্ত হয়। অথচ জীবনযাত্রার সকল অংশই যে শোভন তা বলা যায় না। এর মধ্যে অনেক জিনিষ আছে যা আনন্দকে মারে, অন্ধ সংস্কারের কত কদাচার, কত নিষ্ঠুরতা। যে-মেয়ে বন্ধ্যা, প্রেতলোকে গলায় দড়ি

বেঁধে তাকে অফলা গাছের ডালে চিরদিনের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয় এখানকার লোকের এই বিশ্বাস। কোনো মেয়ে যদি যমজ সন্তান প্রসব করে, এক পুত্র এক কন্যা, তা হ'লে প্রসবের পরেই বিছানা নিজে বহন ক'রে সে শ্মশানে যায়, পরিবারের লোক যমজ সন্তান তা'র পিছন-পিছন বহন ক'রে নিয়ে চলে। সেখানে ডালপালা দিয়ে কোনো রকম ক'রে একটা কুঁড়ে বেঁধে তিন চান্দ্রমাস তাকে কাটাতে হয়। দুই মাস ধ'রে গ্রামের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়, পাপক্ষালনের উদ্দেশে নানাবিধ পূজার্চ্চনা চলে। প্রসূতিকে মাঝে মাঝে কেবল খাবার পাঠানো হয়, সেই কয়দিন তা'র সঙ্গে সকল রকম ব্যবহার বন্ধ। এই সুন্দর দ্বীপের চিরবসন্ত ও নিত্য উৎসবের ভিতরে ভিতরে অন্ধ বুদ্ধির মায়া সহস্র বিভীষিকার সৃষ্টি ক'রেচে, যেমন সে ভারতবর্ষেও ঘরে ঘরে ক'রে থাকে। এর ভয় ও নিষ্ঠুরতা থেকে যে-মোহমুক্ত জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে বাঁচায় যেখানে তা'র চর্চ্চা নেই, তা'র প্রতি বিশ্বাস নেই সেখানে মানুষের আত্মাবমাননা আত্মপীড়ন থেকে তাকে কে বাঁচাবে? তবুও এইগুলোকে প্রধান ক'রে দেখ্‌বার নয়। জ্যোতির্ব্বিদের কাছে সূর্য্যের কলঙ্ক ঢাকা পড়ে না, তবু সাধারণ লোকের কাছে তা'র আলোটাই যথেষ্ট। সূর্য্যকে কলঙ্কী ব'ল্‌লে মিথ্যে বলা হয় না তবুও সূর্য্যকে জ্যোতির্ম্ময় ব'ল্‌লেই সত্য বলা হয়। তথ্যের ফর্দ্দ লম্বা করা যে-সব বৈজ্ঞানিকের কাজ, তাঁরা পশু-সংসারে হিংস্র দাঁত নখের ভীষনতার উপর কলমের ঝোঁক দেবামাত্র কল্পনায় মনে হয় পশুদের জীবন-

যাত্রা কেবল ভয়েরই বাহন। কিন্তু এই সব অত্যাচারের চেয়ে বড়ো হ'চ্চে সেই প্রাণ যা আপনার সদা-সক্রিয় উদ্যমে আপনাতেই আনন্দিত, এমন কি, শ্বাপদের হাত থেকে আত্ম-রক্ষার কৌশল ও চেষ্টা, সেও আনন্দিত প্রাণ-ক্রিয়ারই অংশ। Inter-ocean নামক যে-মাসিক পত্রে একজন লেখকের বর্ণনা থেকে বালীর মেয়েদের দুঃখের বৃত্তান্ত পাওয়া গেলো, সেই কাগজেই আর-একজন লেখক সেখানকার শিল্প-কুশল, উৎসব-বিলাসী, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাকে আনন্দের সঙ্গে দেখেচেন। তাঁর সেই দেখার আলোতে বোঝা যায় গ্লানির কলঙ্কটা অসত্য না হ'লেও সত্যও নয়। এই দ্বীপে আমরা ঘুরেচি, গ্রামে পথে বাজারে শস্যক্ষেত্রে মন্দির-দ্বারে উৎসব-ভূমিতে ঝর্‌না-তলায় বালীর মেয়েদের অনেক দেখেচি, সব জায়গাতেই তাদের দেখ্‌লুম সুস্থ, সুপরিপুষ্ট, সুবিনীত, সুপ্রসন্ন—তাদের মধ্যে পীড়া অপমান অত্যাচারের কোনো চেহারা তো দেখ্‌লুম না। খুঁটিয়ে খবর নিলে নিশ্চয় কলঙ্কের কথা অনেক পাওয়া যাবে—কিন্তু খুঁটিয়ে-পাওয়া ময়লা কথাগুলো সূতো দিয়ে এক সঙ্গে গাঁথলেই সত্যকে স্পষ্ট করা হবে এ-কথা বিশ্বাস কর্‌বার নয়।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।

স্থরবায়া, জাভা।

(১৩)

শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত

সুরকর্ত্তা, জাভা

কল্যাণীয়াসু—

বৌমা, বালী থেকে পার হ'য়ে জাভা দ্বীপে সুরবায়া সহরে এসে নামা গেলো। এই জায়গাটা হ'চ্চে বিদেশী সওদাগরদের প্রধান আখ্ড়া। জাভার সব চেয়ে বড়ো উৎপন্ন জিনিষ চিনি, এই ছোটো দ্বীপটি থেকে দেশ বিদেশে চালান যাচ্চে। এমন এককাল ছিলো পৃথিবীতে চিনি বিতরণের ভার ছিলো ভারতবর্ষের। আজ এই জাভার হাট থেকে চিনি কিনে বৌবাজারের ভীমচন্দ্র নাগের সন্দেশ তৈরি হয়। ধরণী স্বভাবত কী দান করেন আজকাল তা'রই উপরে ভরসা রাখ্তে গেলে ঠক্তে হয়, মানুষ কী আদায় ক'রে নিতে পারে এইটেই হ'লো আসল কথা। গোরু আপনা-আপনি যে-দুধটুকু দেয় তাতে যজ্ঞের আয়োজন চলে না; গৃহস্থের শিশুদের পেট ভরিয়ে বৌবাজারের দোকানে গিয়ে পৌঁছ'বার পূর্ব্বেই ফেঁড়ে শূন্য হ'য়ে যায়। যারা ওস্তাদ গোয়ালা, তা'রা জানে কীরকম খোরাকি ও প্রজননবিধির

দ্বারা গোরুর দুধ বাড়ানো চলে। এই শ্যামল দ্বীপটি ওলন্দাজদের পক্ষে ধরণী-কামধেনুর দুধভরা বাঁটের মতো। তা'রা জানে কোন্ প্রণালীতে এই বাঁট কোনো দিন একফোঁটা শুকিয়ে না যায়, নিয়ত দুধে ভ'রে থাকে, সম্পূর্ণ দুইয়ে-নেবার কৌশলটাও তাদের আয়ত্ত। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষও তাঁদের গোয়ালবাড়ি ভারতবর্ষে ব'সিয়েচেন; চা আর পাট নিয়ে এতকাল তাঁদের হাট গুল্‌জার হ'লো, কিন্তু এদিকে আমাদের চাষের ক্ষেত নির্জ্জীব হ'য়ে এসেচে, সঙ্গে সঙ্গে জিব বেরিয়ে প'ড়্‌লো চাষীদের। এতকাল পরে আজ হঠাৎ তাঁদের নজর প'ড়েচে আমাদের ফসলহীন দুর্ভাগ্যের প্রতি। কমিশন ব'সেচে, তা'র রিপোর্টও বেরোবে। দরিদ্রের চাকাভাঙা মনোরথ রিপোর্টের টানে ন'ড়ে-উঠ্‌বে কিনা জানিনে, কিন্তু রাস্তা বানাবার কাজে যে-সব রাজমজুর লাগ্‌বে মজুরী মিল্‌তে তাদের অসুবিধে হ'বে না। মোট কথা, ওলন্দাজরা এখানে কৃষিক্ষেত্রে খুব ওস্তাদি দেখিয়েচে, তাতে এখানকার লোকের অন্নের সংস্থান হ'য়েচে, কর্ত্তৃপক্ষেরও ব্যবসা চ'লেচে ভালো। এর মধ্যে তত্ত্বটা হ'চ্চে এই যে, দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিষ ব্যবহার ক'র্‌বো এটা ভালো কথা, কিন্তু দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিষ উৎপাদনের শক্তি বাড়াতে হবে এটা হ'লো পাকা কথা। এইখানে বিদ্যার দরকার, সেই বিদ্যা বিদেশ থেকে এলেও তাকে গ্রহণ ক'র্‌লে আমাদের জাত যাবে না, পরন্তু জাম রক্ষা হ'বে।

সুরবায়াতে তিন দিন আমরা যার বাড়িতে অতিথি

ছিলেম, তিনি সুরকর্ত্তার রাজবংশের একজন প্রধান ব্যক্তি; কিন্তু তিনি আপন অধিকার ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ ক'রে এই সহরে এসে বাণিজ্য ক'র্চেন। চিনি রপ্তানির কার্বার; তাতে তাঁর প্রভূত মুনফা। মানুষটি প্রাচীন অভিজাতকুল-যোগ্য মর্য্যাদা ও সৌজন্যের অবতার। তাঁর ছেলে আধুনিক কালের শিক্ষা পেয়েচেন; বিনীত, নম্র, প্রিয়দর্শন,—তাঁরই উপরে আমাদের অতিথি-পরিচর্য্যার ভার। বড়ো ভয় ছিলো পাছে অবিশ্রাম অভ্যর্থনার পীড়নে আরাম-অবকাশ সম্পূর্ণ নষ্ট হ'য়ে যায়। কিন্তু সেই অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিলেম। তাঁদের প্রাসাদের এক অংশ সম্পূর্ণ আমাদের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিরালায় ছিলেম, ত্রুটিবিহীন আতিথ্যের পনেরো-আনা অংশ ছিলো নেপথ্যে। কেবল আহারের সময়েই আমাদের পরস্পরের দেখাসাক্ষাৎ। মনে হ'তো আমিই গৃহকর্ত্তা, তাঁরা উপলক্ষ্য মাত্র। সমাদরের অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিষ ছিলো স্বাধীনতা ও অবকাশ।

এখানে একটি কলা-সভা আছে। সেটা মুখ্যত য়ুরোপীয়। এখানকার সওদাগরের ক্লাবের মতো। ক'ল্কাতার যেমন সঙ্গীতসভা এও তেম্নি। ক'ল্কাতার সভায় সঙ্গীতের অধিকার যতখানি এখানে কলাবিদ্যার অধিকার তা'র চেয়ে বেশি নয়। এইখানে আর্ট সম্বন্ধে কিছু বল্বার জন্যে আমার প্রতি অনুরোধ ছিলো; যথাসাধ্য বুঝিয়ে ব'লেচি। একদিন আমাদের গৃহকর্ত্তার বাড়িতে অনেকগুলি এদেশীয়

প্রধান ব্যক্তিদের সমাগম হ'য়েছিলো। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছিলো আমার কাজ। সুনীতিও একদিন তাঁদের সভায় বক্তৃতা ক'রে এসেচেন, সকলের ভালো লেগেচে।

এখানকার ভারতীয়েরাও একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে এখানকার রাজপুরুষ ও অন্য অনেককে নিমন্ত্রণ ক'রে চা খাইয়েছিলেন। সেদিন আমি কিছু দক্ষিণাও পেয়েচি। এইভাবে এখানে কেটে গেলো, একেবারে এঁদের বাড়ির ভিতরেই। আঙিনায় অনেকগুলি গাছ ও লতাবিতান। আমগাছ, সপেটা, আতা। যে-জাতের আম তাকে এরা বলে মধু, এদের মতে বিশেষভাবে স্বাদু। এবার যথেষ্ট বৃষ্টি হয়নি ব'লে আমগুলো কাঁচা অবস্থাতেই ঝ'রে ঝ'রে প'ড়ে যা'চ্চে। এখানে ভোজনকালে যে-আম খেতে পেয়েচি, দেশে থাক্‌লে সে-আম কেনার পয়সাকে অপব্যয় আর কেটে খাওয়ার পরিশ্রমটাকে বৃথা ক্লান্তিকর ব'লে স্থির ক'র্‌তুম, কিন্তু এখানে তা'র আদরের ত্রুটি হয়নি।

এই আঙিনায় লতামণ্ডপের ছায়ায় আমাদের গৃহকর্ত্রী প্রায়ই বেলা কাটান। চারদিকে শিশুরা গোলমাল ক'র্‌চে, খেলা ক'র্‌চে—সঙ্গে তাদের বুড়ী ধাত্রীরা। মেয়েরা যেখানে-সেখানে ব'সে কাপড়ের উপর এদেশে প্রচলিত সুন্দর বাতির ছাপ-দেওয়া কাজে নিযুক্ত। গৃহকর্ম্মের নানা প্রবাহ এই ছায়াস্নিগ্ধ নিভৃত প্রাঙ্গণের চারিদিকে আবর্ত্তিত।

পরশু সুরকায়া থেকে দীর্ঘ রেলপথ ও রৌদ্রতাপক্লিষ্ট

অপরাহ্লের দু'টি ঘণ্টা কাটিয়ে তিনটের সময় সুরকর্ত্তায় পৌঁছেচি। জাভার সবচেয়ে বড়ো রাজ পরিবারের এইখানেই অবস্থান। ওলন্দাজেরা এঁদের রাজপ্রতাপ কেড়ে নিয়েচে কিন্তু প্রতিপত্তি কাড়তে পারেনি। এই বংশেরই একটি পরিবারের বাড়িতে আছি। তাঁদের উপাধি মঙ্কুনগরো, এঁদেরই এক শাখা সুরকায়ায় আশ্রয় নিয়েচে।

প্রাসাদের একটি নিভৃত অংশ আমরাই অধিকার ক'রে আছি। এখানে স্থান প্রচুর, আরামের উপকরণ যথেষ্ট, আতিথ্যের উপদ্রব নেই। রাজবাড়ি বহুবিস্তীর্ণ বহুবিভক্ত। আমরা যেখানে আছি তা'র প্রকাণ্ড একটি অলিন্দ, সাদা মার্ব্বল পাথরে বাঁধানো, সারি সারি কাঠের থামের উপরে ঢালু কাঠের ছাদ। এই রাজপরিবারের বর্ণ-লাঞ্ছন হ'চ্চে সবুজ ও হল্‌দে, তাই এই অলিন্দের থাম ও ছাদ সবুজে সোনালিতে বিচিত্র। অলিন্দের একধারে গামেলান সঙ্গীতের যন্ত্র সাজানো। বৈচিত্র্যেও কম নয়, সংখ্যাতেও অনেক। সাতসুরের ও পাঁচসুরের ধাতুফলকের যন্ত্র অনেক রকমের, অনেক আয়তনের হাতুড়ি দিয়ে বাজাতে হয়। ঢোলের আকার ঠিক আমাদের দেশেরই মতো, বাজাবার বোল ও কায়দা অনেকটা সেই ধরণের। এ ছাড়া বাঁশি আর ধনু দিয়ে বাজাবার তাঁতের যন্ত্র।

রাজা ষ্টেশনে গিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে এনেছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় একত্র আহারের সময় তাঁর সঙ্গে ভালো ক'রে আলাপ হ'লো। অল্প বয়স, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল মুখশ্রী। ডাচ্

ভাষায় আধুনিক কালের শিক্ষা পেয়েছেন, ইংরেজি অল্প অল্প ব'ল্‌তে ও বুঝ্‌তে পারেন। খেতে ব'স্‌বার আগে বারান্দার প্রান্তে বাজনা বেজে উঠ্‌লো, সেই সঙ্গে এখানকার গানও শোনা গেলো। সে-গানে আমাদের মতো অস্থায়ী অন্তরার বিভাগ নেই। একই ধূয়ো বারবার আবৃত্তি করা হয়, বৈচিত্র্য যা-কিছু তা যন্ত্র বাজনায়। পূর্ব্বের চিঠিতেই ব'লেচি, এদের যন্ত্র বাজনাটা তাল দেবার উদ্দেশ্যে। আমাদের দেশে বাঁয়া তবলা প্রভৃতি তালের যন্ত্র যে-সপ্তকে গান ধরা হয় তা'রই সা সুরে বাঁধা, এখানকার তালের যন্ত্রে গানের সব সুরগুলিই আছে। মনে করো, "তুমি যেয়োনা এখনি, এখনো আছে রজনী" ভৈরবীর এই একছত্র মাত্র কেউ যদি ফিরে ফিরে গাইতে থাকে আর নানাবিধ যন্ত্রে ভৈরবীর সুরেই যদি তালের বোল দেওয়া হয়, আর সেই বোল-যোগেই যদি ভৈরবী রাগিণীর ব্যাখ্যা চলে তাহ'লে যেমন হয় এও সেই রকম। পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লে দেখা যাবে শুন্‌তে ভালোই লাগে, নানা আওয়াজের ধাতুবাদ্যে সুরের নৃত্যে আসর খুব জ'মে ওঠে।

খেয়ে এসে আবার আমরা বারান্দায় ব'স্‌লুম। নাচের তালে ছুটি অল্প বয়সের মেয়ে এসে মেজের উপর পাশাপাশি ব'স্‌লো। বড়ো সুন্দর ছবি। সাজে সজ্জায় চমৎকার সুছন্দ। সোনায়-খচিত মুকুট মাথায়, গলায় সোনার হারে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার হাঁসুলি, মণিবন্ধে সোনার সর্প-কুণ্ডলী বালা; বাহুতে একরকম সোনার বাজুবন্দ, তাকে

এরা বলে কীলক-বাহু। কাঁধ ও দুই বাহু অনাবৃত, বুক থেকে কোমর পর্য্যন্ত সোনায় সবুজে মেলানো আঁট কাঁচুলি; কোমরবন্দ থেকে দুই ধারার বস্ত্রাঞ্চল কোঁচার মতো সাম্‌নে দুল্‌চে। কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত সাড়ির মতোই বস্ত্র-বেষ্টনী, সুন্দর বর্ত্তিকশিল্পে বিচিত্র; দেখ্‌বামাত্রই মনে হয় অজন্তার ছবিটি। এমনতর বাহুল্যবর্জ্জিত সুপরিচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য আমি কখনো দেখিনি। আমাদের নর্ত্তকী বাইজি-দের আঁটপায়জামার উপর অত্যন্ত জবড়জঙ্গ কাপড়ের অসৌষ্ঠবতা চিরদিন আমাকে ভারি কুশ্রী লেগেচে। তাদের প্রচুর গয়না ঘাগ্‌রা ওড়্‌না ও অত্যন্ত ভারি দেহ মিলিয়ে প্রথমেই মনে হয় সাজানো একটা মস্তো বোঝা। তা'রপরে মাঝে মাঝে বাটা থেকে পান খাওয়া, অনুবর্ত্তীদের সঙ্গে কথা-কওয়া, ভুরু ও চোখের নানাপ্রকার ভঙ্গিমা ধিক্কার-জনক ব'লে বোধ হয়, নীতির দিকে থেকে নয় রীতির দিক থেকে। জাপানে ও জাভাতে যে-নাচ দেখ্‌লুম তা'র সৌন্দর্য্য যেমন তা'র শালীনতাও তেম্‌নি নিখুঁৎ। আমরা দেখ্‌লুম এই দুটি বালিকার তনু দেহকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে অশরীরী নাচেরই আবির্ভাব। বাক্যকে অধিকার ক'রেচে কাব্য, বচনকে পেয়ে ব'সেচে বচনাতীত।

শুনেচি অনেক য়ুরোপীয় দর্শক এই নাচের অতিমৃদুতা ও সৌকুমার্য্য ভালোই বাসে না। তা'রা উগ্র মাদকতায় অভ্যস্ত ব'লে এই নাচকে একঘেয়ে মনে করে? আমি তো এ-নাচে বৈচিত্র্যের একটু অভাব দেখ্‌লুম না, সেটা অতি প্রকট নয়

ব'লেই যদি চোখে না পড়ে তবে চোখেরই অভ্যাস-দোষ। কেবলি আমার এই মনে হ'চ্ছিলো যে এ হ'চ্চে কলাসৌন্দর্য্যের একটি পরিপূর্ণ সৃষ্টি, উপাদানরূপে মানুষ দুটি তা'র মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেচে। নাচ হ'য়ে গেলে এরা যখন বাজিয়েদের মধ্যে এসে ব'স্‌লো, তখন তা'রা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তখন দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা'রা গায়ে রং ক'রেচে, কপালে চিত্র ক'রেচে, শরীরের অতিস্ফূর্ত্তিকে নিরস্ত ক'রে দিয়ে একটি নিবিড় সৌষ্ঠব প্রকাশের জন্যে অত্যন্ত আঁট ক'রে কাপড় প'রেচে, সাধারণ মানুষের পক্ষে এ সমস্তই অসঙ্গত, এতে চোখকে পীড়া দেয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের এই রূপান্তর নৃত্যকলায় অপরূপই হ'য়ে ওঠে।

পরদিন সকালে আমরা প্রাসাদের অন্যান্য বিভাগে ও অন্তঃপুরে আহূত হ'য়েছিলুম। সেখানে স্তম্ভশ্রেণী-বিধৃত অতি বৃহৎ একটি সভামণ্ডপ দেখা গেলো, তা'র প্রকাণ্ড ব্যাপ্তি অথচ সুপরিমিত বাস্তুকলার সৌন্দর্য্য দেখে ভারি আনন্দ পেলুম। এ সমস্ত উপযুক্ত বিবরণ তোমরা নিশ্চয় সুরেন্দ্রের চিঠি ও পত্র থেকে পাবে। অন্তঃপুরে অপেক্ষাকৃত ছোটো একটি মণ্ডপে গিয়ে দেখি সেখানে আমাদের গৃহকর্ত্তা ও গৃহস্বামিনী ব'সে আছেন। রাণীকে ঠিক যেন একজন সুন্দরী বাঙালী মেয়ের মতো দেখ্‌তে,—বড়ো বড়ো চোখ, স্নিগ্ধ হাসি, সংযত সৌষম্যের মর্য্যাদা ভারি তৃপ্তিকর। মণ্ডপের বাইরে গাছপালা, আর নানারকম খাঁচায় নানা পাখী। মণ্ডপের ভিতরে গান্‌-বাজনার, ছায়াভিনয়ের, মুখোষের অভিনয়ের,

পুতুল নাচের নানা সরঞ্জাম। একটা টেবিলে বাত্তিক শিল্পের অনেকগুলি কাপড় সাজানো। তা'র মধ্যে থেকে আমাকে তিনটি কাপড় পছন্দ ক'রে নিতে অনুরোধ ক'র্লেন। সেই সঙ্গে আমার দলের প্রত্যেককে একটি একটি ক'রে এই মূল্যবান কাপড় দান ক'র্লেন। কাপড়ের উপর এই রকম শিল্পকাজ ক'র্তে দু-তিন মাস ক'রে লাগে। রাজবাড়ির পরিচারিকারাই এই কাজে সুনিপুণ।

এই রাজবংশীয়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরিবারের যাঁরা, কাল রাত্রে তাঁদের ওখানে নিমন্ত্রণ ছিলো। তাঁর ওখানে রাজ-কায়দার যত রকমের উপসর্গ। যেমন দুই সারস পাখী পরস্পরকে ঘিরে ঘিরে নানা গম্ভীর ভঙ্গীতে নাচে দেখেছি, এখানকার রেসিডেণ্ট আর এই রাজা পরস্পরকে নিয়ে সেই রকম রাজকীয় চাল বিস্তার ক'র্তে লাগ্লেন। রাজা কিম্বা রাজপুরুষদের একটা পদোচিত মর্য্যাদা বাইরের দিক থেকে রক্ষা ক'রে চ'ল্তে হয় মানি, তাতে সেই সব মানুষের সামান্যতা কিছু ঢাকাও পড়ে, কিন্তু বাড়াবাড়ি ক'র্লে তাতে তাদের সাধারণতাকেই হাস্যকরভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়।

কাল রাত্রে যে-নাচ হ'লো সে ন'জন মেয়েতে মিলে। তাতে যেমন নৈপুণ্য তেম্‌নি সৌন্দর্য্য, কিন্তু দেখে মনে হ'লো কাল রাত্রের সেই নাচে স্বত-উচ্ছ্বসিত প্রাণের উৎসাহ ছিলো না—যেন এরা ক্লান্ত, কেবল অভ্যাসের জোরে নেচে যাচ্চে। কাল্‌কের নাচে গুণপনা যথেষ্ট ছিলো কিন্তু তেমন ক'রে

মনকে স্পর্শ ক'র্‌তে পারে নি। রাজার একটি ছেলে পাশে ব'সে আমার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌ছিলেন, তাঁকে আমার বড়ো ভালো লাগ্‌লো। অল্প বয়স, দুই বছর হলাণ্ডে শিক্ষা পেয়েচেন, ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের সৈনিক বিভাগে প্রধান পদে নিযুক্ত। তাঁর চেহারায় ও ব্যবহারে স্বাভাবিক আকর্ষণশক্তি আছে।

কাল রাত্রে আমাদের এখানেও একটা নাচ হ'য়ে গেলো। পূর্ব্বরাত্রে যে-দুইজন বালিকা নেচেছিলো তাদের মধ্যে একজন আজ পুরুষ-সঙের মুখোষ প'রে সঙের নাচ নাচ্‌লে। আশ্চর্য্য ব্যাপারটা হ'চ্চে এর মধ্যে নাচের শ্রী সম্পূর্ণ রক্ষা ক'রেও ভাবে-ভঙ্গীতে গলার আওয়াজে পূরোমাত্রায় বিদূষকতা ক'রে গেলো। পুরুষের মুখোষের সঙ্গে তা'র অভিনয়ের কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য হ'লো না। বেশভূষার সৌন্দর্য্যেও একটুমাত্র ব্যত্যয় হয়নি। নাচের শোভনতাকে বিকৃত না ক'রেও-যে তা'র মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের রস এমন ক'রে আনা যেতে পারে এ আমার কাছে আশ্চর্য্য ঠেক্‌লো। এরা প্রধানত নাচের ভিতর দিয়েই সমস্ত হৃদয়ভাব ব্যক্ত ক'র্‌তে চায় সুতরাং বিদ্রূপের মধ্যেও এরা ছন্দ রাখ্‌তে বাধ্য। এরা বিদ্রূপকেও বিরূপ ক'র্‌তে পারে না—এদের রাক্ষসেরাও নাচে।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৭।

(১৪)

কল্যাণীয়াসু—

বৌমা, শেষ চিঠিতে তোমাকে এখানকার নাচের কথা লিখেছিলুম, ভেবেছিলুম নাচ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হ'য়ে গেলো। এমন সময়ে সেই রাত্রে আর-এক নাচের বৈঠকে ডাক প'ড়্‌লো। সেই অতিপ্রকাণ্ড মণ্ডপে আসর; বহুবিস্তীর্ণ শ্বেত পাথরের ভিত্তিতলে বিদ্যুদ্দীপের আলো ঝল্‌মল্‌ ক'র্‌চে। আহারে বস্‌বার আগে নাচের একটা পালা আরম্ভ হ'লো। পুরুষের নাচ, বিষয়টা হ'চ্চে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে হনুমানের লড়াই। এখানকার রাজার ভাই ইন্দ্রজিত সেজেছেন; ইনি নৃত্যবিদ্যায় ওস্তাদ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই-যে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় ইনি নাচ শিখ্‌তে আরম্ভ ক'রেচেন। অল্প বয়সে সমস্ত শরীরটা যখন নম্র থাকে, হাড় যখন পাকেনি সেই সময়ে এই নাচ শিক্ষা করা দরকার; দেহের প্রত্যেক গ্রন্থি যাতে অতি সহজে সরে, প্রত্যেক মাংসপেশিতে যাতে অনায়াসে জোর পৌঁছ'য় এমন অভ্যাস করা চাই। কিন্তু নাচ সম্বন্ধে রাজার ভাইএর স্বাভাবিক প্রতিভা থাকাতে তাঁকে বেশি চেষ্টা ক'র্‌তে হয়নি।

হনুমান বনের জন্তু, ইন্দ্রজিত 'সুশিক্ষিত রাক্ষস, দুই জনের নাচের ভঙ্গীতে সেই ভাবের পার্থক্যটি বুঝিয়ে দেওয়া

চাই ; নইলে রসভঙ্গ হয়। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সে হ'চ্চে এদের সাজ। সাধারণত আমাদের যাত্রার নাটকে হনুমানের হনুমানত্ব খুব বেশি ক'রে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের কৌতুক উদ্রেক কর্‌বার চেষ্টা হয়। এখানে হনুমানের আভাসটুকু দেওয়াতে তা'র মনুষ্যত্ব আরো বেশি উজ্জ্বল হ'য়েচে। হনুমানের নাচে লম্ফ ঝম্ফ দ্বারা তা'র বানর-স্বভাব প্রকাশ করা কিছুই কঠিন হ'তো না, আর সেই উপায়ে সমস্ত সভা অনায়াসেই অট্টহাস্যে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌তো, কিন্তু কঠিন কাজ হ'চ্চে হনুমানকে মহত্ত্ব দেওয়া। বাংলা দেশের অভিনয় প্রভৃতি দেখ্‌লে বোঝা যায়-যে হনুমানের বীরত্ব, তা'র একনিষ্ঠ ভক্তি ও আত্মত্যাগের চেয়ে তা'র ল্যাজের দৈর্ঘ্য, তা'র পোড়ামুখের ভঙ্গিমা, তা'র বানরত্বই বাঙালীর মনকে বেশি ক'রে অধিকার ক'রেচে। আমাদের পশ্চিমাঞ্চলে তা'র উল্টো। এমন কি হনুমানপ্রসাদ নাম রাখ্‌তে বাপ মায়ের দ্বিধা বোধ হয় না। বাংলায় হনুমান চন্দ্র বা হনুমানেন্দ্র আমরা কল্পনা ক'র্‌তে পারিনে। এদেশের লোকেরাও রামায়ণের হনুমানের বড়ো দিকটাই দেখে। নাচে হনুমানের রূপ দেখ্‌লুম—পিঠ বেয়ে মাথা পর্য্যন্ত ল্যাজ, কিন্তু এমন একটা শোভন ভঙ্গী-যে দেখে হাসি পাবার জো নেই। আর সমস্তই মানুষের মতো। মুকুট থেকে পা পর্য্যন্ত ইন্দ্রজিতের সাজসজ্জা একটি সুন্দর ছবি। তা'র পরে দুই জনে নাচ্‌তে নাচ্‌তে লড়াই,—সঙ্গে সঙ্গে ঢাকে ঢোলে কাঁসরে ঘণ্টায় নানাবিধ যন্ত্রে ও মাঝে মাঝে বহু মানুষের কণ্ঠের গর্জ্জনে

সঙ্গীত খুব গম্ভীর প্রবল ও প্রমত্ত হ'য়ে উঠ্‌চে। অথচ সে সঙ্গীত শ্রুতিকটু একটুও নয়; বহুযন্ত্র-সম্মিলনের সুশ্রাব্য নৈপুণ্য তা'র উদ্দামতার সঙ্গে চমৎকার সম্মিলিত।

নাচ সে বড়ো আশ্চর্য্য। তাতে যেমন পৌরুষ, সৌন্দর্য্যও তেমনি। লড়াইয়ের দ্বন্দ্ব-অভিনয়ে নাচের প্রকৃতি একটু মাত্র এলোমেলো হ'য়ে যায়নি। আমাদের দেশের ষ্টেজে রাজপুত বীরপুরুষের বীরত্ব যে-রকম নিতান্ত খেলো এ তা' একেবারেই নয়। প্রত্যেক ভঙ্গীতে ভারি একটা মর্য্যাদা আছে। গদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ মুষলের আঘাত সমস্তই ত্রুটিমাত্র-বিহীন নাচে ফুটে উঠেচে। সমস্তর মধ্যে অপূর্ব্ব একটি শ্রী অথচ দৃপ্ত পৌরুষের আলোড়ন। এর আগে এখানে মেয়ে-দের নাচ দেখেচি, দেখে মুগ্ধও হ'য়েচি, কিন্তু এই পুরুষের নাচের তুলনায় তাকে ক্ষীণ বোধ হ'লো। এর স্বাদ তা'র চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। যখন ধ্রুপদের নেশায় পেয়ে বসে তখন টপ্পার নিছক মিষ্টতা হাল্কা বোধ হয়, এও সেই রকম।

আজ সকালে দশটার সময়ে আমাদের এখানেই গৃহকর্ত্তা আর-একটি নাচের ব্যবস্থা করেছিলেন। মেয়ে দুজনে পুরুষের ভূমিকা নিয়েছিলো। অর্জ্জুন আর সুবলের যুদ্ধ-গল্পটা হয়তো মহাভারতে আছে কিন্তু আমার তো মনে প'ড়্‌লো না। ব্যাপারটা হ'চ্চে। কোনো-এক বাগানে [illegible] অস্ত্র ছিলো, সেই অস্ত্র চুরি ক'রেছে সুবল, সে খুঁজে বেড়াচ্চে [illegible]। অর্জ্জুন ছিলো [illegible]

খানিকটা কথাবার্তার পরে দুজনের লড়াই। সুবলের কাছে বলরামের লাঙল অস্ত্রটা ছিলো। যুদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে অর্জ্জুন সেটা কেড়ে নিয়ে তবে সুবলকে মার্‌তে পার্‌লে।

নর্ত্তীরা-যে মেয়ে সেটা বুঝ্‌তে কিছুই বাধে না, অতিরিক্ত যত্নে সেটা লুকোবার চেষ্টাও করেনি। তা'র কারণ, যারা নাচ্‌চে তা'রা মেয়ে কি পুরুষ সেটা গৌণ, নাচটা কী সেইটেই দেখ্‌বার বিষয়। দেহটা মেয়ের কিন্তু লড়াইটা পুরুষের, এর মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা আছে ব'লেই এই অদ্ভুত সমাবেশে বিষয়টা আরো যেন তীব্র হ'য়ে ওঠে। কমনীয়তার আধারে বীর-রসের উচ্ছলতা। মনে করো,—বাঘ নয়, সিংহ নয়, জবা-ফুলে ধুৎরা ফুলে সাংঘাতিক হানাহানি, ডাঁটায় ডাঁটায় সংঘর্ষ, পাপড়িগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ; এদিকে বনসভা কাঁপিয়ে বৈশাখী ঝড়ের গামেলান বাজ্‌চে, গুরু গুরু মেঘের মৃদঙ্গ, গাছের ডালে ডালে ঠকাঠকি, আর সোঁ সোঁ শব্দে বাতাসের বাঁশি।

সব-শেষে এলেন রাজার ভাই। এবার তিনি একলা নাচ্‌লেন। তিনি ঘটোৎকচ। হাস্যরসিক বাঙালী হয়তো ঘটোৎকচকে নিয়ে বরাবর হাসাহাসি ক'রে এসেচে। এখানকার লোকচিত্তে ঘটোৎকচের খুব আদর। সেইজন্যেই মহাভারতের গল্প এদের হাতে আরো অনেকখানি বেড়ে গেলো। এরা ঘটোৎকচের সঙ্গে ভাগিবা (ভার্গবী) ব'লে এক মেয়ের ঘটালে বিয়ে। সে-মেয়েটি আবার অর্জ্জুনের কন্যা। বিবাহ সম্বন্ধে এদের প্রথা য়ুরোপের কাছাকাছি যায়। খুড়্‌তুত জাঠতুত ভাইবোনে বাধা নেই। ভাগিবার গর্ভে

ঘটোৎকচের একটি ছেলেও আছে তা'র নাম শশিকিরণ। যা হোক আজকের নাচের বিষয়টা হ'চ্চে প্রিয়তমাকে স্মরণ ক'রে বিরহী ঘটোৎকচের ঔৎসুক্য। এমন কি, মাঝে মাঝে মূর্চ্ছার ভাবে সে মাটিতে ব'সে প'ড়্চে, কল্পনায় আকাশে তা'র ছবি দেখে সে ব্যাকুল। অবশেষে আর থাক্‌তে না পেরে প্রেয়সীকে খুঁজতে সে উড়ে চ'লে গেলো। এর মধ্যে একটি ভাব্‌বার জিনিষ আছে। য়ুরোপীয় শিল্পীর এঞ্জেলদের মতো এরা ঘটোৎকচের পিঠে নকল পাখা বসিয়ে দেয়নি। চাদরখানা নিয়ে নাচের ভঙ্গীতে ওড়ার ভাব দেখিয়েচে। এর থেকে মনে প'ড়ে গেলো শকুন্তলা নাটকে কবির নির্দ্দেশ-বাক্য "রথবেগং নাটয়তি", বোঝা যাচ্চে রথবেগটা নাচের দ্বারাই প্রকাশ হ'তো, রথের দ্বারা নয়।

রামায়ণের মহাভারতের গল্প এদেশের মনকে জীবনকে যে কী রকম গভীরভাবে অধিকার ক'রেচে তা এই ক'দিনেই স্পষ্ট বোঝা গেলো। ভূগোলের বইয়ে পড়া গেচে বিদেশ থেকে অনুকূল ক্ষেত্রে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের নতুন আমদানি হবার অনতিকাল পরেই দেখ্‌তে দেখ্‌তে তা'রা সমস্ত দেশকে ছেয়ে ফেলেচে; এমন কি, যেখান থেকে তাদের আনা হ'য়েচে সেখানেও তাদের এমন অপরিমিত প্রভাব নেই। রামায়ণ মহাভারতের গল্প এদের চিত্তক্ষেত্রে তেমনি ক'রে এসে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেচে। চিত্তের এমন প্রবল উদ্বোধন কলারচনায় নিজেকে প্রকাশ না ক'রে থাক্‌তে পারে না। সেই প্রকাশের অপর্য্যাপ্ত আনন্দ দেখা দিয়েছিলো

বরোবুদরের মূর্ত্তি কল্পনায়। আজ এখানকার মেয়েপুরুষ নিজেদের দেহের মধ্যেই যেন মহাকাব্যের পাত্রদের চরিত-কথাকে নৃত্যমূর্ত্তিতে প্রকাশ ক'র্‌চে, ছন্দে ছন্দে এদের রক্ত-প্রবাহে সেই সকল কাহিনী ভাবের বেগে আন্দোলিত।

এছাড়া কত রকম-বেরকমের অভিনয়, তা'র অধিকাংশই এই সকল বিষয় নিয়ে। বাইরের দিকে ভারতবর্ষের থেকে এরা বহু শতাব্দী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ; তবু এতকাল এই রামায়ণ মহাভারত নিবিড়ভাবে ভারতবর্ষের মধ্যেই এদের রক্ষা ক'রে এসেচে। ওলন্দাজরা এই দ্বীপগুলিকে বলে ডাচ্‌ ইণ্ডীস্‌, বস্তুত এদের বলা যেতে পারে ব্যাস ইণ্ডীস্‌।

পূর্ব্বেই ব'লেচি এরা ঘটোৎকচের ছেলের নাম রেখেচে শশিকিরণ। সংস্কৃত ভাষা থেকে নাম রচনা এদের আজও চ'লেচে। মাঝে মাঝে নামকরণ অদ্ভুত রকম হয়। এখান-কার রাজবৈদ্যের উপাধি ক্রীড়-নির্ম্মল। আমরা যাকে নিরাময় বা নীরোগ ব'লে থাকি এরা নির্ম্মল শব্দকে সেই অর্থ দিয়েচে। এদিকে ক্রীড় শব্দ আমাদের অভিধানে খেলা, কিন্তু ক্রীড় ব'ল্‌তে এখানে বোঝাচ্চে উদ্যোগ। রোগ দূর করাতেই যার উদ্যোগ সেই হ'লো ক্রীড়-নির্ম্মল। ফসলের ক্ষেতে যে সেঁচ দেওয়া হয় তাকে এরা বলে সিন্ধু-অমৃত। এখানে জল অর্থেই সিন্ধু কথার ব্যবহার, ক্ষেত্রকে যে-জল-সেচ মৃত্যু থেকে বাঁচায় সেই হ'লো সিন্ধু-অমৃত। আমাদের গৃহস্বামীর একটি ছেলের নাম সরোষ, আর একটির নাম সন্তোষ। বলা বাহুল্য সরোষ ব'ল্‌তে এখানে রাগী মেজাজের

লোক বোঝায় না, বুঝ্‌তে হবে সঙ্কেতে। রাজার মেয়ের নাম কুসুমবর্দ্ধিনী। অনন্তকুসুম, জাতিকুসুম, কুসুমায়ুধ, কুসুমব্রত এমন সব নামও শোনা যায়। এদের নামে যেমন বিশুদ্ধ ও সুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এমনতর আমাদের দেশে দেখা যায় না। যেমন আত্মসুবিজ্ঞ, শাস্ত্রাত্ম, বীর-পুস্তক, বীর্য্যসুশাস্ত্র, সহস্র-প্রবীর, বীর্য্যসুব্রত, পদ্মসুশাস্ত্র, কৃতাধিরাজ, সহস্রসুগন্ধ, পূর্ণপ্রণত, যশোবিদগ্ধ, চক্রাধিরাজ, মৃত্যুঞ্জয়, আর্য্যসুতীর্থ, কৃতস্মর, চক্রাধিব্রত, সূর্য্যপ্রণত, কৃতবিভব।

যেদিন যে-রাজার বাড়িতে গিয়েছিলেম তাঁর নাম সুসুহুনন পাকু-ভুবন। তাঁরি এক ছেলের বাড়িতে কাল আমাদের নিমন্ত্রণ ছিলো, তাঁর নাম অভিমন্যু। এঁদের সকলেরই সৌজন্য স্বাভাবিক, নম্রতা সুন্দর। সেখানে মহাভারতের বিরাট পর্ব্ব থেকে ছায়াভিনয়ের পালা চ'ল্‌ছিলো। ছায়াভিনয় এদেশ ছাড়া আর কোথাও দেখিনি, অতএব বুঝিয়ে বলা দরকার। একটা সাদা কাপড়ের পট টাঙানো, তা'র সাম্‌নে একটা মস্ত প্রদীপ উজ্জ্বল শিখা নিয়ে জ্ব'ল্‌চে, তা'র দুই ধারে পাতলা চামড়ায় আঁকা মহাভারতের নানা চরিত্রের ছবি সাজানো, তাদের হাতপাগুলো দড়ির টানে নড়ানো যায় এমনভাবে গাঁথা। এই ছবিগুলি এক একটা লম্বা কাঠিতে বাঁধা। একজন সুর ক'রে গল্পটা আউড়ে যায়, আর সেই গল্প অনুসারে ছবিগুলিকে পটের উপরে নানা ভঙ্গীতে নাড়াতে দোলাতে চালাতে থাকে। ভাবের সঙ্গে

সঙ্গতি রেখে গামেলান বাজে। এ যেন মহাভারত-শিক্ষার একটা ক্লাসে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ছবির অভিনয়-যোগে বিষয়টা মনে মুদ্রিত ক'রে দেওয়া। মনে করো এমনি ক'রে যদি স্কুলে ইতিহাস শেখানো যায়,—মাষ্টার মশায় গল্পটা ব'লে যান আর একজন পুতুল-খেলাওয়ালা প্রধান প্রধান ব্যাপারগুলো পুতুলের অভিনয় দিয়ে দেখিয়ে যেতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাব অনুসারে নানা সুরে তালে বাজনা বাজে, ইতিহাস শেখ্‌বার এমন সুন্দর উপায় কি আর হ'তে পারে?

মানুষের জীবন বিপদ-সম্পদ-সুখ-দুঃখের আবেগে নানা প্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হ'য়ে চ'ল্‌চে; তা'র সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ ক'র্‌তে হয় তাহ'লে সে একটা বিচিত্র সঙ্গীত হ'য়ে ওঠে; তেমনি আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবলমাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ ক'র্‌তে হয় তাহ'লে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সুরই হোক্ আর নৃত্যই হোক্ তা'র একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাঞ্চল্য সঞ্চার ক'রে তাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখে; কোনো ব্যাপারকে নিবিড় ক'রে উপলব্ধি করাতে হ'লে আমাদের চৈতন্যকে এই রকম বেগবান ক'রে তুল্‌তে হয়। এই দেশের লোক ক্রমাগতই সুর ও নাচের সাহায্যে রামায়ণ মহাভারতের গল্পগুলিকে নিজের চৈতন্যের মধ্যে সর্ব্বদাই দোলায়িত ক'রে রেখেচে। এই কাহিনীগুলি রসের ঝর্‌নাধারায় কেবলি এদের জীবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত। রামায়ণ মহাভারতকে এমনি নানাবিধ প্রাণবান

উপায়ে সর্ব্বতোভাবে আত্মসাৎ কর্‌বার চেষ্টা। শিক্ষার বিষয়কে একান্ত গ্রহণ ও ধারণ কর্‌বার প্রকৃষ্ট প্রণালী কী তা যেন সমস্ত দেশের লোকে মিলে উদ্ভাবন ক'রেচে,—রামায়ণ মহাভারতকে গভীর ক'রে পাবার আগ্রহে ও আনন্দেই এই উদ্ভাবনা স্বাভাবিক হ'লো।

কাল যে-ছবির অভিনয় দেখা গেলো তাও প্রধানতই নাচ অর্থাৎ ছন্দোময় গতির ভাষা দিয়ে গল্প-বলা। এর থেকে একটা কথা বোঝা যাবে, এদেশে নাচের মনোহারিতা ভোগ কর্‌বার জন্যেই নাচ নয়; নাচটা এদের ভাষা। এদের পুরাণ ইতিহাস নাচের ভাষাতেই কথা কইতে থাকে। এদের গামেলানের সঙ্গীতটাও সুরের নাচ। কখনো দ্রুত, কখনো বিলম্বিত, কখনো প্রবল কখনো মৃদু, এই সঙ্গীতটাও সঙ্গীতের জন্যে নয়, কোনো একটা কাহিনীকে নৃত্যচ্ছন্দের অনুষঙ্গ দেবার জন্যে।

দীপালোকিত সভায় এসে যখন প্রথম ব'স্‌লুম তখন ব্যাপারখানা দেখে কিছুই বুঝ্‌তে পারা গেলো না। বিরক্তি বোধ হ'তে লাগ্‌লো। খানিক বাদে আমাকে পটের পশ্চাৎ ভাগে নিয়ে গেলো। সেদিকে আলো নেই, সেই অন্ধকার ঘরে মেয়েরা ব'সে দেখ্‌চে। এদিকটাতে ছবিগুলি অদৃশ্য, ছবিগুলিকে যে-মানুষ নাচাচ্চে তাকেও দেখা যায় না, কেবল আলোকিত পটের উপর অন্য পিঠের ছবির ছায়াগুলি নেচে বেড়াচ্চে। যেন উত্তানশায়ী শিবের বুকের উপরে মহামায়ার নাচ। জ্যোতির্লোকে যে-সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন তিনি যখন

নিজের সৃষ্টিপটের আড়ালে নিজেকে গোপন রাখেন তখন আমরা সৃষ্টিকে দেখ্‌তে পাই। সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে সৃষ্টির অবিশ্রাম যোগ আছে ব'লে যে জানে সেই তাকে সত্য ব'লে জানে। সেই যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখ্‌লে এই চঞ্চল ছায়াগুলোকে নিতান্তই মায়া ব'লে বোধ হয়। কোনো কোনো সাধক পটটাকে ছিঁড়ে ফেলে ওপারে গিয়ে দেখ্‌তে চায়,—অর্থাৎ সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিকর্ত্তাকে দেখ্‌বার চেষ্টা—কিন্তু তা'র মতো মায়া আর কিছুই হ'তে পারে না। ছায়ার খেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে এই কথাটাই কেবল আমার মনে হ'চ্ছিলো।

আমি যখন চ'লে আসচি আমাদের নিমন্ত্রণকর্ত্তা আমাকে খুব একটি মূল্যবান উপহার দিলেন। বড়ো একটি বাটিক শিল্পের কাপড়। ব'ল্‌লেন, এই রকমের বিশেষ কাপড় রাজবংশের ছেলেরা ছাড়া কেউ প'র্‌তে পায় না। সুতরাং এ-জাতের কাপড় আমি কোথাও কিন্‌তে পেতুম না।

আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হ'লো। কাল যাবো যোগ্যকর্ত্তায়। সেখানকার রাজবাড়িতেও নাচগান প্রভৃতির রীতি-পদ্ধতি বিশুদ্ধ প্রাচীনকালের, অথচ এখানকার সঙ্গে পার্থক্য আছে। যোগ্যকর্ত্তা থেকে বোরোবুদর কাছেই; মোটরে ঘণ্টাখানেকের পথ। আরো দিন পাঁচ ছয় লাগ্‌বে এই সমস্ত দেখে শুনে নিতে, তা'র পরে ছুটি।

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭।

(১৫)

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লিখিত।

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, এখানকার দেখাশুনো প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। ভারতবর্ষের সঙ্গে জোড়াতাড়া-দেওয়া এদের লোকযাত্রা দেখে পদে পদে বিস্ময় বোধ হ'য়েছে। রামায়ণ মহাভারত এখানকার লোকের প্রাণের মধ্যে যে কীরকম প্রাণবান হ'য়ে র'য়েছে, সে-কথা পূর্ব্বেই লিখেচি। প্রাণবান ব'লেই এ জিনিষটা কোনো লিখিত সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি নয়। এখানকার মানুষের বহুকালের ভাবনা ও কল্পনার ভিতর দিয়ে তা'র অনেক বদল হ'য়ে গেচে; তা'র প্রধান কারণ, মহাভারতকে এরা নিজেদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে প্রতিদিন ব্যবহার ক'রেচে। সংসারের কর্ত্তব্যনীতিকে এরা কোনো শাস্ত্রগত উপদেশের মধ্যে সঞ্চিত পায়নি, এই দুই মহাকাব্যের নানা চরিত্রের মধ্যে তা'রা যেন মূর্ত্তিমান। ভালোমন্দ নানা শ্রেণীর মানুষকে বিচার করবার মাপকাঠি এই সব চরিত্রে। এই জন্যেই জীবনের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই জীবনের সামগ্রীর অনেক রকম বদল হ'য়েচে। কালে

কালে বাঙালী গায়কের মুখে মুখে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদগুলি যেমন রূপান্তরিত হ'য়েচে এও তেমনি। কাল আমরা যে-ছায়াভিনয় দেখতে গিয়েছিলেম তা'র গল্পটাকে টাইপ ক'রে আমাদের হাতে দিয়েছিলো। সেটা পাঠিয়ে দিচ্চি, প'ড়ে দেখো। মূল মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে এটা বাংলায় তর্জ্জমা ক'রে নিয়ো। এ গল্পের বিশেষত্ব এই যে, এর মধ্যে দ্রৌপদী নেই। মূল মহাভারতের ক্লীব বৃহন্নলা এই গল্পে নারীরূপে "কেন-বর্দ্দি" নাম গ্রহণ ক'র্চে। কীচক এ'কে দেখেই মুগ্ধ হয় ও ভীমের হাতে মারা পড়ে। এই কীচক জাবানী মহাভারতে মৎস্যপতির শত্রু, পাণ্ডবেরা এ'কে বধ ক'রে বিরাটের রাজার কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছিলো।

আমি মঙ্কুনগরো উপাধিকারী যে-রাজার বাড়ির অলিন্দে ব'সে লিখ্‌চি চারিদিকে তা'র ভিত্তিগাত্রে রামায়ণের চিত্র রেশমের কাপড়ের উপর অতি সুন্দর ক'রে অঙ্কিত। অথচ ধর্ম্মে এঁরা মুসলমান। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের দেব-দেবীদের বিবরণ এঁরা তন্ন তন্ন ক'রে জানেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূ-বিবরণের গিরি নদীকে এঁরা নিজেদের দেশের মধ্যে গ্রহণ ক'রেচেন। বস্তুত সেটাতে কোনো অপরাধ নেই, কেন-না রামায়ণ মহাভারতের নরনারীরা ভাবমূর্ত্তিতে এঁদের দেশেই বিচরণ ক'র্চেন; আমাদের দেশ তাঁদের এমন সর্ব্বজনব্যাপী পরিচয় নেই, সেখানে ক্রিয়া কর্ম্মে উৎসবে আমোদে ঘরে ঘরে তাঁরা এমন ক'রে বিরাজ করেন না।

আজ রাত্রে রাজসভার জাবানী শ্রোতাদের কাছে আমার

কথা ও কাহিনী থেকে ক'একটি কথা আবৃত্তি ক'রে শোনাবো। একজন জাবানী সেগুলি নিজের ভাষায় তর্জ্জমা ক'রে ব্যাখ্যা ক'র্‌বেন। কাল সুনীতি ভারতী চিত্রকলা সম্বন্ধে দীপচিত্র সহযোগে বক্তৃতা ক'রেছিলেন। আজ আবার তাঁকে সেইটে ব'ল্‌তে রাজা অনুরোধ ক'রেচেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব কথা জান্‌তে এঁদের বিশেষ আগ্রহ।

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

(১৬)

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত।

কল্যাণীয়েষু

রথী, শূরকর্ত্তার মঙ্কুনগরের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে যোগ্যকর্ত্তায় পাকোয়ালাম উপাধিধারী রাজার প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েচি। শূরকর্ত্তার সহরে একটি নূতন সাঁকো ও রাস্তা তৈরি শেষ হ'য়েচে, সেই রাস্তা পথিকদের ব্যবহারের জন্যে মুক্ত ক'রে দেবার ভার আমার উপরে ছিলো। সাঁকোর সাম্‌নে রাস্তা আট্‌কে একটা কাগজের ফিতে টাঙানো ছিলো, কাঁচি দিয়ে সেটা কেটে দিয়ে পথ খোলসা করা গেলো। কাজটা আমার লাগ্‌লো ভালো, মনে হ'লো পথের

বাধা দূর করাই আমার ব্রত। আমার নামে এই রাস্তার নামকরণ হ'য়েচে।

পথে আসতে পেরাম্বান ব'লে এক জায়গায় পুরোনো ভাঙা মন্দির দেখ্‌তে নাম্‌লুম। এ-জায়গাটা ভুবনেশ্বরের মতো মন্দিরের ভগ্নস্তূপে পরিকীর্ণ। ভাঙা পাথরগুলি জোড়া দিয়ে দিয়ে ওলন্দাজ গবর্মেণ্ট মন্দিরগুলিকে তা'র সাবেক মূর্ত্তিতে গ'ড়ে তুল্‌চেন। কাজটা খুব কঠিন, অল্প অল্প ক'রে এগোচ্চে; দুই একজন বিচক্ষণ য়ুরোপীয় পণ্ডিত এই কাজে নিযুক্ত। তাঁদের সঙ্গে আলাপ ক'রে বিশেষ আনন্দ পেলুম। এই কাজ সুসম্পূর্ণ কর্‌বার জন্যে আমাদের পুরাণগুলি নিয়ে এঁরা যথেষ্ট আলোচনা ক'র্‌চেন। অনেক জিনিষ মেলে না, অথচ সেগুলি যে জাবানী লোকের স্মৃতিবিকার থেকে ঘ'টেচে তা নয়, তখনকার কালের ভারতবর্ষের লোক-ব্যবহারের মধ্যে এর ইতিহাস নিহিত। শিবমন্দিরই এখানে প্রধান। শিবের নানাবিধ নাট্যমুদ্রা এখানকার মূর্ত্তিতে পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে তা'র বিস্তারিত সন্ধান পাওয়া যা'চ্চে না। একটা জিনিষ ভেবে দেখ্‌বার বিষয়। শিবকে এদেশে গুরু, মহাগুরু ব'লে অভিহিত ক'রেচে। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধের গুরুপদ শিবই অধিকার ক'রেছিলেন, মানুষকে তিনি মুক্তির শিক্ষা দেন। এখানকার শিব নটরাজ, তিনি মহাকাল, অর্থাৎ সংসারে যে-চলার প্রবাহ, জন্ম-মৃত্যুর যে-ওঠাপড়া সে তাঁরই নাচের ছন্দে,—তিনি ভৈরব, কেননা তাঁর লীলার অঙ্গই হ'চ্চে মৃত্যু। আমাদের দেশে

এক সময়ে শিবকে দুইভাগ ক'রে দেখেছিলো। একদিকে তিনি অনন্ত, তিনি সম্পূর্ণ, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি প্রশান্ত; আর একদিকে তাঁরই মধ্যে কালের ধারা তা'র পরিবর্ত্তন-পরম্পরা নিয়ে চ'লেচে, কিছুই চিরদিন থাকচে না, এইখানে মহাদেবের তাণ্ডবলীলা কালীর মধ্যে রূপ নিয়েচে। কিন্তু জাভায় কালীর কোনো পরিচয় নেই। কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলারও কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। পূতনা-বধ প্রভৃতি অংশ আছে কিন্তু গোপীদের দেখ্তে পাইনে। এর থেকে সেই সময়কার ভারতের ইতিহাসের কিছু ছবি পাওয়া যায়। এখানে রামায়ণ মহাভারতের নানাবিধ গল্প আছে যা অন্তত সংস্কৃত মহাকাব্যেও বাংলাদেশে অপ্রচলিত। এখানকার পণ্ডিতদেব মত এই যে, জাবানীরা ভারতবর্ষে গিয়ে অথবা জাভায় সমাগত ভারতীয়দের কাছ থেকে লোকমুখে প্রচলিত নানা গল্প শুনেছিলো, সেইগুলোই এখানে র'য়ে গেচে। অর্থাৎ সে-সময়ে ভারতবর্ষেই নানা স্থানে নানা গল্পের বৈচিত্র্য ছিলো। আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোনো পণ্ডিতই রামায়ণ মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনা করেন নি। ক'র্তে গেলে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে স্থানীয় ভাষায় যে সব কাব্য আছে মূলের সঙ্গে সেইগুলি মিলিয়ে দেখা দরকার হয়। কোনো এক সময়ে কোনো এক জার্মাণ পণ্ডিত এই কাজ ক'র্বেন ব'লে অপেক্ষা ক'রে আছি। তা'র পরে তাঁর লেখার কিছু প্রতিবাদ কিছু সমর্থন ক'রে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আমরা ডাক্তার উপাধি পাবো।

এখানে পাকোয়ালাম লোকটিকে বড়ো ভালো লাগ্‌লো। শান্ত গম্ভীর শিক্ষিত চিন্তাশীল। জাভার প্রাচীন কলাবিদ্যা প্রভৃতিকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে উৎসুক। যোগ্যকর্ত্তার প্রধান ব্যক্তি হ'চ্চেন এখানকার সুলতান। তাঁর বাড়িতে রাত্রে নাচ দেখ্‌বার নিমন্ত্রণ ছিলো। সেখানে একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের কাছে শোনা গেলো যে এই জায়গাটির নাম ছিলো অযোধ্যা, ক্রমে তা'রই অপভ্রংশ হ'য়ে এখন যোগ্যা নামে এসে ঠেকেছিলো।

এখানে যে-নাচ দেখ্‌লুম সে চারজন মেয়ের নাচ। রাজবংশের মেয়েরাই নাচেন। চারজনের মধ্যে দুজন ছিলেন সুলতানেরই মেয়ে। এখানে এসে যত নাচ দেখেচি সব চেয়ে এইটে সুন্দর লেগেচে। বর্ণনা দ্বারা এ বোঝানো অসম্ভব। এমন অনিন্দ্যসম্পূর্ণ রূপসৃষ্টি দেখা যায় না। এইসব নাচের একটা দিক আছে যেটা এর বাইরের সৌন্দর্য্য, আর একটা হ'চ্চে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর বিশেষ অর্থ আছে। যারা সেগুলি জানে তা'রাই এর শোভার সঙ্গে এর ভাষাকে মিলিয়ে সম্পূর্ণ আনন্দ পেতে পারে। এখানে নাচ-শিক্ষার বিদ্যালয় আছে সেখানে নিমন্ত্রণ পাওয়া গেচে। সেখানে গেলে এদের নাচের তত্ত্ব আরো কিছু বুঝ্‌তে পার্‌বো আশা ক'র্‌চি।

আজ রাত্রে রামায়ণ থেকে যে-অভিনয় হবে তা'র একটি সূচিপত্র পাঠাই। এটা প'ড়্‌লে বোঝা যায় এখানকার রামায়ণ কথার ভাবখানা কী।

বৌমা ১লা আগষ্টে যে-চিঠি পাঠিয়েছিলেন আজ দেড় মাস পরে সেটি আমার হাতে এলো। আমার চিঠির কোন্‌-গুলো তোমাদের কাছে পৌঁছ'লো কোন্‌গুলো পৌঁছ'লো না তা কেমন ক'রে জান্‌বো ?

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭।

(১৭)

শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

যোগ্যকর্ত্তা
জাভা।

কল্যাণীয়াসু

রাণী, এখানকার পালা শেষ হ'য়ে এলো, শরীরটাও ক্লান্ত। এখানে যে-রাজার বাড়িতে আছি কাল রাত্রে তিনি ছায়াভিনয়ের একটি পালা দেখাবেন তা'র পরে আমরা যাবো বরোবুদরে। সেখানে দুদিন কাটিয়ে ফের্‌বার পথে বাটাভিয়াতে গিয়ে জাহাজে চ'ড়ে ব'স্‌বো।

কাল রাত্রে এক জায়গায় গিয়েছিলুম জটায়ু-বধের অভিনয় দেখতে। দেখে এদেশের লোকের মনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যাকে অভিনয় বলি তা'র

প্রধান অংশ কথা, বাকি অংশ হ'চ্চে নানা প্রকার হৃদয়-ভাবের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলীর প্রতিরূপ দেখানো। এখানে তা নয়। এখানে প্রধান জিনিষ হ'চ্চে ছবি এবং গতিছন্দ। কিন্তু সেই ছবি ব'ল্‌তে প্রতিরূপ নয়, মনোহর রূপ। আমরা সংসারে যে-দৃশ্য সর্ব্বদা দেখি তা'র সঙ্গে খুব বেশি অনৈক্য হ'লেও এদের বাধে না। পৃথিবীতে মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে চলা-ফেরা ক'রে থাকে। এই অভিনয়ে সবাইকে ব'সে ব'সে চ'ল্‌তে ফির্‌তে হয়। সেও সহজ চলা-ফেরা নয়, প্রত্যেক নড়া-চড়া নাচে ভঙ্গীতে। মনে মনে এরা এমন একটা কল্প-লোক সৃষ্টি ক'রেচে যেখানে সবাই বসার অবস্থায় নেচে বেড়ায়। এই পঙ্গু মানুষের দেশ যদি প্রহসনের দেশ হ'তো তা হ'লেও বুঝ্‌তুম। একেবারেই তা নয়, এ মহাকাব্যের দেশ। এরা স্বভাবকে খাতির ক'র্‌তে চায় না। স্বভাব তা'র প্রতিশোধ-স্বরূপে যে এদের বিদ্রূপ ক'র্‌বে, এদের হাস্যকর ক'রে তুল্‌বে তা'ও ঘ'ট্‌লো না। স্বভাবের বিকারকেও এরা সুদৃশ্য ক'র্‌বে এই এদের পণ। ছবিটাই এদের লক্ষ্য, স্বভাবের অনুকরণ এদের লক্ষ্য নয় এই কথাটা এরা যেন স্পর্দ্ধার সঙ্গে ব'ল্‌তে চায়। মনে করোনা কেন, প্রথম দৃশ্যটা রাজসভায় দশরথ ও তাঁর অমাত্যবর্গ। রঙ্গভূমিতে এরা সবাই গুড়ি মেরে প্রবেশ ক'র্‌লো। মনে হয় এর চেয়ে অদ্ভুত কিছুই হ'তে পারে না। ব্যাপারটাকে হাস্য-করতা থেকে বাঁচানো কত কঠিন ভেবে দেখো। কিন্তু

এতে আমরা বিরূপ কিছুই দেখ্‌লুম না, এরা দশরথ কিংবা রাজামাত্য সে কথাটা সম্পূর্ণ গৌণ হ'য়ে গেলো। পরের দৃশ্যে কৈকেয়ী প্রভৃতি রাণী আর সখীরা তেম্‌নি ক'রেই বসা-অবস্থায় হেলে তুলে নেচে নেচে প্রবেশ ক'র্‌লে। আট নয় বছরের ছেলেরা সব কৌশল্যা প্রভৃতি রাণী সেজেচে। এদিকে কৌশল্যার ছেলে রাম যে সেজেচে তা'র বয়স অন্তত পঁচিশ হবে। এটা যে কতবড়ো অসঙ্গত সে প্রশ্ন কারো মনেই আসে না, কেন না এরা দেখ্‌চে ছবির নাচ। যতক্ষণ সেটাতে কোনো দোষ ঘ'টবে না ততক্ষণ নালিশ কর্‌বার কোনো হেতু নেই। অন্য দেশের লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করে, এর মানে কী হ'লো, এরা বলে তা আমরা জানিনে কিন্তু আমাদের "রসম্" তৃপ্ত হ'চ্চে। অর্থাৎ মানে না পাই, রস পাচ্চি। আমাকে একজন ওলন্দাজ পণ্ডিত ব'লেছিলেন, বালীর লোকেরা অভ্যাস মতো যে-সব পূজানুষ্ঠান করে তা'র মানে তা'রা কিছুই বোঝে না কিন্তু তারাও "রসম্" তৃপ্তির দোহাই দিয়ে থাকে। অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের, সম্পূর্ণতার একটা আইডিয়া তাদের মনের ভিতরে আছে, অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সেইটিতে যখন সাড়া পায় তখন তাদের যে-আনন্দ তাকে তো আধ্যাত্মিক বলা যেতে পারে।

কাল রাত্রে এই রঙ্গক্ষেত্রের বহিরঙ্গনে কত-যে লোক জ'মেচে তা'র সংখ্যা নেই। নিঃশব্দে তা'রা দেখ্‌চে,

শুধু কেবল দেখারই সুখ। তাদের মনের মধ্যে রামায়ণের গল্প আছে, সেই গল্পের ধারার সঙ্গে ছবির ধারা মিলে কল্পনা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌চে। এর মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয়টা হ'চ্চে এই যে, যে-ছবিটা দেখ্‌চে সেটাতে গল্পকে ফুটিয়ে তোল্‌বার কোনো চেষ্টা নেই। রামের যৌবরাজ্যে কৈকেয়ী রাগ ক'রেচে,—কিন্তু যেরকম ভাবভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরে আমাদের চোখে কানে রাগের ভাবটা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে এই ছবির মধ্যে তা'র কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। আট দশ বছরের ছেলে স্ত্রীবেশে কৈকেয়ী সাজলে তা'র মধ্যে কৈকেয়ীত্ব লেশমাত্র থাকা অসম্ভব। তবু এরা তাতে কোনো অভাব বোধ করে না। জিনিষটা যদি আগাগোড়া ছেলেমানুষী ও গ্রাম্য বর্ব্বর গোচের কিছু হ'তো তাহ'লে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই থাক্‌তো না—কিন্তু যেখানে নৈপুণ্য ও সৌষম্যের সীমা নেই, অতি সামান্য ভঙ্গীটুকুমাত্র যেখানে নিরর্থক নয়, বহুযত্ন ও বহুশক্তির দ্বারা যেখানে এই ললিত কলাটি একেবারে সুপরিণত হ'য়ে উঠেচে সেখানে একে অবজ্ঞা করা চলে না। এই কথাই ব'ল্‌তে হয়-যে রূপের ও গতির ছন্দবোধ এদের মনে অত্যন্ত বেশি প্রবল—সেই রূপের ও গতির ভাষা এদের মনে যতখানি কথা কয় আমাদের মনে ততখানি কয় না। এদের গামেলান সঙ্গীতেও সেটা দেখ্‌তে পাই। প্রথমত যন্ত্রগুলি বহুসংখ্যক, বহুযত্নে সুশোভিত, এবং তাদের সমাবেশ সুসজ্জিত, যারা বাজাচ্চে তাদের মধ্যে সংযত শোভনতা। এই রম্যদর্শন

এদের কাছে অত্যাবশ্যক। চোখের দেখার সুখটুকু রক্ষা ক'রে এদের যে সঙ্গীতের আলোচনা সে হ'চ্চে সুরের নাচ। ছন্দের লীলা এদের কাছে গীতের ধারার চেয়ে বেশি। কিন্তু ছন্দের লীলা আমাদের দেশের ভোজপুরীয়াদের খচমচ বাদ্যের দুঃসহ অত্যাচার নয়। এদের নাচ যেমন সুন্দর সজ্জিত অঙ্গের নাচ, এদের সঙ্গীতে যে-ছন্দের নাচ, সেও খোল করতাল মৃদঙ্গের কোলাহল নয়,—সুশ্রাব্য সুর দিয়ে সেই নাচ মণ্ডিত। এদের সঙ্গীতকে বলা যেতে পারে স্বরনৃত্য, এদের অভিনয়কে বলা যায় রূপনাট্য। ভারতবর্ষ থেকে নটরাজ এসে একদিন এখানে মন্দিরে পূজা পেয়েছিলেন, তিনি এদের যে-বর দিয়েচেন সে হ'চ্চে তাঁর নাচটি,—আর আমাদের জন্যে কি কেবল তাঁর শ্মশানভস্মই রইলো?

২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

(১৮)

শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত।

ডাগো

বাণ্ডুঙ্ যবদ্বীপ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা একটি সুন্দর জায়গায় এসেচি। পাহাড়ের উপরে—শোনা গেলো পাঁচহাজার ফুট উঁচু। হাওয়াটা

বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু হিমালয়ের এতটা উঁচু পাহাড়ে যতটা শীত এখানে তা'র কাছ দিয়েও যায় না। আমরা আছি ডীমণ্ট ব'লে এক ভদ্রলোকের আতিথ্যে। এঁর স্ত্রী অস্ট্রিয়, ভিয়েনার মেয়ে। বাগান দিয়ে বেষ্টিত সুন্দর বাড়িটি পাহাড়ের উপর। এখান থেকে ঠিক সামনেই দেখ্‌তে পাই নীল গিরিমণ্ডলীর কোলে বাণ্ডুঙ্‌ সহর। পাহাড়ের যে-অঞ্জলির মধ্যে এই সহর, অনতিকাল আগে সেখানে সরোবর ছিলো। কখন এক সময় পাড়ি ধ'সে গিয়ে তা'র সমস্ত জল বেরিয়ে চ'লে গেচে। এতদিন ঘোরাঘুরির পরে এই সুন্দর নির্জ্জন জায়গায় নিভৃত বাড়িতে এসে বড়ো আরাম বোধ হ'চ্চে।

জাভাতে নামার পর থেকেই যিনি সমস্তক্ষণ অশ্রান্ত যত্নে আমাদের সাহচর্য্য ক'রে আস্‌চেন তাঁর নাম সমুয়েল কোপেরবর্গ। নামের মূল অর্থ হ'চ্চে তামার পাহাড়। সুনীতি সেই মানেটা নিয়ে তাঁর নামের সংস্কৃত অনুবাদ ক'রে দিয়েচেন তাম্রচূড়। আমাদের মহলে তাঁর এই নামটিই চ'লে গিয়েচে—তিনি এতে আনন্দিত। লোকটির নাম ব'দ্‌লে তাঁকে স্বর্ণচূড় ব'ল্‌তে ইচ্ছে করে। কিসে আমাদের লেশমাত্র আরাম, সুবিধা বা দাবী পূর্ণ হ'তে পারে সেজন্যে তিনি অসাধারণ চিন্তা ও পরিশ্রম ক'রেচেন। অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য তাঁর। দৈহিক পরিমাণে মানুষটি সঙ্কীর্ণ, কিন্তু হৃদয়ের পরিমাণে প্রশস্ত। এতকাল আমরা তাঁকে নানা সময়ে নানা উপলক্ষ্যে দিনরাত ধ'রে দেখেচি—কখনো

তাঁর মধ্যে ঔদ্ধত্য বা ক্ষুদ্রতা বা অহমিকা দেখিনি। সব সময়েই দেখেচি নিজেকে তিনি সকলের শেষে রেখেচেন। তাঁর শরীর রুগ্ন ও দুর্ব্বল, অথচ সেই রুগ্ন শরীরের জন্যে কোনো দিন কোনো বিশেষ সুবিধা দাবী করেন নি। সকলের সব হ'য়ে গিয়ে যেটুকু উদ্বৃত্ত সেইটুকুতেই তাঁর অধিকার। অনেকের কাছে তিনি তর্জ্জন সহ্য ক'রেচেন কিন্তু তা নিয়ে কোনোদিন তাঁর কাছ থেকে নালিশ বা কারো নিন্দে শুনিনি। ইংরিজি ভালো ব'ল্‌তে পারেন না, বুঝ্‌তেও বাধে। কিন্তু কথায় যা না কুলোয় কাজে তা'র চতুর্গুণ পুষিয়ে দেন। কোথাও যাতায়াতের সময় মোটর গাড়িতে প্রথম প্রথম তিনি আমাদের সঙ্গ নিতেন কিন্তু যেই দেখ্‌লেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আমাদের পক্ষে কঠিন অম্‌নি অকুণ্ঠিত মনে নিজেকে সরিয়ে দিয়ে ইংরেজি-জানা সঙ্গীদের জন্যে স্থান ক'রে দিলেন। কিন্তু এখন এমন হ'য়েচে তিনি সঙ্গে না থাক্‌লে কেবল-যে অসুবিধা হয় তা নয় আমার তো ভালোই লাগে না। আমাদের মান সম্মান, সুখ স্বচ্ছন্দতার চিন্তায় তিনি নিজেকে এমন সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েচেন-যে তিনি একটু স'রে গেলেই আমাদের বড়ো বেশি ফাঁক পড়ে। তাঁর স্নিগ্ধ হৃদয়ের একটি লক্ষণ দেখে আমার ভারি ভালো লাগে,—সর্ব্বত্রই দেখি শিশুদের তিনি বন্ধু। তা'রা ওঁকে নিজেদের সমবয়সী ব'লেই জানে। তাঁর হৃদয়ের আর একটি প্রমাণ, জাভার লোকদের তিনি সম্পূর্ণ আপন ক'রে নিয়েচেন। জাবানীদের নাচ গান শিল্প ইতিহাস প্রভৃতিকে

বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্যে তাঁর একান্ত যত্ন। আলোচনার জন্যে জাভা সোসাইটি ব'লে একটি সভা স্থাপিত হ'য়েচে তা'রই পরিচালনার জন্যে এঁর সমস্ত সময় ও চেষ্টা নিযুক্ত। আমার বর্ণনা থেকে বুঝ্‌বে, এই সরল আত্মত্যাগী মানুষটিকে আমরা ভালোবেসেচি।

বোরোবুদুরের উদ্দেশে যে-কবিতা লিখেচি সেটি অন্য পাতায় তোমাদের জন্যে কপি ক'রে পাঠান গেলো।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭।

বোরো-বুদুর

সেদিন প্রভাতে সূর্য্য এইমতো উঠেছে অম্বরে
অরণ্যের বন্দন-মর্ম্মরে।
নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি'
শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নচ্ছবি॥

নারিকেল-বনপ্রান্তে নরপতি বসিল একাকী
ধ্যানমগ্ন-আঁখি।
উচ্চে উচ্ছ্বসিল প্রাণ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাতে,
কী সাহসে চাহিল পাঠাতে
আপন পূজার মন্ত্র যুগ যুগান্তরে।
অপরূপ অমৃত অক্ষরে
লিখিল বিচিত্র লেখা ; সাধকের ভক্তির পিপাসা
রচিল আপন মহাভাষা,—
সর্ব্বকাল সর্ব্বজন
আনন্দে পড়িতে পারে যে-ভাষার লিপির লিখন
সে-লিপি ধরিল দ্বীপ আপন বক্ষের মাঝখানে,
সে-লিপি তুলিল গিরি আকাশের পানে।
সে-লিপির বাণী সনাতন
ক'রেছে গ্রহণ
প্রথম উদিত সূর্য্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে।

অদূরে নদীর কিনারাতে
আল-বাঁধা মাঠে
কত যুগ ধ'রে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে ;—
আঁধারে আলোয়
প্রত্যহের প্রাণ-লীলা শাদায় কালোয়
ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে।
কালের সে লুকাচুরি, তা'রি মাঝে সঙ্কল্প সে কা'র
প্রতিদিন করে মন্ত্রোচ্চার,—
বলে অবিশ্রাম—
"বুদ্ধের শরণ লইলাম।"

প্রাণ যাঁর দু'দিনের, নাম যার মিলালো নিঃশেষে
সংখ্যাতীত বিস্মৃতের দেশে,
পাষাণের ছন্দে ছন্দে বাঁধিয়া গেচে সে
আপনার অক্ষয় প্রণাম,—
"বুদ্ধের শরণ লইলাম॥"

কত যাত্রী কতকাল ধ'রে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেচে কত দিন,
তাদের আপন কণ্ঠ ক্ষীণ।

বিপুল ইঙ্গিতপুঞ্জ পাষাণের সঙ্গীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেচে তাদের নাম,—
জেগেচে অনন্ত ধ্বনি ;—"বুদ্ধের শরণ লইলাম ॥"

অর্থ আজ হারায়েচে সে-যুগের লিখা,
নেমেচে বিস্মৃতি-কুহেলিকা।
অর্ঘ্যশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি'
ভ্রমণ-বিলাসী,—
বোধশূন্য দৃষ্টি তা'র নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি'।
চিত্ত আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে,
হৃদয় নীরস অহঙ্কারে।
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা ;
বেগ শুধু বেড়ে চলে উর্দ্ধশ্বাসে মৃগয়া উদ্দেশে
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে কোথাও পৌঁছে না পরিশেষে,-
অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেচে জাগিয়া।
তাই আসিয়াছে দিন,—
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,—
আবার তাহারে
আসিতে হবে-যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে

পাষাণের মৌন-তটে যে-বাণী র'য়েচে চিরস্থির
কোলাহল ভেদ করি' শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র,—"বুদ্ধের শরণ লইলাম ॥"

বোরো-বুদুর, যবদ্বীপ
২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

---

(১৯)

বাণ্ডুঙ্, জাভা

শ্রীমতী মীরা দেবীকে লিখিত।

কল্যাণীয়াসু—

মীরা, এখানকার যা-কিছু দেখ্‌বার তা শেষ ক'রেচি। যোগ্য থেকে গিয়েছিলুম বোরো-বুদুরে; সেখানে একরাত্রি কাটিয়ে এলুম।

প্রথমে দেখ্‌লুম, মুণ্ডুং ব'লে এক জায়গায় একটি ছোটো মন্দির। ভেঙেচুরে প'ড়্‌ছিলো, সেটাকে এখানকার গবর্ণমেণ্ট সারিয়ে দিয়েচে। গড়নটি বেশ লাগ্‌লো দেখ্‌তে। ভিতরে বুদ্ধের তিন ভাবের তিন বিরাট মূর্ত্তি। স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লেম। মনের ভিতরে কেমন একটা বেদনা বোধ হয়। একদিন অনেক মানুষে মিলে এই মন্দির এই মূর্ত্তি তৈরি ক'রে তুলছিলো। সে কত কোলাহল, কত

আয়োজন, তা'র সঙ্গে সঙ্গে ছিলো মানুষের প্রাণ। এই প্রকাণ্ড পাথরের প্রতিমা যে-দিন পাহাড়ের উপর তোলা হ'চ্ছিলো, সেদিন এই গাছপালার মধ্যে এই সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল আকাশের নীচে মানুষের বিপুল একটা প্রয়াস সজীব ভাবে এইখানে তরঙ্গিত। পৃথিবীতে সে-দিন খবর চালাচালি ছিলো না, এই ছোটো দ্বীপটির মধ্যে যে-প্রবল ইচ্ছা আপন কীর্ত্তি রচনায় প্রবৃত্ত, সমুদ্র পার হ'য়ে তা'র সংবাদ আর কোথাও পৌঁছ'য়নি। ক'ল্‌কাতার ময়দানের ধারে যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি হ'চ্চিলো তা'র কোলাহল পৃথিবীর সকল সমুদ্রের কূলে কূলে বিস্তীর্ণ হ'য়েছিলো।

নিশ্চয় দীর্ঘকাল লেগেছিলো এই মন্দির তৈরি হ'তে; কোনো-একজন মানুষের আয়ুর মধ্যে এর সৃষ্টির সীমা ছিলো না। এই মন্দিরকে তৈরি ক'রে তোল্‌বার জন্যে যে-প্রবল শ্রদ্ধা সেটা তখনকার সমস্ত কাল জুড়ে সত্য ছিলো। এই মন্দির নির্ম্মাণ নিয়ে কত বিস্ময়, কত বিতর্ক, সত্য মিথ্যা কত কাহিনী তখনকার এই দ্বীপের সুখদুঃখ-বিক্ষুব্ধ প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত হ'য়েচে। একদিন মন্দির তৈরি শেষ হ'লো, তারপরে দিনের পর দিন এখানে পূজার দীপ জ্ব'লেচে, দলে দলে পূজার অর্ঘ্য এনেচে, বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে পার্ব্বণ হ'য়েচে, এর প্রাঙ্গণে তীর্থযাত্রী মেয়ে পুরুষ এসে ভিড় ক'রেচে।

তারপরে সেদিনের ভাষার উপর ভাবের উপর ধূলো চাপা প'ড়্‌লো; সেদিন যা অত্যন্ত সত্য ছিলো তা'র অর্থ

গেলো হারিয়ে। ঝর্‌না শুকিয়ে গেলে যেমন কেবল পাথরগুলো বেরিয়ে পড়ে, এই সব মন্দির আজ তেমনি। একে ঘিরে যে-প্রাণের ধারা নিরন্তর ব'য়ে যেতো সে যেমনি দূরে স'রে গেলো, অমনি এর পাথর আর কথা কয় না, এর উপর সেদিনের প্রাণস্রোতের কেবল চিহ্নগুলি আছে, কিন্তু তা'র গতি নেই তা'র বাণী নেই। মোটর গাড়ি চ'ড়ে আমরা একদল এলুম দেখ্‌তে, কিন্তু দেখ্‌বার আলো কোথায়! মানুষের এই কীর্ত্তি আপন প্রকাশের জন্য মানুষের যে-দৃষ্টির অপেক্ষা করে, কতকাল হ'লো সে লুপ্ত হ'য়ে গেচে।

এর আগে বোরোবুদুরের ছবি অনেকবার দেখেচি। তা'র গড়ন আমার চোখে কখনই ভালো লাগেনি। আশা ক'রেছিলুম হয়তো প্রত্যক্ষ দেখ্‌লে এর রস পাওয়া যাবে। কিন্তু মন প্রসন্ন হ'লো না। থাকে-থাকে একে এমন ভাগ ক'রেচে, এর মাথার উপরকার চূড়াটুকু এর আয়তনের পক্ষে এমন ছোটো-যে যত বড়োই এর আকার হোক্ এর মহিমা নেই। মনে হয় যেন পাহাড়ের মাথার উপরে একটা পাথরের ঢাক্‌না চাপা দিয়েচে। এটা যেন কেবল মাত্র একটা আধারের মতো, বহুশত বুদ্ধমূর্ত্তি ও বুদ্ধের জাতক কথার ছবিগুলি বহন কর্‌বার জন্যে মস্ত একটি ডালি। সেই ডালি থেকে তুলে তুলে দেখ্‌লে অনেক ভালো জিনিষ পাওয়া যায়। পাথরে খোদা জাতক মূর্ত্তিগুলি আমার ভারি ভালো লাগ্‌লো,—প্রতিদিনের প্রাণলীলার অজস্র প্রতিরূপ, অথচ তা'র মধ্যে ইতর, অশোভন বা অশ্লীল

কিছুমাত্র নেই। অন্য মন্দিরে দেখেচি সব দেব-দেবীর মূর্ত্তি, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীও খোদাই হ'য়েচে। এই মন্দিরে দেখ্‌তে পাই সর্ব্বজনকে—রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে ভিখারী পর্য্যন্ত। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হ'য়ে প্রকাশ পেয়েচে, এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয় অন্য জীবেরও যথেষ্ট স্থান আছে। জাতক কাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে, তাতে ব'লেচে যুগ যুগ ধ'রে বুদ্ধ সর্ব্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত। প্রাণীজগতে নিত্যকাল ভালোমন্দর যে-দ্বন্দ্ব চ'লেচে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধ'রেই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দর ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুল্‌চে। তা'র চরম বিকাশ হ'চ্চে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ। জীবে জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অল্প অল্প ক'রে নানা দিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন ক'র্‌চে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি। জীব মুক্ত নয়, কেননা আপনার দিকেই তা'র টান; সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে ধর্ম্মের যে-অভিব্যক্তি, তা'র প্রণালী-পরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের পরে আঘাত লাগ্‌চে। সেই আঘাত যে-পরিমাণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমাণে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ। মনে আছে ছেলেবেলায় দেখেছিলুম দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধচক্ষে তা'র গা চেটে দিচ্চে; দেখে আমার বড়ো বিস্ময় লেগেছিলো।

বুদ্ধই-যে তাঁর কোনো এক জন্মে সেই গাভী হ'তে পারেন এ কথা ব'ল্‌তে জাতক-কথা-লেখকের একটুও বাধ্‌তো না। কেননা গাভীর এই স্নেহেরই শেষ গিয়ে পৌঁছেচে মুক্তির মধ্যে। জাতক-কথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার ক'রেচে। এতেই সামান্য এত বড়ো হ'য়ে উঠ্‌লো। সেই জন্যেই এতবড়ো মন্দিরভিত্তির গায়ে গায়ে তুচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্ম্মল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্ম্মেরই প্রকাশ-চেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।

ছু'জন ওলন্দাজ পণ্ডিত সমস্ত ভালো ক'রে ব্যাখ্যা কর্‌বার জন্যে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের চরিত্রে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরল হৃদ্যতার সম্মিলন আমার কাছে বড়ো ভালো লাগ্‌লো। সব চেয়ে শ্রদ্ধা হয় এঁদের নিষ্ঠা দেখে। বোবা পাথরগুলোর মুখ থেকে কথা বের কর্‌বার জন্যে সমস্ত আয়ু দিয়েচেন। এঁদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের কৃপণতা লেশমাত্র নেই—অজস্র দাক্ষিণ্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ক'রে জেনে নেবার জন্যে এঁদেরই গুরু ব'লে মেনে নিতে হবে। জ্ঞানের প্রতি বিশুদ্ধ নিষ্ঠা থেকেই এঁদের এই অধ্যবসায়। ভারতের বিদ্যা, ভারতের ইতিহাস এঁদের নিকটের জিনিষ নয়—অথচ এইটেই এঁদের সমস্ত জীবনের সাধনার জিনিষ। আরো কএকজন পণ্ডিতকে দেখেচি—তাঁদের মধ্যেও সহজ নম্রতা দেখে আমার মন আকৃষ্ট হ'য়েচে।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।

(২০)

বার্লিটন

শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত।

কল্যাণীয়াসু—

রাণী, জাভার পালা সাঙ্গ ক'রে যখন বাটাভিয়াতে এসে পৌঁছ'লুম, মনে হ'লো খেয়াঘাটে এসে দাঁড়িয়েচি, এবার পাড়ি দিলেই ওপারে গিয়ে পৌঁছ'বো নিজের দেশে। মনটা যখন ঠিক সেই ভাবে ডানা মেলেচে এমন সময় ব্যাঙকক্ থেকে আরিয়ামের টেলিগ্রাম এলো যে, সেখানে আমার ডাক প'ড়েচে, আমার জন্মে অভ্যর্থনা প্রস্তুত। আবার হাল ফেরাতে হ'লো। সারাদিন খাটুনির পর আস্তাবলের রাস্তায় এসে গাড়োয়ান যখন নতুন আরোহীর ফর্‌মাসে ঘোড়াটাকে অন্য রাস্তায় বাঁক ফেরায় তখন তা'র অন্তঃকরণে যে-ভাবের উদয় হয় আমার ঠিক সেই রকম হ'লো। ক্লান্ত হ'য়েচি একথা মান্‌তেই হবে। এমন লোক দেখেচি (নাম ক'র্‌তে চাইনে) ভাগ্য অনুকূল হ'লে যারা টুরিস্‌ট্ ব্রত গ্রহণ ক'রে চিরজীবন অসাধ্য সাধন ক'র্‌তে পা'র্‌তো, কিন্তু তা'রা হয়তো পটলডাঙার কোন্ এক ঠিকানায় ধ্রুব হ'য়ে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত। আর আমি দেহটাকে কোণে বেঁধে মনটাকে গগনপথে ওড়াতে পার্‌লে আরাম পাই অথচ সাত ঘাটের জল আমাকে খাওয়াচ্চে। অতএব চ'ল্‌লুম শ্যামের পথে, ঘরের পথে নয়।

এখানকার যে-সরকারি জাহাজে সিঙাপুরে যাবার কথা, সে-জাহাজে অত্যন্ত ভিড়, তাই একটি ছোটো জাহাজে আমি আর সুরেন স্থান ক'রে নিয়েচি। কাল শুক্রবার সকালে রওনা হওয়া গেচে। সুনীতি ও ধীরেন একদিনের জন্য পিছিয়ে র'য়ে গেলো, কেননা কাল রাত্রে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সুনীতির একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিলো। জাভার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সুনীতি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেচেন। তা'র কারণ তাঁর পাণ্ডিত্যে কোনো ফাঁকি নেই, যা-কিছু বলেন তা তিনি ভালো ক'রেই জানেন।

আমাদের জাহাজ দুটি দ্বীপ ঘুরে যাবে তাই দু'দিনের পথে তিন দিন লাগ্‌বে। এই জায়গাটাতে বিশ্বকর্ম্মার মাটির ব্যাগ ছিঁড়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপ সমুদ্রের মধ্যে ছিটকে প'ড়েচে। সেগুলো ওলন্দাজদের দখলে। এখন যে-দ্বীপে জাহাজ নোঙর ফেলেচে তা'র নাম বিলিটন। মানুষ বেশি নেই; আছে টিনের খনি, আর আছে সেই সব খনির ম্যানেজার ও মজুর। আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'সে ব'সে ভাব্‌চি এরা সমস্ত পৃথিবীটাকে কী রকম দোহন ক'রে নিচ্চে। একদিন এরা সব ঝাঁকে ঝাঁকে পালের জাহাজে চ'ড়ে অজানা সমুদ্রে বেরিয়ে প'ড়েছিলো। পৃথিবীটাকে ঘুরে ঘুরে দেখে নিলে, চিনে নিলে, মেপে নিলে। সেই জেনে-নেওয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাস কত সাংঘাতিক সঙ্কটে আকীর্ণ। মনে মনে ভাবি ওদের স্বদেশ থেকে অতি দূর সমুদ্রকূলে এই সব দ্বীপে যে-দিন ওরা প্রথম এসে পাল নামালে, সে কত আশঙ্কায় অথচ

কত প্রত্যাশায় ভরা দিন। গাছপালা জীবজন্তু মানুষজন সেদিন সমস্তই নতুন। আর আজ! সমস্তই সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত, সম্পূর্ণ অধিকৃত।

এদের কাছে আমাদের হার মান্‌তে হ'য়েচে। কেন, সেই কথা ভাবি। তা'র প্রধান কারণ, আমরা স্থিতিবান জাত, আর ওরা গতিবান। অন্যোন্য-তন্ত্র সমাজ-বন্ধনে আমরা আবদ্ধ, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে ওরা বেগবান। সেই জন্যেই এত সহজে ওরা ঘুর্‌তে পার্‌লো। ঘুর্‌চে ব'লেই জেনেচে আর পেয়েচে। সেই কারণেই জান্‌বার ও পাবার আকাঙ্ক্ষা ওদের এত প্রবল। স্থির হ'য়ে ব'সে ব'সে থেকে আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাটাই ক্ষীণ হ'য়ে গেচে। ঘরের কাছেই কে আছে, কী হ'চ্চে, ভালো ক'রে তা জানিনে, জান্‌বার ইচ্ছাও হয় না। কেননা ঘর দিয়ে আমরা অত্যন্ত ঘেরা। জান্‌বার জোর নেই যাদের, পৃথিবীতে বাঁচবার জোর তাদের কম। এই ওলন্দাজরা যে-শক্তিতে জাভা দ্বীপ সফল রকমে অধিকার ক'রে নিয়েচে, সেই শক্তিতেই জাভাদ্বীপের পুরাতত্ত্ব অধিকার কর্‌বার জন্যে তাদের এত পণ্ডিতের এত একাগ্রমনে তপস্যা। অথচ এ পুরাতত্ত্ব অজানা নতুন দ্বীপেরই মতো তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য। নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধেও আমরা উদাসীন, দূর সম্পর্কীয় জ্ঞান সম্বন্ধেও এদের আগ্রহের অন্ত নেই। কেবল বাহুবলে নয়, এই জিজ্ঞাসার প্রবলতায় এরা জগৎটাকে অন্তরে বাইরে জিতে নিচ্চে। আমরা

একান্তভাবে গৃহস্থ। তা'র মানে আমরা প্রত্যেকে আপন গার্হস্থ্যের অংশ মাত্র, দায়িত্বের হাজার বন্ধনে বাঁধা। জীবিকাগত দায়িত্বের সঙ্গে অনুষ্ঠানগত দায়িত্ব বিজড়িত। ক্রিয়া-কর্ম্মের নিরর্থক বোঝা এত অসহ্য বেশি-যে অন্য সকল যথার্থ কর্ম্ম তা'রই ভারে অচলপ্রায়। জাতকর্ম্ম থেকে আরম্ভ ক'রে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত কৃত্য ইহলোক পরলোক জুড়ে আমাদের স্কন্ধে চেপেচে তাদের নিয়ে নড়া-চড়া অসম্ভব, আর তা'রা আমাদের শক্তিকে কেবলি শোষণ ক'রে নিচ্চে। এই সমস্ত ঘরের ছেলেরা পরের হাতে মার খেতে বাধ্য। এ-কথাটা আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝ্‌তে পার্‌চি। এইজন্যে আমাদের নেতারা সন্ন্যাসের দিকে এতটা ঝোঁক দিয়েচেন। অথচ তাঁরা সনাতন ধর্ম্মকেও ধ্রুব সত্য ব'লে ঘোষণা করেন। কিন্তু আমাদের সনাতন ধর্ম্ম গার্হস্থ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সস্ত্রীকং ধর্ম্মমাচরেৎ। আমাদের দেশে বিস্ত্রীক ধর্ম্মের কোনো মানে নেই।

যাঁরা সনাতন ধর্ম্মের দোহাই দেন না, তাঁরা বলেন, ক্ষতি কী? কিন্তু বহু যুগের সমাজ-ব্যবস্থার পুরাতন ভিত্তি যদি-বা ভাঙা সহজ হয় তা'র জায়গায় নতুন ভিত্তি গ'ড়্‌বে কতদিনে। কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজ কতকগুলি নীতিকে সংস্কারগত ক'রে নিয়েচে। তর্ক ক'রে বিচার ক'রে অল্প লোক সিধে থাক্‌তে পারে—সংস্কারের জোরেই তা'রা সংসারের পথে চলে। এক সংস্কারের জায়গায় আর-এক সংস্কার গড়া তো সোজা কথা নয়। আমাদের সমাজের

সমস্ত সংস্কারই আমাদের বহুদায়গ্রন্থিল গার্হস্থ্যকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা রাখ্‌বার জন্যে। য়ুরোপীয়দের কাছ থেকে বিজ্ঞান শেখা সহজ, কিন্তু তাদের সমাজের সংস্কারকে আপন করা সহজ নয়।

আমাদের জাহাজে ছিলেন টিন খনির এক কর্ত্তা,—ব'ল্‌লেন ষোল বৎসর এইখানেই লেগে আছেন। টিন ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। তবু এইখানেই তাঁর বাসা বাঁধা। বাটাভিয়াতে সিন্ধি বণিকেরা দোকান ক'রেচেন। দু'বছর অন্তর বাড়ি যাবার নিয়ম। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম স্ত্রী পুত্র নিয়ে এখানে বাসা বাঁধ্‌তে দোষ কী? ব'ল্‌লেন, স্ত্রীকে নিয়ে এলে চ'ল্‌বে কেন, স্ত্রী-যে সমস্ত পরিবারের সঙ্গে বাঁধা, তাঁকে সরিয়ে আন্‌তে গেলে সেখানে ভাঙন ধরে। বোধ করি রামায়ণের যুগে এত তর্ক ছিলো না। টিনের কর্ত্তা বালক-কাল কাটিয়েচেন সাশ্রম বিদ্যালয়ে, বয়ঃপ্রাপ্ত হ'তেই কাজের সন্ধানে ফিরেচেন, বিবাহ কর্‌বামাত্র নিজের শক্তির পরেই সম্পূর্ণ ভার দিয়ে ব'সেচেন। বাপের তবিলের উপরে তাগিদ নেই, মা মাসী পিসেমশায়ের জন্যেও মন খারাপ হয় না। সেই জন্যেই এই জন-বিরল নির্ব্বাসনেও টিনের খনি চ'ল্‌চে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এরা ঘর বাঁধ্‌তে পার্‌লো তা'র কারণ এরা ঘরছাড়া। তা'রপরে মঙ্গল গ্রহের দিকে দূরবীণ তুলে-যে এরা রাতের পর রাত কাটিয়ে দিচ্চে তা'রও কারণ এদের জিজ্ঞাসা-বৃত্তি ঘরছাড়া। সনাতন গৃহস্থরা এদের সঙ্গে কেমন ক'রে পার্‌বে? তাদের প্রচণ্ড গতিবেগে

এদের ঘরের খুঁটিগুলো প'ড়্‌চে ভেঙে; কিছুতে বাধা দিতে পার্‌চে না। যতক্ষণ চুপ ক'রে আছি ততক্ষণ যত রাজ্যের অহেতুক বোঝা জ'মে জ'মে পর্ব্বত-প্রমাণ হ'য়ে উঠ্‌লেও তেমন দুঃখ বোধ হয় না, এমন কি ঠেস্ দিয়ে আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু ঘাড়ে তুলে নিয়ে চ'ল্‌তে গেলেই মেরুদণ্ড বাঁকে। যারা সচল জাত, বোঝাই সম্বন্ধে তাদের কেবলি সূক্ষ্ম বিচার ক'র্‌তে হয়। কোন্‌টা রাখ্‌বার কোন্‌টা ফেলবার, এ তর্ক তাদের প্রতি মুহূর্ত্তের, এতেই আবর্জ্জনা দূর কর্‌বার বুদ্ধি পাকা হয়। কিন্তু সনাতন গৃহস্থ চণ্ডীমণ্ডপে আসন পেতে ব'সে আছেন, তাই তাঁর পঞ্জিকা থেকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন-ভরা মূঢ়তায় আজ পর্য্যন্ত কিছুই বাদ প'ড়্‌লো না। এই সমস্ত রাবিশ্ যাদের অন্তরে বাইরে কানায় কানায় ভরপুর, হঠাৎ কংগ্রেসের মাচার উপর থেকে তাদের পরে হুকুম এলো লঘুভার মানুষের সঙ্গে সমান পা-ফেলে চ'ল্‌তে হবে, কেন না দু'চার দিনের মধ্যেই স্বরাজ চাই। জবাব দেবার ভাষা তাদের মুখে নেই, কিন্তু তাদের পাঁজর-ভাঙা বুকের ব্যথায় এই মূক মিনতি থেকে যায়, "তাই চল্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বো, কিন্তু কর্ত্তারা আমাদের বোঝা নামিয়ে দেন।" তখন কর্ত্তারা শিউরে উঠে বলেন, "সর্ব্বনাশ, ও-যে সনাতন বোঝা।"

মায়র জাহাজ

১লা অক্টোবর, ১৯২৭।

(২১)

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লিখিত।

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, অক্টোবর সুরু-হ'লো, বোধ হ'চ্চে এখন তোমাদের পূজোর ছুটি, আন্দাজ ক'র্‌চি ছুটি ভোগ কর্‌বার জন্যে আশ্রম ত্যাগ করা তুমি প্রয়োজন বোধ করোনি। নিশ্চয়ই তোমার ছুটির জোগান দেবার ভার দিয়েচো শান্তিনিকেতনের প্রফুল্ল কাশগুচ্ছবীজিত শরৎ প্রকৃতির উপরে। পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে অন্তত এই বুদ্ধি আমার মাথায় এসেচে-যে, ঘুরে বেড়িয়ে বেশি কিছু লাভ নেই,—এ যেন চালুনিতে জল আন্‌বার চেষ্টা, পথে-পথেই প্রায় সমস্তটা নিকেশ হ'য়ে যায়। আধুনিক কালের ভ্রমণ জিনিষটা উঞ্ছবৃত্তির মতো, যা ছড়িয়ে আছে তা'কে খুঁটে খুঁটে কুড়িয়ে কুড়িয়ে চলা। নিজের সুদূর ভরাক্ষেতে আঁটি-বাঁধা ফসলের স্মৃতিটা মনে কেবলি জেগে ওঠে।

এবারকার যাত্রায় দেশের চিঠি পত্র ও খবরবার্ত্তা প্রায় কিছু পাইনি ব'লে মনে হ'চ্চে যেন জন্মান্তর গ্রহণ ক'রেচি। এ-জন্মের প্রত্যেক দিনের স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি সাবেকজন্মের অন্তত সাতদিনের তুল্য। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন ঘটনার চলোমান যূথপ্রবাহ একেবারে ঠাসাঠাসি হ'য়ে হুহু ক'রে চ'লেচে। এই চলার মাপেই মন তোমাদেরও সময়ের বিচার ক'রচে। রেলগাড়ির আরোহী যেমন মনে করে

তা'র গাড়ির বাইরে নদীগিরিবন হঠাৎ কালের তাড়া খেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিয়েচে,—তেম্‌নি এই দ্রুত বেগবান সময়ের কাঁধে চ'ড়ে আমারো মনে হ'চ্চে তোমাদের ওখানেও সময়ের বেগ বুঝি এই-পরিমাণেই,—সেখানে আজ-গুলো বুঝি কাল-গুলোকে ডিঙিয়ে একেবারে পরশুর ঘাড়ে গিয়ে প'ড়্‌চে, মুকুলের সঙ্গে ফলের বয়সের ভেদ সেখানে বুঝি ঘুচ্‌লো। দূরে ব'সে যখন বোরোবুদর বালী প্রভৃতির কথা ভেবেচি তখন সেই ভাব্‌নাকে একটা বিস্তৃত কালের উপর মেলে দিয়ে কল্পনা ক'রেচি—নইলে অতখানি পদার্থ ধরাবার জায়গা পাওয়া যায় না। এই কয়দিনেই সে-সমস্ত তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা গেলো, যা স্বপ্নের মধ্যে আকীর্ণ হ'য়ে ছিলো, তা প্রত্যক্ষের মধ্যে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এলো। দূরে সময়ের যে-মাপ অস্ফুটতার মধ্যে মস্ত হ'য়ে ছিলো, কাছে সেই সময়টাই ঘন হ'য়ে উঠ্‌লো। হিসেব ক'রে দেখ্‌লে আমার এই কয়দিনের আয়ুতে অল্পকালের মধ্যে অনেকখানি কালকে ঠেসে দেওয়া হ'য়েচে। চণ্ডীমণ্ডপে মন্দগমনে যার দিন চলে তা'র বয়সটার অনেকখানি বাদ দিলে তবে খাঁটি আয়ুটুকুর মধ্যে পৌঁছ'নো যায়,—অর্থাৎ কেবলমাত্র কালের পরিমাণে তা'র আয়ুর দাম দিতে গেলে ঠ'ক্‌তে হয়, অনেক দর-কষাকষি ক'রেও তুধে পৌঁছ'নো শক্ত হ'য়ে ওঠে। তাই ব'লে একথা বলাও চলেনা-যে, দ্রুতবেগে দেশ-বিদেশে অনেক গুলো ব্যাপার-পরম্পরার মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে চ'ল্‌লেই আয়ু সেই অনুসারে কালকে ব্যাপ্ত করে। আমাদের শাস্ত্রীমশায়কে দেখো না। তিনি

কোণেই ব'সে আছেন। কিন্তু সেই টুকুর মধ্যে স্থির হ'য়ে থেকে কালকে তিনি কী রকম ব্যাপকভাবে অধিকার ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লেচেন—সাধারণ লোকের বয়সের বাটখারায় মাপ্‌লে তাঁর বয়স নব্বই ছাড়িয়ে যায়। এই তো সেদিন এলেন আশ্রমে, মিত্রগোষ্ঠীর সম্পাদকপদ থেকে নেমে। এসেই তাঁর মন দৌড় দিলো পালি শাস্ত্রের মহারণ্যের মধ্যে, দ্রুতবেগে পার হ'য়ে চ'লেচেন কোথায় তিব্বতী কোথায় চৈনিক। নাগাল পাবার জো নেই।

তাই ব'ল্‌চি আমাদের এই ভ্রমণের কালটা ব্যাপ্তির দিকে যে-রকম প্রাপ্তির দিকে সে-রকম নয়। আমাদের ভ্রমণের তালটা চৌদূন লয়ে। এই লয় তো আমাদের জীবনের অভ্যস্ত লয় নয় তাই বাইরের দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তরকে চালাতে গিয়ে হয়রান হ'য়ে প'ড়্‌তে হয়। যেমন চিবিয়ে না খেলে খাদ্যটাকে খাদ্য ব'লেই মনে হয় না তেম্‌নি হুড়মুড় ক'রে কাজ করাকে কর্ত্তব্য ব'লে উপলব্ধি করা যায় না। বিশ্বের উপর দিয়ে ভাসা-ভাসা ভাবে মন বুলিয়ে চ'লেচি,—অভিজ্ঞতার পেয়ালা ধ'রে ফেনাটাতে মুখ ঠেকাবার জন্যে এক সেকেণ্ড মেয়াদ পাওয়া যায়, পানীয় পর্য্যন্ত পৌঁছ'বার সময় নেই। মৌমাছিকে ঝোড়ো-হাওয়ার তাড়া খেয়ে কেবল যদি উড়্‌তেই হয়, ফুলের উপর একটুমাত্র পা ছুঁইয়েই তখনি যদি সে ছিট্‌কে পড়ে, তা হ'লে তা'র ঘুরে-বেড়ানোটা যেমন ব্যর্থ হয়, আমার মনও তেম্‌নি ব্যর্থতার দম্‌কা হাওয়ায় ভন্‌ভন্‌ ক'রেই ম'লো,—তা'র চলার

সঙ্গে পৌঁছ'নোর যোগ হারিয়ে গেচে। এর থেকে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারি কোনো জন্মে আমেরিকান ছিলুম না। পাওয়া কা'কে বলে যে-মানুষ জানেনা, ছোঁওয়াকেই সে পাওয়া মনে করে। . আমার মন স্ন্যাপ্‌শট্‌বিলাসী মন নয়, সে চিত্র-বিলাসী।

এই মাত্র সুনীতি এসে তাড়া লাগাচ্চে বের'তে হবে,—সময় নেই। যেমন কোল্‌রিজ ব'লে গেচেন,—সমুদ্রে জল সর্ব্বত্রই, কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই-যে পান করি। সময়ের সমুদ্রে আছি কিন্তু এক মুহূর্ত্ত সময় নেই।

২· অক্টোবর ১৯২৭।

সিয়াম

(প্রথম দর্শনে)

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্র রবে
আকাশে ধ্বনিতেছিলো পশ্চিমে পূরবে,
মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে ;—
দেশে-দেশে চিত্তদ্বার দিলো যবে খুলে
আনন্দ-মুখর উদ্বোধন,
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিলো যবে মন,

বেগ তা'র ব্যাপ্ত হ'লো চারিভিতে
দুঃসাধ্য কীর্ত্তিতে, কর্ম্মে, চিত্রপটে, মন্দিরে, মূর্ত্তিতে,
আত্মদান-সাধন-স্ফূর্ত্তিতে,
উচ্ছ্বসিত উদার উক্তিতে,
স্বার্থঘন দীনতার বন্ধন-মুক্তিতে,
সে-মন্ত্র অমৃতবাণী, হে সিয়াম, তব কানে
সেদিন কখন্ এলো কেহ নাহি জানে
অভাবিত অলক্ষিত আপনাবিস্মৃত শুভক্ষণে
দূরাগত পান্থ-সমীরণে ॥

সে-মন্ত্র তোমার প্রাণে লভি' প্রাণ
বহুশাখাপ্রসারিত কল্যাণে ক'রেছে ছায়াদান।
সে মন্ত্র-ভারতী
দিলো অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে,
শুভ আকর্ষণে বাঁধি' তা'রে
এক ধ্রুব কেন্দ্রসাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে,
সর্ব্বজনগণে তব এক করি' একাগ্র ভক্তিতে
এক ধর্ম্ম, এক সঙ্ঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে।
সে-বাণীর সৃষ্টিক্রিয়া নাহি জানে শেষ,
নবযুগ-যাত্রাপথে দিবে নিত্য নূতন উদ্দেশ ;

সে-বাণীর ধ্যান
দীপ্যমান করি' দিবে নব নব জ্ঞান
দীপ্তির ছটায় আপনার,
এক-সূত্রে গাঁথি দিবে তোমার মানস রত্নহার ॥
হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করি'
বহু যুগ ধরি'
রচিয়া তুলেচো তুমি সুমহৎ জীবনমন্দির,—
পদ্মাসন আছে স্থির
ভগবান বুদ্ধ যেথা সমাসীন
চিরদিন,
মৌন যাঁর বাণী অন্তহারা,
বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা ॥

আমি সেথা হ'তে এনু যেথা ভগ্ন স্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণ কীর্ণ মূক শিলারূপে,—
ছিলো যেথা সমাচ্ছন্ন করি'
বহুযুগ ধরি'
বিস্মৃতিকুয়াশা
ভক্তির বিজয়স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চ্চনার ভাষা।
সে-অর্চ্চনা, সেই বাণী
আপন সজীব মূর্ত্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি' শ্যামল সরস বক্ষে তব,—
আজি আমি তা'রে দেখি' ল'বো ॥

ভারতের যে-মহিমা
ত্যাগ করি' আসিয়াছে আপন অঙ্গনসীমা,
অর্ঘ্য দিবো তা'রে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে।
স্নিগ্ধ করি' প্রাণ
তীর্থ জলে করি' যাবো স্নান
তোমার জীবনধারা-স্রোতে।
সে-নদী এসেচে বহি' ভারতের পুণ্যযুগ হ'তে
যে-যুগের গিরিশৃঙ্গ'পর
একদা উদিয়াছিলো প্রেমের মঙ্গল দিনকর॥

ব্যাঙ্কক্
ফায়া থাই প্রাসাদ
১১ অক্টোবর, ১৯২৭।

(বিদায়-কালে)

কোন্-সে সুদূর মৈত্রী আপন প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞানে
আমার গোপন ধ্যানে
চিহ্নিত ক'রেচে তব নাম,
হে সিয়াম,
বহু পূর্ব্ব যুগান্তরে মিলনের দিনে।
মুহূর্ত্তে ল'য়েছি তাই চিনে'
তোমারে আপন বলি,'—
তাই আজ ভরিয়াছে অতিথির ক্ষণিক অঞ্জলি

পুরাতন প্রণয়ের স্মরণের দানে,
সপ্তাহ হ'য়েচে পূর্ণ শতাব্দীর শব্দহীন গানে।
চিরন্তন আত্মীয়-জনারে
দেখিয়াছি বারে বারে
তোমার ভাষায়,
তোমার ভক্তিতে, তব মুক্তির আশায়,
যে-অর্ঘ্য রচিলে তুমি সুন্দরের সাধনাতে
সুনিপুণ হাতে
তাহারি শোভনরূপে,
পূজার প্রদীপে তব, প্রজ্জ্বলিত ধূপে ॥

আজি বিদায়ের ক্ষণে
চাহিলাম স্নিগ্ধ তব উদার নয়নে,
দাঁড়ানু ক্ষণিক তব অঙ্গনের তলে,
পরাইনু গলে
বরমাল্য পূর্ণ অনুরাগে
অম্লান কুসুম যা'র ফুটেছিলো বহুযুগ আগে ॥

ইণ্টারন্যাশনাল রেলপথে
সিয়াম
১৭ অক্টোবর, ১৯২৭।